বসন্ত-বাহার

শ্রীনবেন্দু ঘোষ

ডি, এম, লাইব্রেরী
৪২নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা - ৬

প্রকাশক :
শ্রীগোপালদাস মজুমদার
ডি. এম. লাইব্রেরী
৪২, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্,
কলিকাতা—৬

মূল্য—চার টাকা
মাঘ, ১৩৬৫

উমাশঙ্কর প্রেস
১২, গৌরমোহন মুখার্জী ষ্ট্রীট্,
শ্রীঅনাদিনাথ কুমার কর্তৃক
মুদ্রিত।

এই লেখকের লেখা

উপন্যাস

নায়ক ও লেখক (২য় সংস্করণ)

ডাক দিয়ে যাই (৪র্থ সংস্করণ)

প্রান্তরের গান

কালো রক্ত

কাঞ্চনপুরের ছেলে

পৃথিবী সবার

ফিয়ার্স লেন

আজব নগরের কাহিনী

গল্প

মানুষ

এই সীমান্তে

ইস্পাত

কান্না

দেবব্রত মুখোপাধ্যায়

বন্ধুবরেষু—

বসন্ত বাহার

পূর্ব্বরঙ্গ

সুব্রতের কথা মনে পড়ায় মেজাজটা রীতিমত বিগড়ে গেল!

ধোবা, নাপিত, দর্জ্জি আর স্বর্ণকার—এদের যে কোন কথার ঠিক থাকে না, এই কথাই এতদিন শুনে এসেছি, বিশ্বাসও করেছি। কিন্তু মাসিকপত্রের সম্পাদক হওয়ার পর থেকে এবং নিজে অল্প-স্বল্প লিখি বলে সে কথা আর বিশ্বাস করি না। ধোপা, নাপিত, দর্জ্জি আর স্বর্ণকারদের এখন নিতান্তই ভালোমানুষ বলে মনে হচ্ছে কারণ, তাদের চেয়েও একদল সাংঘাতিক জীবদের আমি আবিষ্কার করেছি। সেই সব জীবেরা হচ্ছে লেখক ও চিত্রশিল্পীরা। কথা বলতে এবং কথা দিতে তারা মোটেই কার্পণ্য করে না, সে সময়ে তারা সদাশয় ও হাস্যমুখ। কিন্তু কথা রাখবার বেলায় তারা চিরকাল হাড়কঞ্জুষ, তাদের, 'কাল' রাবণের 'কাল,' 'কাল' 'কাল' করে তারা চিরকাল সম্পাদকদের কাবু করে—তারা বিধাতার খামখেয়াল।

তা হলে সহজ ভাষাতেই বলি। আমি, শ্রীযুক্ত অনিমেষ রায়, একজন মোটামুটি খ্যাতিমান লেখক, ইতিমধ্যেই আমার স্বাক্ষরযুক্ত চার পাঁচটি বই বাজারে বেরিয়ে গেছে এবং প্রশংসিত হয়েছে। তা ছাড়াও আমার অন্য একটি বিশেষ পরিচয় আছে—আমি 'ভালো কাগজ' নামক একটি মাসিক-পত্রের সম্পাদক। কাগজটি মন্দ চলে না। সামনেই

পূজো, আমাদের শারদীয়া সংখ্যা বেরোতে আর মোটে একমাস বাকী। বিজ্ঞাপনও প্রচুর সংগৃহীত হয়েছে, বেশ মোটা লাভের আশাই ষোল-আনা, তবু পুরোপুরি পুলকিত-বোধ করতে পারছি না। কারণ আর কিছু নয়, লেখক ও চিত্রশিল্পীরা যেন সবাই দল বেঁধে চক্রান্ত করেছে আমার বিরুদ্ধে, আমার 'ভালো কাগজ'এর নাম বদলে তারা বোধ হয় 'খারাপ কাগজ' করতে চায়। কবে যে গল্প আর কবিতা পাব, স্কেচ্‌গুলো পাব, কিচ্ছু জানি না, অথচ আর একমাস মাত্র সময় আছে।

মেজাজ বিগড়ে যাবার মত যথেষ্ট কারণ আছে। কিন্তু আসলে এখন যে-কারণে মেজাজটা বিগড়ে গেল তার মূলে চিত্রশিল্পী সুব্রত মুখোপাধ্যায়। আধুনিক যুগের শিল্পীদের মধ্যে তার বেশ নাম হয়েছে, ভবিষ্যতে সে যে বাংলা দেশের একজন শ্রেষ্ঠ শিল্পী বলে খ্যাতিমান হবে সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। তবে সেই শ্রেষ্ঠত্বের আসনে সুব্রত তাড়াতাড়ি বসতে পারবে কি না সে বিষয়ে আমার ঘোরতর সন্দেহ আছে। ভয়ঙ্কর খেয়ালী লোকটা, কখন যে কোথায় থাকে তার কোনো ঠিক নেই। আর কথা রাখার ব্যাপারে সে সবার রেকর্ড ভঙ্গ করেছে—অর্থাৎ সে মোটেই কথা রাখে না। দিন পনেরো আগে তাকে পূজো-সংখ্যার জন্য তিনটে ছবি এঁকে দিতে বলেছি অথচ আজ আসবে কাল আসবে ভেবে ভেবে দিন কেটে যাচ্ছে, এখনো পর্য্যন্ত তার দেখা নেই।

অদ্ভুত লোক এই সুব্রত। খাপছাড়া, বেয়াড়া ধরণের। বছর দুই হল তার সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছে। সেই আলাপ হওয়ার একটা ছোট্ট ইতিহাস আছে। কি জানি কেন ইতিহাসটা আমার কাছে স্মরণীয় হয়ে আছে!

সেই ইতিহাসকে স্মরণ করতে মন্দ লাগে না। এই মুহূর্ত্তে হাতের গোড়ায় কোন কাজ নেই। বসে বসে আকাশপাতাল ভাবা আর

সিগারেটের ধূম্রজাল সৃষ্টি করা ছাড়া আর কিছুই করবার নেই। বাইরে দুর্য্যোগের ছায়া। মেঘে মেঘে অন্ধকার আকাশ, গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টিপাত আর জোলো হাওয়া। মধ্য কলকাতার ঘিঞ্জি এলাকায়, সরু একটা গলির মধ্যে আমার কাগজের অফিস। বেলা এখন চারটে। কিন্তু যাট পাওয়ারের বিজলী বাতি জ্বালিয়ে বসে আছি আমি। বাইরের উদাস হাওয়ায় মনের ভেতরটা কেমন যেন করে ওঠে, একটা অব্যক্ত বেদনাপুঞ্জে যেন হৃদয়টা ভরাট হয়ে ওঠে। কি চায় মন? ভাবি। জবাবও পাই। আমার বয়স হয়েছে। চল্লিশের কোঠায় পদার্পণ করেছি আমি, আমার ভ্রমর-কৃষ্ণ কেশরাশির ওপর সময়ের তুষার চিহ্ন দেখা দিয়েছে। সম্পূর্ণ একা। সংসার পাতাটা আর হয়ে ওঠেনি, অনবরত ঝড়ের ভেতর দিয়েই চলেছে আমার অগ্রগতি। রূপ, রস, গন্ধ, বর্ণের অপরূপ সমারোহে ভরা পৃথিবী। কিন্তু আজ আমি শুধু দর্শক। আমার বয়স হয়েছে।

দূর ছাই। এ সব কথা ভেবে কি হবে? তার চেয়ে সুব্রতের সঙ্গে আলাপ হওয়ার কাহিনীটাকেই স্মরণ করি।

দু'বছর আগেকার কথা:

একা মানুষের অসুবিধার সঙ্গে তার সুবিধাও থাকে নানারকমের। আমারো তা আছে। যখন তখন ইচ্ছেমত একা বেরিয়ে পড়তে পারি, বাইরের ডাককে উপেক্ষা করার মত সময়াভাব আমার নেই। অভাব থাকলেও তার জন্য সময় করে নিতে পারি।

সেদিনটা ছিল বৈশাখের কোনো এক দিন। সন্ধ্যেবেলায় কাগজের অফিস থেকে বেরিয়ে পড়লাম। ঘরের গুমোট কাটছিল না, ফ্যানের হাওয়া পর্য্যন্ত গরম হয়ে উঠেছিল, দম আটকে আসছিল। তাই অতিষ্ঠ হয়ে বেরিয়ে পড়লাম সেখান থেকে। কোথায় যাব কিছু না ভেবে

এস্প্লানেডগামী একটা ট্রামে উঠলাম আমি। বুক ভরে নিঃশ্বাস নিয়ে ভাবলাম যে বাঁচা গেল। কিন্তু খুব পিপাসা-বোধ হচ্ছিল তাই ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীটের একজায়গায় নেমে পড়লাম। উদ্দেশ্য কোনো একটি রেঁস্তোরাতে গিয়ে ক্ষুধা তৃষ্ণা দূর করব।

এই প্রসঙ্গে আমার চারিত্রিক একটা বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করছি। এই উপন্যাসের কাহিনী যাই হোক, আমিও তার সঙ্গে জড়িত। তা ছাড়া আমিই যখন কাহিনী বর্ণনা করছি তখন আমাকেও সবার জানা উচিত। তা না জানলে কাহিনীকে যুক্তিযুক্ত মনে হবে না।

আমি বরাবরই একটু গতানুগতিকতার বিরোধী। অর্থাৎ যখন সবাই গড়ের মাঠে যায়, আমি তখন বাড়ী বসে থাকি। আবার সবাই যখন কাফি হাউসে যায়, আমি তখন অচেনা গলির এক অখ্যাত চায়ের দোকানে যাই। আসল কথা আমি একজন শিল্পী। সে বিষয়ে আমি অচেতন এবং সচেতন—দুই-ই। আমি শিল্পী হিসাবে কি তা নিয়ে কোন ঝগড়া করবনা, সে বিষয়ে আমি নির্ব্বিকার, কিন্তু এ বিষয়ে আমি জোর দিয়ে বলতে পারি যে আমি শিল্পী-সমাজের প্রতিভূ। নূতনের মোহ আমার যৌবনোত্তর মনে এইভাবে বিগুমান। জীবন ও সুন্দর বস্তুকে আমি এখনো ভালবাসি। অর্থাৎ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীটে নেমে সেদিন আমি কোনো সাজানো গোছানো, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, সুপরিচিত রেঁস্তোরায় গেলাম না। নূতন একটা কিছু খুঁজে বের করার জন্য আমি ঘুরে বেড়াতে লাগলাম।

সহরের বুকে তখন রাতের ছায়া পড়েছে। আলোয় আলোকিত মহানগরীর স্নায়ুকেন্দ্রে তখন জনতার জোয়ার। রেডিয়ো আর রেকর্ডের বাজনা। সান্ধ্য-ভ্রমণরত সুসজ্জিত নরনারী। স্নো, পাউডারের গন্ধ আর কলকণ্ঠ। শব্দ, কোলাহল, উত্তেজিত, অস্থির পদক্ষেপ। ট্যাক্সি,

বাস, রিক্সা। সিনেমার আলো আর আকাশের গায়ে লাল, নীল আলোর হরফে লিখিত বিজ্ঞাপন। বিচিত্র পরিবেশ।

চারদিকের এই পরিবেশের সঙ্গে খাপ খায় এমনি একটা রেঁস্তোরাই যেন চাইছিলাম আমি। ধর্ম্মতলা থেকে বাঁ দিকের একটা রাস্তা ধরে আমি অন্যমনস্কভাবে চলতে লাগলাম। রাতের মহানগরীকে চিরকাল আমার দুর্ব্বোধ্য ও রহস্যময় মনে হয়। রাতের বেলায় এই বিরাট সহরটা যেন হঠাৎ আমার কাছে একটা অপরিচিত মহাদেশ বলে ভ্রম হয়। কেন জানিনা। তাই ভাবতে ভাবতে এগোচ্ছিলাম আমি। হঠাৎ থমকে দাঁড়ালাম। বেহালা ও করোনেটের শব্দ ভেসে এল। বিলিতি বাজনা বাজছে। তাকালাম। ডানদিকের ছোট্ট একটা চীনা রেঁস্তোরা থেকে আওয়াজটা আসছে।

যা খুঁজছিলাম তা পেয়ে গেলাম। এই রেঁস্তোরাটাতে কোনদিন আসিনি, তা ছাড়া প্রতিবেশী জাতের রেঁস্তোরা, সেদিক থেকেও বেশ আকর্ষণীয়। বেশী না ভেবে সোজা ঢুকে পড়লাম।

এবং সেখানেই আমি সুব্রতের দেখা পেলাম।

রেঁস্তোরাটা তারও বটে। ছোট্ট হলঘরটার মাঝখানে গোটাবারো টেবিল, প্রতি টেবিলে চারটে করে চেয়ার। ডানদিকে পর্দ্দা-ঘেরা চারটে খুপরী করা। নিভৃতকামী বিলাসীরা সেখানে সঙ্গিনীদের নিয়ে বসতে পারে। ভেতরের দেওয়াল ঘেঁষে বসেছে চারজন বাজনদার। বেহালা, করোনেট ও পিয়ানো সহযোগে বিলিতী জাজ্ চলছে। সেই বাজনার সুরটা বড় তীক্ষ্ণ, শোনার সঙ্গে সঙ্গেই যেন তা রক্ত মাংসের ভেতরে প্রবেশ করে, স্নায়ুজালকে উত্তেজিত করে তোলে আর মনের মধ্যে জ্বলে ওঠে যত সব লাল রংয়ের কামনা।

হলঘরটা ভর্ত্তি ছিল। শ্বেতাঙ্গ ও চীনা নরনারীরাই অধিকাংশ

ভীড় জমিয়েছে সেখানে। তবুও যেন পৃথিবীর এক টুকরো সেখানে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল। পার্শী, ইহুদী, শিখ, বাঙ্গালী—সবরকমই দেখা যাচ্ছিল সেখানে। নানা বয়সের লোক। লিপ্‌স্টিক্ রঞ্জিত ঠোঁটের কোণে হাসি টেনে এদিক ওদিক চোরা চাহনি নিক্ষেপ করছিল মেয়েরা। ভালো করে তাকিয়ে দেখলাম যে তাদের মধ্যে অধিকাংশই অসাধারণ স্তরের। অত্যুজ্জ্বল আলোর মাঝেই ওদের জীবনে উদ্দামতা ঘনায়, সিল্ক, পাউডার আর স্নো দিয়ে মোড়া দেহে ওদের রাতের বেলাতেই জীবন-স্রোত প্রবাহিত হয়, মাঝরাতের অন্ধকারে ওদের দাম বাড়ে আর শেষরাতে ওদের ঘুমোবার সময় হয়। সব মিলিয়ে একটা অপরিচিত ও উত্তেজক পরিবেশ আমার চারদিকে। উর্দ্দি পরিহিত বেয়ারারা ট্রে হাতে টেবিলে টেবিলে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কাঁটা, চামচ, কাপ, প্লেটের টুং টাং শব্দ, নোট ও টাকা পয়সার মৃদু আওয়াজ শোনা যাচ্ছে আর শোনা যাচ্ছে সোডার বোতলের ছিপি খোলার ভস্ ভস্ আওয়াজ ও অর্কেষ্ট্রার দ্রুতলয়ের সুর। হ্যাঁ, অধিকাংশ লোকেরাই মদ ও বীয়ার খাচ্ছিল। বাতাসে তার একটা ক্ষীণ গন্ধ ভেসে বেড়াচ্ছিল। উত্তেজক ও তিক্ত গন্ধ।

বেয়ারা এসে কাছে দাঁড়াল।

"হুজৌর"—

আমার পোষাকটা এক আধ পাত্র পান করার উপযোগী ছিল বলেই বোধ হয় বেয়ারা একটা সুপরিচিত বোতলের নাম শোনার জন্য অপেক্ষা করছিল।

কিন্তু আমি সত্যি নিরামিষ লোক, বেয়ারাকে হতাশ করে বললাম, "কাটলেট অওর আইসক্রীম"—

"অওর কোই ড্রিংক—জী ?"

"নেহি।"

"বীয়ার?"

"নেহি"—

বেয়ারা মনে মনে আমায় গালিগালাজ দিয়ে চলে গেল। বুঝে হাসলাম। আমার কাছে না এসে, চোরাই কোকেন-বিক্রেতা কোন চীনা খরিদ্দারের কাছে গেলে হয়ত তার বিলটা বেশ মোটা হত। হাসলাম, হেসে একটা সিগারেট ধরালাম, তাকালাম চারদিকে।

মাঝে মাঝে অনেকেই এদিকে কৌতূহলের দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে কেন? আমার দিকে নয়ত? তাদের দৃষ্টি অনুসরণ করলাম! আমার মাথাটা বাঁদিকে ঘুরে গেল। আমার পাশেই, কোণের দিকে, একটা টেবিলের ধারে বসে ছিল একজন পুরুষ। দীর্ঘকায়, বলিষ্ঠ ও সুদর্শন দেখতে সে। বয়স প্রায় ত্রিশ। খাড়া নাক, উজ্জ্বল ও তীক্ষ্ণ চোখ, চওড়া কপাল, উদ্ধত ঠোঁট আর একজোড়া পাৎলা গোঁফ। পরণে খাকী ট্রাউজার, একটা আধ-ময়লা সাদা হাফ্‌সার্ট। কাঁধ থেকে ঝুলছে একটা ডিস্‌পোজাল্‌স্‌ থেকে কেনা এ্যামেরিকান হ্যাভারস্যাক। টেবিলের ওপর একটা ডিসে রয়েছে শুকনো মাটন ও কাঁটা চামচ এবং জলের বদলে যা রয়েছে তার রং দেখে বুঝলাম যে পানীয় হিসেবে আছে বিশুদ্ধ কারণ-বারি, মানে ব্রাণ্ডি কিংবা হুইস্কী। চেহারায় রীতিমত একটা বৈশিষ্ট্য ছিল তার। কিন্তু আসলে যে কারণে সবাই ঘুরে ফিরে তাকাচ্ছিল তার দিকে তা সম্পূর্ণ আলাদা। বাঁদিকের ঠোঁটের কোণে একটা অর্দ্ধদগ্ধ সিগারেট চেপে ধরে সে একমনে একটা স্কেচ্‌ করছিল। মাঝে মাঝে একবার সে সমস্ত হলঘটার ওপর একবার নজর বুলিয়ে নিচ্ছিল তারপর আবার তার ছবির দিকে ফিরে তাকাচ্ছিল। ছোট্ট একটা ফ্রেম তার হাতে, পাশে চায়না ইঙ্ক্‌ আর পাৎলা একটা তুলি। মদের

গেলাসটা প্রায় শেষ হয়ে এসেছিল, তার প্রভাব চক-চক করছিল তার চোখের তারায়, জ্বল্‌জ্বল্ করছিল তা সিলিঙ থেকে ঝোলানো শক্তিশালী বিজলী বাতিগুলোর মত। দেখে অবাক হয়ে গেলাম, ভয়ানক ভাবে আকৃষ্ট হয়ে পড়লাম। কে লোকটি? এর নিষ্ঠা কম নয়, ধৈর্য্যও আছে। লোকটি আমার গতানুগতিকতা-বিরোধী মনের সঙ্গে খাপ খাবে মনে হচ্ছে! শুধু তাই নয়, লোকটি নিশ্চয়ই সত্যিকারের শিল্পী। এবিষয়ে আমার ভুল হতেই পারে না। কিন্তু লোকটি জাতে কি? তামাটে ফর্সা রং আর লম্বা চওড়া চেহারা দেখে তো পাঞ্জাবী, মারাঠী, ইটালীয়ান, স্প্যানিশ সব কিছুই ভাবা যেতে পারে। তাহলে? না, ব্যাপারটা জানতে হবে।

বেয়ারা আমার জন্যে কাটলেট এবং আইস্‌ক্রীম নিয়ে এল। আহার্য্যে মনোনিবেশ করলাম। কিন্তু পাশের সেই চিত্রাঙ্কণ-রত লোকটির দিকে কেন জানিনা বারংবার আকৃষ্ট হয়ে তাকাতে লাগলাম। হঠাৎ একসময়ে দেখলাম যে সেও আমার দিকে তাকাল। আমি দৃষ্টিটা ফিরিয়ে নিলাম। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে আবার কে যেন আমার মাথাটা তার দিকে জোর করে ফিরিয়ে দিল। এবার তার দিকে লক্ষ্য না করে তার ছবির দিকে তাকাবার চেষ্টা করলাম। কি ছবি আঁকল লোকটি? কেমন ছবি?

হঠাৎ চমকে উঠলাম।

লোকটির প্রশ্ন শুনে তার দিকে তাকালাম।

"আপনি কি ছবিতে ইণ্টারেস্টেড? মানে আপনি বাঙালী তো?"

হেসে বললাম, "হ্যাঁ, ছবি দেখতে ভালোবাসি আমি। কিন্তু আপনার দ্বিতীয় প্রশ্নে সন্দেহ মেশানো আছে? কেন? আমার পোষাক-পরিচ্ছদ তো আপনার মত ভ্রান্তি-সৃষ্টিকারক নয়।"

লোকটি হাসল। আমি লক্ষ্য করলাম যে তার দাঁতগুলো অসমান কিন্তু ঝক্‌ঝকে। একটা বন্য প্রাচুর্য্য ছিল তার হাসিতে অথচ তার সঙ্গে ছেলেমানুষী একটা আশ্চর্য্য সারল্যও জড়িত ছিল। তার সেই হাসির মধ্যে তার অন্তর্লোকও যেন আমার কাছে ধরা দিল। বুঝলাম যে লোকটির হৃদয়ে সোনা ছড়ানো আছে।

সে বলল, "আপনার কথা খানিকটা সত্যি। কিন্তু ব্যাপার কি জানেন? বাঙলা দেশে সবাই বাঙালী সাজে আর বাঙালীরা সব রকম পোষাক পরে বলে আমিও যেমন আপনার একটি সমস্যা হয়ে উঠেছিলাম তেমনি আপনার বিষয়েও আমার মনে একটু আশঙ্কা ছিল। সে যাই হোক, আমি কিন্তু পোষাকের বিষয়ে সুবিধা-বাদী—যখন যাতে সুবিধে তখনি তেমনি সাজি। তাছাড়া পোষাকে কি যায় আসে? মানুষ যদি মানুষ না হয়ে ওঠে তাহলে সে যে কোনো জাতি হিসেবেই ব্যর্থ হল।"

আমি অবাক হলাম, খুশীও হলাম। লোকটির কথার মধ্যে সত্য ছিল। খুব সহজ এবং সরল তার উক্তি কিন্তু গভীর অর্থপূর্ণ। মাথা নেড়ে আমি বললাম, "আপনার কথা সত্যি।"

লোকটি বলল, "যাক সে কথা, আপনি যদি আমার ছবি দেখতে চান তো কাছে এসে দেখতে পারেন।"

বলেই সে তার ছবিতে আবার তুলি বুলোতে লাগল এবং সেই অবস্থাতেই বলল, "আর পাঁচমিনিটেই শেষ হয়ে যাবে ছবিটা"—

আমি আইসক্রীমটা শেষ করে ছবি দেখবার জন্য উঠি-উঠি করতেই হলঘরে একটা কাণ্ড বেঁধে গেল।

দুজন মাতাল চীনার সঙ্গে একজন মদমত্ত বিদেশী নাবিকের ঝগড়া আরম্ভ হল।

"ইউ—সান্ অব্ এ্যা বুল"—

"ইউ সেলারস্ সান্"—

"আইল্ নকাট্ ই ডাটি মঙ্গোলিয়ান্" –

"শাত্ আপ্—দু ইউ হিয়ার"—

বিবাদকারীদের চারদিকে অস্ফুট গুঞ্জনধ্বনি সুরু হয়ে গেল। শ্বেতাঙ্গ নাবিক ও পীতকায় ব্যবসায়ীদের স্বপক্ষে লোক জড় হল। সমস্ত হলঘরটা দেখতে দেখতে দুটো শিবিরে বিভক্ত হয়ে গেল। কেবল আমাদের মত তামাটে রংয়ের অহিংসাবাদী মানুষগুলো নিরপেক্ষ দর্শকের মত জুল্‌জুল্ করে তাকাতে লাগল। আর হোটেলের মোটা চীনা মালিকটি শঙ্কিত, সন্ত্রস্তভাবে থপ্ থপ্ করে এদিক ওদিক দৌড়াদৌড়ি করতে করতে করুণ কণ্ঠে চেঁচাতে লাগল, "প্লীজ্—জেন্তল্‌মেন্, প্লীজ—ফর্ গদ্‌স্ সেক্—স্তপ্ কোয়ারেলিং"—

মদোন্মত্ত মানুষদের রক্তে তখন বে-আইনী হিংসা লোলুপ হয়ে উঠেছে। কে কার কথা শুনবে? চোখের পলক ফেলতে না ফেলতেই নাবিকটি একজন চীনার চোয়ালে একটা প্রচণ্ড ঘুষি বসিয়ে দিল। পর-মুহূর্ত্তেই যা ঘটল তা একটা খণ্ড-প্রলয়। অর্কেষ্ট্রা থেমে গেল, প্রায় সমস্ত হলঘরটা দুটো যুধ্যমান দলের চীৎকার ও অশ্লীল গালিগালাজে ভরে উঠল, রং মাখা মদিরনেত্রা সুন্দরীরা আর্ত্তনাদ করে বল্লভদের বাহুবেষ্টনীতে মুখ লুকোল ও পালাবার চেষ্টা করতে লাগল। কিল, ঘুষি, চেয়ার টেবিল ভাঙ্গার শব্দ। বাট্‌লার ও বেয়ারাদের দু'পক্ষকে ঠাণ্ডা করার চেষ্টা। কিন্তু কে কার কথা শোনে?

ইতিমধ্যে আমার হিসেবী বাঙালীরক্ত আমাকে নিরাপত্তার জন্য অনুপ্রাণিত করল, কিন্তু পাশের সেই চিত্রকরকে দেখে আমি আশ্বস্ত হলাম। একমনে সে ছবি এঁকেই চলেছে।

আমি তার পাশে, কোণ ঘেঁষে দাঁড়ালাম। মোটামুটি এটাই সবচেয়ে নিরাপদ জায়গা।

আমার উপস্থিতি টের পেয়ে লোকটি বলল, "খুব ইণ্টারেস্টিং, কি বলেন? এক ব্যাটা কোকেন চোরের জন্য ছবিটা শেষ করেও করতে পারছিনা, ভীড়ের মধ্যে লোকটা অনবরত হারিয়ে যাচ্ছে - ঐ যে"—

ইণ্টারেস্টিং! তা বটে। সেইজন্যেই বাঙালী রক্তের সুবুদ্ধিকে অগ্রাহ্য করে দাঁড়িয়েই রইলাম। সত্যি ইণ্টারেস্টিং। সমস্ত হলবরটায় তখন এ্যামেরিকান ছবির ওয়েস্টার্ন থ্রিল চলছে। ছুরি, কাঁটা, চামচ, গ্লাস আর বোতলগুলো মাথার ওপর দিয়ে শাঁ শাঁ করে ছুটে যাচ্ছে, মেঝে বা দেয়ালের ওপর খান্‌খান্‌ হয়ে ভেঙ্গে পড়ছে, অনেক সময় আবার মাথার ওপরে গিয়েও ভাঙ্গছে এবং মাথা ভাঙ্গছে।

হঠাৎ একজন মাতাল ঝোঁকের মাথায় সবেগে আমাদের দিকে এগিয়ে এল। বেগতিক দেখে আমি সেই লোকটির প্রায় পেছনে গিয়ে দাঁড়ালাম। তার লম্বাচওড়া শরীরটার ওপর দিয়েই যা হবার হয়ে যাক।

"ইউ দেয়ার—ইউ"—

শূন্যে ঘুষি ছুঁড়তে ছুঁড়তে এগিয়ে এল মাতালটা, যেন একটা স্টেডিয়ামে দাঁড়িয়ে কোন মুষ্টিযোদ্ধা সাগ্‌রেদদের লড়াই শেখাচ্ছে।

মাতালটা কাছে এগিয়ে এল।

চিত্রকর ভদ্রলোক ঘাবড়ালে না, ছবিটা একপাশে রেখে সে উঠে দাঁড়াল, মাতালের অসমাপ্ত কথাটা পূরণ করে সে বলল, "কাম্‌ অন্‌—ইউ সান্‌ অব্‌ এ বীচ"—

মাতালটা তার ওপর লাফিয়ে পড়ল, আমি দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়ালাম, টেবিলটা উল্টে যেতে যেতে সামলে নিল। আর সঙ্গে সঙ্গেই সেই লোকটির মুষ্টিবদ্ধ ডানহাতটা গিয়ে মাতালটার মুখে গিয়ে লাগল। চাপা

একটা আর্ত্তনাদ বেরোল তার মুখ থেকে, তারপরেই মাতালটা কাৎ হয়ে মেঝের ওপর পড়ে গেল।

দু'তিন সেকেণ্ড তার দিকে তাকিয়ে থেকে লোকটি আবার ছবিতে আঁচড় টানতে লাগল। আমিও হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। ওদিকে যুদ্ধপর্ব্ব তখনো শেষ হয়নি। কিন্তু আর ভয় করছে না। একজন বলিষ্ঠ লোকের পাশে থাকায় হঠাৎ নিজেকেও যেন মস্তবড় পালোয়ান বলে মনে হতে লাগল। আমি লোকটির ছবির দিকে তাকালাম। হলঘরটারই ছবি এঁকেছে সে। লোকেরা খাচ্ছে, মদের গেলাসে চুমুক দিচ্ছে। বেয়ারারা ছুটোছুটি করছে। রঙীন সুন্দরীরা হাসছে এবং পেছনে অর্কেষ্ট্রা বাজিয়েরা একমনে বাজিয়ে চলেছে। প্রখর বৈদ্যুতিক আলো অথচ ছায়াময় ও ভৌতিক মানুষগুলো। আধুনিক ফরাসী চিত্র-শিল্পীদের সঙ্গে খানিকটা মেলে তার ছবি। রেখার সংযম, পরিচ্ছন্ন কল্পনা, নিখুঁত পরিবেশ-জ্ঞান, শেডের বৈচিত্র্য এবং জীবন সম্বন্ধে দার্শনিক সত্য-দৃষ্টি—বড় শিল্পীর প্রায় সবগুলো লক্ষণই যেন তার মধ্যে আমি আবছা আবছা দেখতে পেলাম। শুধু একটা একরঙা ছবি দেখে তার রঙের কারিকুরীর বিষয়ে কিছুই অনুমান করতে পারলাম না বটে, তবে কৌতূহলান্বিত হলাম। সাদা কালো এই ছবিতেই সে যে কুশলতার পরিচয় দিয়েছে তা থেকেই যেন তার অনাবিষ্কৃত দিকটার আভাস পেলাম।

লোকটি মাথা তুলল, ছবিটা টেবিলে রেখে, তুলি আর কলম হ্যাভারস্যাকে ভরে, মদের গেলাসটা সে এক নিঃশ্বাসে শেষ করে ফেলল, তারপর সহাস্যে বলল, "যাক্, ছবিটা শেষ হয়েছে—বেয়ারা"—

বেয়ারা এসে বিল দিয়ে আমাদের টাকা নিয়ে গেল।

ততক্ষণে হলের মধ্যে মারামারি থেমে গেছে। যুদ্ধশ্রান্ত সৈনিকদের

মত মাতালেরা আবার তাদের ভাঙ্গা টেবিলে গিয়ে বসেছে। চীনা মালিক তার কেশবিরল মাথার বাকী চুলগুলোকেও টেনে ছিঁড়বার চেষ্টা করছে আর গড়িয়ে গড়িয়ে এদিক ওদিক যাচ্ছে। মেঝের ওপর গেলাস, বোতল আর কাপ, প্লেট গুঁড়ো হয়ে ছড়িয়ে আছে, পড়ে আছে টেবিলের ঠ্যাং আর চেয়ারের হাত। কিছু লোক পালিয়ে গেল, কয়েকজন আহত বীরপুঙ্গব আস্ফালন করতে করতে বাইরে গেল। সেই আহত মাতালটাও উঠে লোকটার দিকে একটা জ্বলন্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করে টল্‌তে টল্‌তে ওদিকে গিয়ে বসল।

চীনা মালিকের বিয়োগান্ত কণ্ঠ শোনা গেল, "ও গদ্—আই এ্যাম্ রুইন্দ্—আই এ্যাম্ দান্ ফর্"—

লোকটি ছবিটা কাগজ দিয়ে মুড়তে মুড়তে আমাকে প্রশ্ন করল, "তারপর? ছবিটা কেমন লাগল বললেন না তো?"

আমি তার দিকে তাকালাম, একটু হেসে বললাম, "এককথায় বলব?

"বলুন—গৌরচন্দ্রিকা আমার সহ্য হয় না।"

"চমৎকার হয়েছে আপনার ছবি।"

লোকটি সহাস্যে বলল, "ঐ মাতালটাকে এক ঘুষিতে কাৎ করে ফেলেছি দেখে হয়ত আপনার প্রশংসাটা একটু অতিরঞ্জিত হয়েছে?"

সবেগে মাথা নাড়লাম, "না মশাই। আমি ছবি দেখি, আঁকি না। রঞ্জন অতিরঞ্জনের ব্যাপারটা আপনাদের—আমি ও বিষয়ে একেবারে কাঁচা।"

"বটে! তাহলে ছবিটা আপনার ভালো লেগেছে?"

"হ্যাঁ—এবং আপনার আরো ছবি দেখতে পেলে খুশী হব।"

লোকটি ছেলেমানুষের মত হাসল, "আপনাকে খুশী করতে আমিও গররাজী নই—"

"যদি অনুমতি করেন তবে আমার কাগজে আপনার কয়েকটা ছবি—"

"আপনার কাগজ মানে ?"

মুখে চোখে বিদগ্ধভাব টেনে এনে বললাম, "মানে আমি একটা কাগজের সম্পাদক—"

"কোন কাগজ ?"

সগর্ব্বে বললাম, "ভালো কাগজ।"

লোকটি আমার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল, "তাহলে আপনিই কি অনিমেষ রায় ?"

মাথা নেড়ে বললাম, "হ্যাঁ ?"

"বটে ! আপনি তো একজন স্বনামধন্য লোক মশাই – নমস্কার।"

"নমস্কার, কিন্তু দয়া ক'রে আমায় বিশেষণযুক্ত করবেন না।"

লোকটি তার ঝক্‌ঝকে দাঁত মেলে হাসল, বলল, "খুব খুশী হলাম। আপনি আমার 'হরেন ঘোষ' হতে চান বুঝি ? বেশ বেশ, যাব আপনার ওখানে একদিন"—

তাড়াতাড়ি বললাম, "ছবি নিয়ে কিন্তু"—

"ছবি ! কিন্তু কটা ছবিই বা নিয়ে যাওয়া যাবে ? নিতে হলে তো প্রায় তিন চারটে ট্রাঙ্ক বোঝাই হয়ে যাবে। তার চেয়ে এক কাজ করা যাবে—আপনাকেই বরঞ্চ আমার বাড়ীতে নিয়ে যাব—"

"বেশ"—

"তাহলে এবার সরে পড়ি, কি বলুন ?"

"আচ্ছা—নমস্কার"—

"নমস্কার"—

লোকটি বাইরে বেরিয়ে বাঁ দিকে হাঁটতে সুরু করল, আমি বিপরীত দিকে।

দু'পা এগিয়েই হঠাৎ মনে পড়ল যে ভদ্রলোকের নামটা তো জানা হয়নি!

তাড়াতাড়ি ঘুরে দাঁড়িয়ে লোকটিকে চেঁচিয়ে ডাকলাম আমি, "ও মশাই—ও চিত্রকর মশাই—শুন্‌ছেন"—

লোকটি দাঁড়াল, ফিরে তাকাল আমার দিকে।

চেঁচিয়ে প্রশ্ন করলাম, "আপনার নাম?"

লোকটি একগাল হাসল, "সুব্রত মুখোপাধ্যায়—কিন্তু নাম জেনে কি দরকার অনিমেষবাবু—What's in a name? জানেন না—A flower is a flower—হাঃ হাঃ হাঃ আচ্ছা চলি"—

কথাগুলো শেষ না করেই লোকটি আবার হাঁটতে সুরু করল, পরক্ষণেই ভীড়ের মধ্যে মিশিয়ে গেল। আর ঠিক সেই সময়েই সেই চীনা রেঁস্তোরায় আবার বাজনা সুরু হয়ে গেল। সুব্রতর নামটা মনে মনে আওড়াতে গিয়ে আমি আবিষ্কার করলাম যে নাম জিজ্ঞেস করলেও তার ঠিকানাটা জানতে ভুলে গেছি আমি।

তারপর ধীরে ধীরে সুব্রত'র কথাটা একটা অস্পষ্ট স্মৃতির আকার ধারণ করেছিল, বেশ কিছুদিন দেখা পাইনি তার। কিন্তু হঠাৎ একদিন সে অপ্রত্যাশিতভাবে আমার ওখানে এসে হাজির হয়েছিল।

বলেছিল, "আচ্ছা লোক মশাই আপনি—বাঃ—"

অবাক্ হয়ে প্রশ্ন করেছিলাম, "কেন? কি দোষ করলাম?"

সে সহাস্যে বলেছিল, "দোষ করেন নি? এমন ঘিঞ্জি গলির মধ্যে থাকেন কেন বলুন তো? পাক্কা আধঘণ্টা ধরে যে ঘুরে ঘুরে আমি হায়রাণ হয়ে উঠেছি—উঃ—"

বলেছিলাম, "বিশেষ দুঃখিত—"

"কথায় চিড়ে ভিজবে না মশাই, চা খাওয়াতে পারেন ?"

"আলবৎ"—

সেদিন সে আমাকে তার বাড়ীতে নিয়ে গিয়েছিল সন্ধ্যের সময়। বাড়ীটা দ্বিতল, বেশ বড়। সাজানো গোছানো ঘরদোর, দেখে তাদের অবস্থা ভালই মনে হয়েছিল।

বলেছিলাম, "তাই"—

"মানে ?"

"মানে বড়লোকের ছেলে বলেই ছবি আঁকার মত সৌখীন শিল্পচর্চ্চা করতে পারছেন।"

সে হো হো করে হেসে উঠেছিল, "যা চক্‌চক্ করে তাই কি সোনা ? নাঃ, 'ভালো কাগজের' ভালো সম্পাদকের বুদ্ধিটা কিন্তু ভালো নয়।"

"কেন ?"

"বড় লোকের না হলেও অবস্থাপন্ন লোকের ছেলে বটে আমি কিন্তু সেই ভদ্রলোকটি বেশ কিছুদিন হল মারা গেছেন। বাড়ীঘর, সম্পত্তি প্রভৃতিতে আমার অংশ থাকলেও আসলে আমার কাকাবাবুই তার মালিক—বুঝলেন না ? অবস্থাটা একটু গোলমেলে"—

লজ্জা পেয়েছিলাম তার কথায়।

তার ঘরে নিয়ে গিয়ে সে আমাকে তার ছবি ও স্কেচগুলো দেখিয়েছিল এক এক করে। বেশ মনে আছে যে পুরো তিন ঘণ্টা সময় লেগেছিল। অগোছাল ঘরের চারদিকে ছবিগুলো ছড়ানো অবস্থায় ছিল, দেয়ালগুলোতে আর জায়গা ছিল না। বিছানা ও কাপড়জামা রাখার ছিরি দেখে বুঝতে পেরেছিলাম যে লোকটা নিজের

বিষয়ে যত্ন নিতে জানে না, অর্থাৎ সে একজন আত্মভোলা শিল্পী। অয়েল-পেন্টিং, ওয়াটার-কলার ও স্কেচ্ সব রকমের ছবিই সেখানে ছিল। একের পর এক দেখেছিলাম সবগুলো ছবি। তিন ঘণ্টা ধরে। দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। রংয়ের বৈচিত্র্য, প্রচণ্ড শক্তিশালী ও ইঙ্গিতময় রেখা এবং সুপরিচিত অথচ আশ্চর্য্যভাবে অভিনব বিষয়বস্তু—এতগুলো গুণের একত্র সমাবেশ আমি এর আগে কোনো আধুনিক বাঙ্গালী-শিল্পীর মধ্যে দেখিনি। ছবিগুলোর সবচেয়ে বড় কথা ছিল তাদের সংযম। যে কোনো শক্তিমান্ শিল্পীর মধ্যেই তার দরকার এবং চিত্র-শিল্পীর পক্ষে তা একান্তভাবে অপরিহার্য্য। এদেশের গগনেন্দ্রনাথ এবং বিদেশের ভ্যান গঘ্, গগ্যাঁ এবং মাতিসেঁ যেন ছবিগুলোর আড়ালে ছিল, অথচ আরো কিছু ছিল যা সুব্রতের নিজস্ব। বিদেশী শিল্পীদের ধারাই তাকে বেশী প্রভাবান্বিত করেছিল। কিন্তু তার স্বকীয়তা এবং জাতীয়তাকে হরণ করতে পারেনি। সহজ, সরল, ছন্দ-যুক্ত অথচ গভীর ভাবোদ্দীপক ছবিগুলোকে দেখে আমি সেদিন থেকেই সুব্রতকে শক্তিমান্ বলে স্বীকার করে নিয়েছিলাম এবং ভেবেছিলাম যে ধীরে ধীরে সে বিদেশের শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের প্রভাব থেকে সম্পূর্ণভাবেই মুক্ত হয়ে যাবে।

সেদিন সুব্রতের মায়ের সঙ্গেও আলাপ হয়েছিল, চমৎকার মানুষ। পরে সুব্রতের পুরো পরিচয়টাও জানতে পেরেছিলাম আমি। তার বাবা বেশ ভালো একটা চাকুরী করতেন, তার কাকাও বড় চাকরী করেন। মোটামুটি অবস্থা তাদের বেশ ভালো। এই বাড়ীটা তাদের, এতে সুব্রতেরও অংশ আছে। তা ছাড়া দেশে জমি-জায়গাও কিছু কম নেই। অভাবের বালাই নেই সুব্রতের বাড়ীতে। সংসারে এখন তার মা, কাকা, কাকীমা, খুড়তুতো দুই বোন ইলা ও শীলা ছাড়া

আর কেউ নেই। বোনেরা তাকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসে, তার ছবি দেখে গর্ব্ববোধ করে। কিন্তু একটা বিষয়ে তার গভীর দুঃখবোধ আছে। তার কাকা তাকে সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করার চেষ্টায় আছেন। কথাটা সে খোলাখুলি আমাকে না বললেও আমি তা বুঝতে পেরেছিলাম। আরো বুঝেছিলাম যে সুব্রতের মনে দুঃখবোধ ছাড়া এ বিষয়ে আর কোনো উগ্রভাব নেই। সম্পত্তির জন্য বড়াই করার মনোবৃত্তি বা লোভ তার একটুও নেই।

ছবিগুলোর মধ্যে একটা ছবি দেখে আমি বিশেষ করে আকৃষ্ট হয়েছিলাম। অর্দ্ধ-নগ্ন একটি অভিজাত যুবতী নিজের যৌবনশ্রীকে দেখে মৃদু মৃদু হাসছে, মুগ্ধ হয়ে গেছে।

বলেছিলাম, "বাঃ—চমৎকার তো!"

মুহূর্ত্তের জন্য সুব্রতের মুখে চোখে একটা আলো দেখতে পেয়েছিলাম। তা থেকে সন্ধানী ডিটেকটিভের মত আমি সেদিন অনুমান করেছিলাম যে এই ছবির নারীমূর্ত্তি তার জীবনের সঙ্গে জড়িত।

প্রশ্ন করেছিলাম, "এই ছবির নাম কি?"

সে হেসে বলেছিল, "নাম এখনো ঠিক করিনি—তবে 'এ যুগের অপ্সরী'— এমনি একটা নামই দেব।"

আর কোনো প্রশ্ন সেদিন আর করিনি আমি। বেশীদূর এগোবার মত অন্তরঙ্গতা তখনো হয়নি বলে। কয়েকটা ছবি বেছে নিজের কাগজে ছাপব বলে ফিরে এসেছিলাম। তারপরে অতি দ্রুত আমরা দুজনে ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠলাম। 'আপনি' থেকে 'তুমি' হলাম। আমার কাগজে প্রায়ই তার ছবি বেরোতে লাগল, রসিক-মহলে সে প্রশংসাও অর্জ্জন করতে সুরু করল। সেই সুব্রতই আমাকে এখন বিপদে ফেলেছে। পূজো সংখ্যা বেরোতে আর দেরী নেই অথচ এখনো আমি তৈরী হয়ে উঠতে পারিনি।

রীতিমত বিগড়ে গেল মেজাজটা। মনের তিক্ততা আরো বেড়ে গেল এইজন্য যে সুব্রত আমার পুরোনো বন্ধু। শক্তিমান্ শিল্পী হিসেবে আমার সঙ্গে সে যাই করুক না কেন, বন্ধু হিসেবে সেটা তার শুধ্‌রে নেওয়া উচিত ছিল।

সব কিছুই বিস্বাদ মনে হচ্ছে। বাইরেও আবহাওয়াটা আমার মনের মত। আকাশ ঘোলাটে মেঘে ভারী হয়ে আছে, অনবরত টিপ্‌ টিপ্‌ বৃষ্টি পড়ছে, একটানা ঠাণ্ডা বাতাস বইছে। একা ঘরের মধ্যে বসে আছি। আজ যে কেউ আড্ডা দিতে আসবে এমন সম্ভাবনা নেই। অথচ বাইরে যাওয়ারও উপায় নেই—এক গাদা প্রুফ দেখতে হবে। আর উপায় থাকলেই বা কি, এই জল-কাদায় কি বেড়িয়ে স্বস্তি পাব?

কিন্তু এই মুহূর্ত্তে কি করি? প্রুফ আস্‌তে এখনো তো ঘণ্টাখানেক দেরী।

হাঁক দিলাম, "কানাই—এক কাপ চা নিয়ে আয়তো"—

সঙ্গে সঙ্গে একজনের জোরালো গলা শোনা গেল, "এক কাপ নয়, দু'কাপ চা নিয়ে আয়রে কানাই"—

সবিস্ময়ে সামনের দিকে তাকালাম। মুহূর্ত্তকাল আগেও যাকে আশা করিনি, সেই লোকটিই দরজার গোড়ায় এসে দাঁড়াল।

"সুব্রত!"

সুব্রত হাসল, বড় বড় পা ফেলে সে আমার সামনে এসে দাঁড়াল, কাঁধ থেকে ঝোলানো হ্যাভারস্যাকটা একটা চেয়ারের পেছনে আটকে দিয়ে বসে পড়ল। তাকালাম। এ কয়দিনে বিশেষ কোনো পরিবর্ত্তন

হয়নি তার ; দীর্ঘকায়, হাস্তমুখ, উদ্ধত ও সুদর্শন – ঠিক আগের মতই আছে সে, কেবল একটু রোগাটে মনে হচ্ছে এই যা।

সুব্রত বলল, "কিহে, মুখটা হাঁড়ির মত করে বসে আছ কেন ?"

ওর কথায় ভ্রূক্ষেপ না করে কঠিনকণ্ঠে প্রশ্ন করলাম, "আমার ছবি এনেছ ?"

"না"।

মাথায় রক্ত চড়ে গেল, নিজেকে আর সাম্‌লাতে পারলাম না, গাল দিয়ে বললাম, "তুমি একটা পাজী, হতভাগা লোক সুব্রত মুখোপাধ্যায়।"

"কিন্তু তুমি গাল দিচ্ছ কেন অনিমেষ রায় ?"

"তুমি কুড়ের বাদ্‌শা, ভ্যাগাবণ্ড, স্কাউণ্ড্রেল্"—

"ছি ছি ছি, বুড়ো বয়সে মুখ খারাপ করছ সম্পাদক ?"

"শয়তান্, বাস্তু-ঘুঘু"—

"থামো, থামো ভাই, দোহাই তোমার—করজোড়ে প্রার্থনা করছি আমি - হে সম্পাদক, ক্রোধ সংবরণ কর"—

থামতেই হল। প্রার্থনার জন্য নয়, কানাই চা নিয়ে এল বলে।

কানাই চলে যেতেই সুর নরম করে জিজ্ঞেস করলাম, "তুমি কি আমাকে বিপদে ফেলতে চাও সুব্রত ?"

সুব্রত সহাস্তে মাথা নাড়ল, বলল, "মোটেই না।"

"তাহলে তোমার এতদিন দেখা নেই কেন ? আর আমাকে ছবিগুলোই বা দিচ্ছ না কেন বলত ?"

"মাথার ঠিক নেই।"

"তার মানে ? মাথাটা তো দিব্যি বড়সড় আছে।"

"উঁহু, ঠিক নেই—মানে প্রেমে পড়েছি বোধ হয়।"

বিশ্বাস হল না। মেঘলা দিনে সুব্রত বোধ হয় একটা আষাঢ়ে গল্প শোনাবে!

"ব্যাপার কি? আমি তো কিছুই জানি না।"

সুব্রত হাসল, "জানবে কি করে? কেউ কি নোটিশ দিয়ে প্রেমে পড়ে?"

অবাক হলাম, "কিন্তু তুমি! তোমার মত—"

সুব্রত মাথা নাড়ল, "হ্যাঁ, আমার মত হিদেনও প্রেমে পড়ে।" চায়ের কাপে চুমুক দিল সে, নিজের মধ্যে খানিকটা উষ্ণতার সঞ্চার করে নিয়েই সে আবার বলল, "আর সেই কাহিনীই তোমাকে আজ বলব। শুনবে?"

রাগ উড়ে গেল, সাগ্রহে বললাম, "বল, প্রেমের গল্প না শোনার মত পাপ আমি করতেই পারি না!"

"সাধু। কিন্তু তোমাকে এখন বেরোতে হবে আমার সঙ্গে—"

"এখন! এই বিষ্টিবাদলায়—তাছাড়া সন্ধ্যে হয়ে এল—"

"যেতেই হবে – প্রেমের গল্প এখানে জমবে না – দিস্ ইজ্ হেল্—"

"কিন্তু প্রুফ্ দেখা বাকী আছে, একগাদা"—

"আজকের মত তা চুলোয় যাক"—

আমাকে প্রায় টেনে নিয়ে বেরোল সুব্রত। সেদিন সেই চীনে রেঁস্তোরাতে মাতাল সাহেবকে এক ঘুষিতে ধরাশায়ী করার কাহিনীটা তখনো স্পষ্ট মনে ছিল বলে দ্বিরুক্তি করলাম না, তার সঙ্গে তার প্রেমের কাহিনী শোনবার জন্যই বেরোলাম।

বাইরে পা দিয়ে একটু ক্রুদ্ধভাবেই বললাম, "তুমি ভারী গোঁয়ার সুব্রত।"

সুব্রত মাথা নাড়ল, "রাইট্, কথাটা মিথ্যে নয়। ছেলেবেলা থেকেই

শুধু গোঁয়ার নই ; গোঁয়ার গোবিন্দ আমি। যখন যেটা মাথায় চেপেছে তখুনি সেটা করে ছেড়েছি। চিত্র-শিল্পী হবার পেছনেও এমন একটা গোঁ ছিল আমার”—

“মানে ?”

“বলছি। প্রকৃতি ও মানুষ যখনি চোখে পড়ে তখনি তা রঙ ও রেখার আকারে ছাপ দেয় আমার মনে, আমাকে তা ছবি আঁকবার জন্য উত্তেজিত করে। সেটা আজও যেমন অনুভব করি, আগেও তেমনি করতাম। বাইরের জগৎটাকে অনুভূতির রঙে রাঙিয়ে, তুলি দিয়ে ধরে রাখার জন্য আকুল হয়ে উঠতাম। এই আকুলতাই আমাকে শেষে চিত্রশিল্পী হবার প্রেরণা দিল। বাবা তখন বেঁচে ছিলেন, তিনি বাধা দিলেন। কিন্তু গোঁয়ার্ত্তুমির জন্য খ্যাতিমান্ আমি, বেঁকে বসলাম, বাবার ইচ্ছেমত বি-এ, এম্-এ, পাশ করে একটি শান্ত-সুবোধ সরকারী কর্ম্মচারী হওয়ার কল্পনা আমি করতেই পারলাম না। একটিমাত্র সন্তান আমি, আমার ইচ্ছের কাছে বাবাকে শেষ পর্য্যন্ত হার মানতেই হল। আমি আর্ট স্কুলে ভর্ত্তি হলাম।”

কৃত্রিম প্রশংসার সুরে বললাম, “সাবাস্, কিন্তু, যাই বলনা কেন, তুমি ভারী খেয়ালী”—

এবার সে প্রশ্ন করল, “তার মানে ?”

“মানে তুমি জীবন সম্বন্ধে ভারী উদাসীন”—

“ভুল কথা।”

“কি করে ?”

“আমি ঠিক বিপরীত।”

“অর্থাৎ ?”

“আমি খেয়ালীও নই, উদাসীনও নই। জীবন সম্পর্কে আমার

প্রচণ্ড আগ্রহ আছে বলেই আমার কথার ঠিক থাকে না, সব সময়ে এক জায়গায় থাকিনা, অনবরত ঘুরে বেড়াই, দেখে বেড়াই। সমস্ত পৃথিবী এবং পৃথিবীর প্রতিটি মানুষ আমার কাছে নানা সাইজের ফ্রেমে-আঁটা নানা আকারের ছবি। তাদের রংয়ের বৈচিত্র্য, তাদের আঁচড়ের বৈশিষ্ট্য আমাকে প্রতিমুহূর্ত্তে হাতছানি দিয়ে ডাকে বলেই আমি তোমাদের নিয়ম মেনে চলতে পারিনা। আমাকে ভুল বুঝোনা অনিমেষ রায়। আমিও তোমাদের মত সুস্থ, স্বাভাবিক এবং জীবনকে ভালবাসি।"

"সাধু, সাধু—কিন্তু ব্যাপার কি ?"

"কি হল ?"

"আসল কথাই যে চাপা পড়ে যাচ্ছে।"

"কি কথা ?"

"প্রেম ?"

সুব্রত হেসে উঠল, "দাঁড়াও সম্পাদক, সবুরে মেওয়া ফলে—"

"তার মানে ?"

"প্রেমের গল্প বলতে হলে একটা ভালো জায়গা চাই।"

আবার চৌরঙ্গী। পিকাডিলিতে গিয়ে বসলাম দুজনে। তখন সন্ধ্যে না হলেও হয়েছে। মেঘলা দিনের অন্ধকারের সুযোগ পেয়ে আগে থেকেই মহানগরীতে রাত এসেছে। বাতিগুলো জ্বলে উঠেছে। বৃষ্টিপড়া একটু থেমেছে বটে কিন্তু আকাশ আগের মতই ঘোলাটে, মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, দম্‌কা জোলো হাওয়া শন্ শন্ করে বয়ে যাচ্ছে। রাস্তাঘাট ভিজে, চক্ চক্ করছে রাতের নদীর বুকের মত। রাস্তার নানা রঙের আলো আর মোটর বাসের হেডলাইটগুলো তার ওপর প্রতিফলিত হচ্ছে। আর এদিকে পিকাডিলির হলঘরে

সুসজ্জিত নরনারীর ভীড়, বয়দের ব্যস্ততা, কাপ-প্লেট আর কাঁটাচামচ, সোডার বোতল আর কাঁচের গ্লাসের শব্দ, হাসি আর অর্কেষ্ট্রার আওয়াজ। সুব্রতের ওপর রাগ করতে পারলাম না। এই সব বিলিতী হোটেল আর সেখানকার নিয়মিত খরিদ্দার নরনারীদের আমার খুব সুবিধের মনে হয় না। তবু পরিবেশটা ভালো লাগল, বর্ষা-ক্লান্ত দিনান্তে প্রেসের নোংরা আবহাওয়া থেকে অনেক দূরে, হঠাৎ কেন যেন জীবনকে আশ্চর্য্য মনে হল। এবং সঙ্গে সঙ্গেই সুব্রতকে যেন খানিকটা বুঝলাম।

বয় এসে কাছে দাঁড়াল।

সুব্রত প্রশ্ন করল, "চলবে নাকি রায়সাহেব ?"

"কি চলবে ?"

"তরলাগ্নি সুধা ?"

"সুধা পান করে তুমি একাই মৃত্যুঞ্জয়ী হও ভাই, আমায় কিছু গরম খাবারের সঙ্গে চা দাও"—

"তথাস্তু।"

বয়কে অর্ডার দিল সে। খাবার ছাড়া তার নিজের জন্য দু'পেগ হুইস্কি।

প্রশ্ন করলাম, "আচ্ছা সুব্রত, একটা কথা জিজ্ঞেস করব ?"

"স্বচ্ছন্দে।"

"তুমি মদ খাও কেন ?"

সুব্রত আমার দিকে একটা চকিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বলল, "অত কথা ত ভাবি না ভাই, মাঝে মাঝে খাই, অত ভেবে লাভ কি ?"

"মাঝে মাঝেই বা খাও কেন ?"

"কেন ? এই—এই তোমার গিয়ে খেলে পরে কেমন যেন মাথাটা

খেলে ভাল। অনেক সময় আঁকবার মত অনেক কিছু জড় হয়ে গিয়ে শেষ পর্য্যন্ত কোনটাই আঁকা সম্ভব হয়ে ওঠে না, অথচ না আঁকলে প্রাণ বেরিয়ে যাবার উপক্রম হয় তখন একআধ পাত্তর খেলেই যেন সমস্যাটা মিটে যায়"—

একটু গম্ভীর ভাবে বললাম, "তুমি এবার বিয়ে কর সুব্রত।"

সুব্রত হেসে উঠল, "হেল্! কি বলছ তুমি! ওসব ভাববার মত সময় এখন হয়নি। তাছাড়া আগে প্রেমের ব্যাপারটার এস্‌পার ওস্‌পার হয়ে যাক তবেই না বিয়ে।"

হঠাৎ মনে পড়ায় সচকিত হয়ে উঠলাম, বললাম,"ঠিক কথা, তোমার প্রেমের কথা এবার বল"—

সুব্রত শয়তানের মত মৃদু হেসে বলল, "ধীরে রজনী, ধীরে। হীরে পেতে হলে মাটি খুঁড়তে হয়, মুক্তো চাইলে সমুদ্রে ডুবতে হয়—একটু সবুর কর"—

"বাঃ—এত গৌরচন্দ্রিকা কেন?"

বয় এসে খাদ্য ও পানীয় টেবিলের ওপর রাখল, সোডার বোতল খুলে হুইস্কির সঙ্গে মিশিয়ে দিয়ে গেল। উগ্র গন্ধের ঝাঁঝে আমার সমস্ত শরীরটা যেন কণ্টকিত হয়ে উঠল।

মদের গেলাসে তৃষ্ণার্ত্তের মত একটা চুমুক দিয়ে সুব্রত হাসল, বলল, "গৌরচন্দ্রিকা শেষ হল এবার—বলছি"—

"বল"—

"সেদিন আমার আঁকা সমস্ত ছবিগুলোই তো দেখেছিলে, কেমন?"

"হ্যাঁ"—

"একটা ছবির কথা মনে আছে? তুমি যেটার নাম জিজ্ঞেস

করেছিলে? আমি বলেছিলাম—'এ যুগের অপ্সরী'—এমনি একটা নামই দেব?"

মনে পড়ল ছবিটার কথা। একটি সুঠাম-দেহী সুন্দরী যুবতীর ছবি। তার শাড়ীর আঁচল মাটিতে লুটোচ্ছে, উন্মুক্ত ব্লাউজের তলা থেকে তার অনাবৃত বক্ষ-পদ্মের শোভা উদঘাটিত হবার উপক্রম করেছে এবং সেদিকে তাকিয়ে যুবতীটি মুগ্ধ হয়ে গেছে, নিজের রূপৈশ্বর্য্য দেখে সে গরবিনীর মত মৃদু মৃদু হাসছে। পরিষ্কার মনে পড়ল ছবিটাকে।

তাই মাথা নেড়ে বললাম, "মনে পড়েছে—বেশ ভালো ছবি সেটা।"

সুব্রত অসহিষ্ণুর মত হাত নাড়ল, "ছবি যে ভালো তা আমি জানি—কিন্তু"—

তাকে একটু উত্তেজিত করার জন্যই গম্ভীরভাবে বললাম, "জানো! বাঃ—তুমি দেখছি অহঙ্কারী!"

সে মাথা নাড়ল, "তা বলতে পারো—তাতে আমার বয়ে গেছে। শক্তিমান শিল্পীমাত্রেই অহঙ্কারী। তার অহং বোধটা তীব্র বলেই সে শিল্পবস্তুকে নিজের করে বলে, আঁকে—নইলে সে হয়ত শুধু বড় শিল্পীদের অনুকরণ করতেই ব্যস্ত থাকবে। কিন্তু শোন অনিমেষ রায়, তুলির মত হাল্‌কা জিনিষ ধরলেও আমার ঘুষির ওজন যে কম নয় সেকথা বোধ হয় তুমি জানো?"

খুব মিষ্টি হেসে মাথা নাড়লাম, "জানি বৈকি, পাঁচশোবার জানি।"

"তাহলে সাবধান—আমার কথা শেষ করতে দাও।"

"কর ভাই, তোমার কথা শেষ কর—আমি একেবারে পাথরের মত বোবা হয়ে থাকব।"

মদের গেলাসে আবার চুমুক দিল সুব্রত।

আমি বললাম, "তারপর! বলে যাও। তোমার সেই ছবি তো আমি দেখেছি সেদিন—এখনো আমার মনে পড়ছে তা—তারপর?"

সুব্রত তাকাল আমার দিকে, ভুরু কুঁচকে প্রশ্ন করল, "ছবির মানুষটাকে কেমন লাগল?"

"মানে মেয়েমানুষটিকে?—তা বেশ সুন্দরী—সচরাচর অমন রূপ খুব কম দেখা যায়।"

সুব্রতের মুখ চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল, মুহূর্ত্তে একটা শিশু-সুলভ মিষ্টি হাসি তার ঠোঁটের দুপাশে ছড়িয়ে গেল, সে বলল, "তাহলে এমন একটি মেয়েকে ভালাবাসা যায়।"

আমি তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তার দিকে তাকালাম, প্রশ্ন করলাম "দেখতে সুন্দর হওয়াটা ভালবাসবার ব্যাপারে একটা সোপান বটে কিন্তু সেইটাই কি শেষ কথা সুব্রত? তুমি ত' শিল্পী—তোমার কাছে সৌন্দর্য্য মানে কি শুধু নয়নাভিরাম?"

সুব্রত উত্তেজিত হয়ে উঠল, "শিল্পীর কাছে সৌন্দর্য্যের সংজ্ঞা আলাদা—কিন্তু সে কথা কেন? শিল্পী যখন ভালবাসতে চায় তখন সে মানুষ হিসেবেই ভালবাসে।"

"ঠিক কথা। কিন্তু মানুষের মত ভালবাসলেও তার ভেতরকার শিল্পী ত' মরেনা।"

"অত বুঝতে আমি চাইনা অনিমেষ। বেশী বুঝতে গেলে আবার ভালোবাসা যায় না।"

তবু দমলাম না, প্রশ্ন করলাম, "আচ্ছা সুব্রত, প্রেম জিনিষটা কি?"

সুব্রত প্রশ্নটা এড়িয়ে গেল, বলল, "আগে প্রেম-পর্ব্বটা শেষ হোক তারপর বলব। তবে তোমরা যতটা সূক্ষ্ম ব্যাপার বলে মোটা মোটা বই

দেখ ওসব কিছু নয়। প্রেম হচ্ছে নিছক একটা দৈহিক আকর্ষণ এবং পরস্পরের সঙ্গ-কামনা।"

সুব্রতের দিকে তাকালাম। হুইস্কির প্রতিক্রিয়া তার ছল্‌ছল্‌ চাউনির মধ্যে পরিষ্কার ধরা পড়ল। আর তর্ক করে লাভ নেই। চুপ করেই রইলাম। সুব্রত যে প্রকৃতির ছেলে ওতে তর্কে কোন ফল হবে না। নিজে অনুভব না করা পর্য্যন্ত সে কোন কিছুতে বিশ্বাস করেনা।

তাই মৃদু হেসে বললাম, "ঠিক বলেছ তুমি। তারপর? তোমার পূর্ব্বরাগের পালার কোন্ অধ্যায় চলছে এখন? গদগদ ভাষায় কি আত্ম-ঘোষণা করেছ?

সুব্রত সহাস্যে মাথা নাড়ল, "আত্ম-ঘোষণা না, দাবী। আজ বলেছিলাম সে কথা।"

"তারপর?"

"তারপর আবার কি? মুখটা যেন জবাফুল হয়ে গেল, রাঙা ঠোঁট দুটোর মাঝে হাসি দেখা দিল এবং হাত ধরে একটু টানতেই বুকে এসে মাথা রাখল।"

"বটে রীতিমত রোমাঞ্চকর সংবাদ! বড় বড় হেড-লাইন দিয়ে আজই সংবাদ-পত্রে ছাপা উচিত যে আদমের একজন অন্যতম বংশধর চিরকালের মতই আজ একটি ইভের প্রেমে পড়েছে"—

"সম্পাদক! সাবধান"—

"তারপর? তোমার এ যুগের অপ্সরীর নাম কি?"

"শিপ্রা।"

"আহা—কি মধুবর্ষী নাম! তা কন্যার পিতা কি করেন?"

"রিটায়ার্ড সাবজজের একমাত্র মেয়ে সে।"

"এ যে একেবারে রূপকথার রাজকন্যা, সুব্রত—খুলে পড়।"

"সত্যি ভাই অনিমেষ, শিপ্রা ইজএ প্রিন্সেস্—এ ওয়াণ্ডার—" মদের গেলাসে চুমুক দিয়ে সুব্রত শিপ্রার বিষয়ে বলতে আরম্ভ করল। সে অনেক কথা। তার সারাংশ এই যে শিপ্রা তার বড় বোন শীলার বান্ধবী। তা ছাড়া সুব্রতের বাবা অধ্যাপক ও পণ্ডিত মানুষ হিসেবে অভিজাত মহলে বিশেষ পরিচিত ও প্রতিপত্তিশীল ছিলেন। এইসব কারণে অনেকদিন ধরেই শিপ্রা তাদের বাড়ীতে আসা-যাওয়া করে এবং পারিবারিক দিক থেকেও তাদের সঙ্গে বেশ ঘনিষ্ঠতা আছে। শিপ্রা কিছুদিন আগে আশুতোষ কলেজ থেকে বি, এ পাশ করেছে। রীতিমত স্মার্ট মেয়ে সে দুঃসাহসী, মুখরা চঞ্চলা। কি না পারে সে? শিপ্রা হচ্ছে আধুনিকতম নারী-প্রগতির জীবন্ত উদাহরণ। সেই শিপ্রা বহুদিন ধরেই সুব্রতের এ্যাডমায়ারার, তার ছবি দেখে শিপ্রার চোখে পলক পড়ে না। ক্রমেই সুব্রত তার কাছে হিরো হয়ে উঠল এবং এই অবস্থাতেই সে সানন্দে তার মডেল হল। সুব্রত নিজের চিরাচরিত স্বভাব অনুযায়ী তেমনভাবে লক্ষ্য করেনি শিপ্রাকে। লক্ষ্য করার পরই সে ছবি আঁকতে সুরু করল তার। লক্ষ্য করার সঙ্গে সঙ্গেই সে ভাবল যে মেয়েটি তো দেখতে বেশ, চাল-চলনে, কথাবার্ত্তাতেও বেশ আপ্-টু-ডেট, মানে প্রেমে পড়ার উপযুক্ত মেয়ে। বেশ লাগল আইডিয়াটা। আর সুব্রতের কাছে আইডিয়া মানেই এ্যাকশন। ভাবনা মানেই কর্ম্ম। সুতরাং হঠাৎ আজ—। শিপ্রা একটি আশ্চর্য্য মেয়ে।

সুব্রত যেখানে উচ্ছ্বাসের আতিশয্যে থেমে গেল আমি সেখানে আরো একটা সিদ্ধান্ত যোগ করলাম। আমি শিপ্রাকে দেখিনি। শুধু সেদিন তার ছবি দেখেছিলাম। তবু তার চরিত্রের অনেক কিছুই যেন আমি সেদিন জানতে পেরেছিলাম। তার ছবি দেখে আমার মনে হয়েছিল যে তার রক্তে উচ্ছৃঙ্খলতা আছে, আছে হিংস্র

কামনা, জীবনটা তার কাছে একটা ভোগপাত্র এবং তার মধ্যে গভীরতা নেই। যে নদী গভীর নয় সেখানে ভরসা কোথায়? গ্রীষ্মের খরতাপে তো সে নদী শুকিয়ে যাবে। কিন্তু আমার এই সিদ্ধান্ত আমি শুধু মনে মনেই আওড়ালাম, কারণ তা মুখ ফুটে বলার কথা নয়। শুধু ভাবলাম যে আমার সিদ্ধান্ত যেন মিথ্যেই প্রতিপন্ন হয়। সুব্রতের কথাই যেন সত্যি হয়, শিপ্রা যেন আশ্চর্য্যই হয়।

তার কথা শেষ হলে আমি মুখে হাসি টেনে বললাম, "কন্‌গ্র্যাচুলেসনস্‌ ইয়ংম্যান—তোমার প্রেম-পর্ব্ব যুগলাঙ্গুরীয়ের বন্ধনে শিগগীরই সমাপ্তি লাভ করুক এবং হতভাগ্য সম্পাদক এক পেট ভোজন করার সৌভাগ্য অর্জ্জন করুক এই কামনা জানাচ্ছি"—

সুব্রত হেসে উঠল, "তুমি অকৃতজ্ঞ"—

"কেন?"

"আজ যা খাওয়াচ্ছি তা কি কম? এর চেয়ে"—

কিন্তু কথাটা বলতে বলতেই সে থেমে গেল। তার দৃষ্টি অনুসরণ করতে গিয়ে আমাকে ডানদিকে মুখ ফেরাতে হল। দেখলাম যে দুটো টেবিলের পরবর্ত্তী টেবিলে একটি এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান মেয়ে বসে আছে। বয়স একুশ বাইশ, তীক্ষ্ণ নাক চোখ, লম্বাটে মুখ। মাথায় ড্রেস-করা রেশমী চুল আর উজ্জ্বল গৌরবর্ণ মুখের ওপর রুজ, পাউডার ও লিপস্টিকের পুরু আস্তরণ। বোধ হয় সেও মদ খাচ্ছিল, অস্বাভাবিক একটা ঔজ্জ্বল্য ছিল তার দু'চোখের তারায় এবং সে সুব্রতকে লক্ষ্য করছিল।

হঠাৎ মেয়েটি হাসল, রঙীন ঠোঁটের আড়াল থেকে তার ঝকঝকে ও সুবিন্যস্ত দাঁতগুলো ঝিলিক মেরে উঠল। সে হাসিতে হিংস্রতার সাথে বিচিত্র একটা মদির আহ্বান ছিল। তার মধ্যে ছিল পৌরুষের স্বীকৃতি—নগ্ন, নির্লজ্জ ও স্পষ্ট। কিন্তু তাই কি? সুব্রতকে দেখেই কি হাসল

মেয়েটি? ফিরে তাকালাম সুব্রতের দিকে। সত্যি তাই। সুব্রতও মৃদুভাবে হাসছে। কিন্তু সে হাসিতে কামনা ছিল না। আমায় বিশ্বাস করলে আমি জোর দিয়ে বলব যে সে হাসিতে ছিল করুণা, আশ্চর্য্য ও ছেলেমানুষী একটা কৌতুহল। মেয়েটি যে আসলে রাতের জীব, তা বুঝতে একটুও কষ্ট হয়নি আমার, সুব্রতও তা বুঝেছিল। কিন্তু তার মদির ও উত্তেজক যৌবন সুব্রতকে একটুও আকৃষ্ট বা বিচলিত করেনি। যদি করত তাহলে তার মৃদু হাসির মধ্যে তা ধরা পড়তই। কারণ মানুষের কামনা বা লালসা খুব সহজেই তার মুখের ওপর ভেসে ওঠে। সুব্রতের সেই হাসি দেখে মেয়েটির দিকে আবার ফিরে তাকাতেই আমি লক্ষ্য করলাম যে কানের পাশ থেকে চুল সরাবার জন্য হাত তুলে সে এমন একটা ভঙ্গী করল যাকে ইঙ্গিত ছাড়া আর কিছুই বলা চলেনা। সেই ইঙ্গিতের অর্থ—'চল'।

হঠাৎ আমাকে অবাক করে দিয়ে সুব্রত উঠে দাঁড়াল।

রীতিমত উত্তেজিত হয়ে প্রশ্ন করলাম, "এর মানে?"

সুব্রত আমার দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টি মেলে একটু ভেবে নিল, তারপর নিম্নকণ্ঠে বলল, "ঐ যে এ্যাংলোইণ্ডিয়ান মেয়েটাকে দেখছ ও আমাকে ডাকছে"—

"ও কি জাতের মেয়ে তা জানো?"

"জানি।"

"তবে যাচ্ছ যে?"

"ওকে জানতে—জীবনকে জানতে।"

"কিন্তু এই কি জীবন?"

সুব্রত নিমেষে গম্ভীর হয়ে উঠল, বলল, "জীবন মানে শুধু তোমার জীবনই নয়, অনিমেষ রায়।"

জবাব দিতে পারলাম না। কথাগুলোর আড়ালে যে প্রচণ্ড সত্য ছিল তাকে এককথায় ঠেলে দেওয়া যায় না। সত্যি, মানুষের জীবন তো শুধু একজন দুজন মানুষকে নিয়ে নয়। কোটি কোটি রাম শ্যামের জীবন নিয়েই মানুষের জীবন—জটিল, বৈচিত্র্যময়, মহাকাব্যের মত।

সেই এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান মেয়েটি তখন বিল মিটিয়ে ব্যাগ নিয়ে উঠে দাঁড়াল, এবার সুব্রতের দিকে একটা চকিত ও শাণিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করেই সে তার হাই-হিল জুতোর মৃদু শব্দ তুলে দরজার দিকে এগিয়ে গেল।

সুব্রত দ্রুতকণ্ঠে বলল, "আধঘণ্টার মধ্যে ফিরে আসছি আমি—মডেল হিসেবে মেয়েটা ভারী ইণ্টারেস্টিং"—

সুব্রতের কাণ্ড দেখে মেজাজ খারাপ হয়ে উঠলেও আমার বৈষয়িক বুদ্ধিটা বেশ জাগ্রত ছিল, তাই সতেজে বললাম, "তোমার মডেলের সঙ্গে তুমি আমাদের নরক নামক জাহান্নমে যাও সুব্রত মুখুজ্জে। শুধু যাবার আগে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি যে এই টেবিলের বিলটি তুমি এখনো মিটিয়ে যাওনি"—

পা বাড়িয়ে সুব্রত বলল, "তুমি কম রোজগার করো না বন্ধু, আজকের বিলটা তুমিই মিটিয়ো—ধন্যবাদ"—

বড় বড় পা ফেলে সে দরজার আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল। হ্যাঁ, হ্যাভারস্যাকটা নিয়ে যেতে সে একটুও ভুল করেনি। বোবার মত বসে বসে আমি ভাবতে লাগলাম যে ব্যাপারটা কি হল, ভাবতে ভাবতে মাংসের টুকরো চিবোতে লাগলাম। অজস্র গালিবর্ষণে সুব্রতকে নাস্তানাবুদ করার কল্পনা করে খানিকটা রাগ কমালাম। কি দরকার ছিল? যদি তোমার মনে এমনি একটা উদ্ভট খেয়ালই ছিল সুব্রত মুখুজ্জে, তাহলে আমাকে এই বিষ্টিবাদলার মধ্যে টেনে আনবার কি দরকার ছিল? কিন্তু যে জবাব দেবে, সে এখন কোথায়?

নিঃশব্দে সব কিছু গলাধঃকরণ করলাম। ফেলে আসি কি করে, বিলটা যে আমাকেই দিতে হবে। ভাগ্যিস্, পকেটে টাকা আছে, নইলে কি বিশ্রী ব্যাপারটাই না হত!

সুব্রত ফিরে আসবে বলে গেল। কিন্তু মাংসের টুকরো তো আর হাজার খানেক নিয়ে বসিনি যে, বসে থাকার সুযোগ ও সময় পাব। এক সময়ে তা ফুরিয়ে যাবেই এবং তা গেলও। তীক্ষ্ণচক্ষু বাজের মত বয় ওঁৎ পেতে ছিল, খাওয়া শেষ হতেই নিঃশব্দে এসে একটা প্লেট এগিয়ে দিল। না, আর খাবার নয়। বিল। অর্থাৎ ফেল কড়ি, তারপর বিদেয় হও। গুণে গুণে বারো টাকা কয়েক আনা, তদুপরি বয় সেলামী মানে বক্‌সিস্ প্রভৃতি দিয়ে যখন বাইরের ফুটপাথে গিয়ে দাঁড়ালাম তখন মাথার ভেতরে সবকিছু লাট্টুর মত বোঁ বোঁ করে ঘুরছে।

এবার কিংকর্ত্তব্যম্? বাড়ী যাব? কিন্তু সুব্রত যে বলে গেল একটু বাদেই ফিরে আসবে! না, একটু অপেক্ষা করি। অনেকক্ষণ দাঁড়ালাম, শেষে বিরক্ত হয়ে ফুটপাথের ওপর পায়চারী শুরু করলাম। বৃষ্টি পড়া তখন বন্ধ হয়ে গেছে, আকাশ ঘোর কালো। ভিজে রাস্তার ওপর আলোর প্রতিবিম্ব। এটা ওটা নানা জিনিষ দেখে, নানা কথা ভেবে বেশ কিছুক্ষণ কাটালাম। শেষে ক্লান্ত হয়ে পড়লাম। সুব্রত কি আসবে? মনে মনে হাসলাম। সুব্রতকে চিনতে কি আমার এখনো বাকী আছে? কোথায় সে? হয়ত সেই এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান্ মেয়েটির সঙ্গে সে ঘুরে বেড়াচ্ছে রাস্তায় রাস্তায়, নির্জ্জন মাঠে, কিংবা হয়ত মেয়েটির বাড়ী গিয়ে উঠেছে। হয়ত আজ রাতের মত সে সেখানেই কাটিয়ে দেবে, মেয়েটিকে নানাভাবে দেখবে, ছবি আঁকবে। কিছুই বলা যায় না। অতএব বুদ্ধিমানের পন্থা অবলম্বন করাই ভাল, অর্থাৎ

ছ'পয়সার একটি ট্রামের টিকিট কেটে বাড়ী ফেরাই উচিত। মনে মনে এমনি একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছে ট্রাম-স্টপেজের দিকে এগিয়ে গেলাম।

ট্রাম এল। দ্রুতপদে পা বাড়াতে গিয়েই বাধা পেলাম। কাহিনীর নায়ক ফিরে এসেছে।

শ্লেষতিক্ত কণ্ঠে বললাম, "ফিরে এলে যে? মেয়েটির ওখানে থাকলেই পারতে।"

নির্লজ্জের মত সুব্রত হাসল, বলল, "দরকার হলে থাকতাম বৈকি। কিন্তু দরকার হল না।"

"মানে? রাগ-অনুরাগের ব্যাপার কি মিলিটারী কায়দায় সেরে এলে?"

সুব্রতের মুখ চোখ কঠিন হয়ে উঠল, চিবিয়ে চিবিয়ে সে বলল, "তোমার কথাগুলো শুনে কি মনে হচ্ছে জানো অনিমেষ রায়?"

"কি?"

"তুমি শিল্পী নও, শিল্পীদের চেন না। হিংসুক মেয়েলোকের মত ছোট মনের পরিচয় দিয়ে তুমি আমাকে হতাশ করে ফেলছ।"

"আচ্ছা, তাহলে হতাশাবৃদ্ধি না করে এবার আসি—গুড্ নাইট্—"

"না"—

"কেন?"

"আমার কথা শেষ করিনি! শোন, নারীমাংসের ওপর আমার কম লোভ নয় কিন্তু টাকা দিয়ে নারীমাংস কিনতে আমার রুচিতে বাধে।"

"তাহলে তুমি কেন গিয়েছিলে?"

"মেয়েটির মুখ চোখের রেখাগুলো চমৎকার মনে হয়েছিল, কিন্তু ওর চোখে মুখে যে ট্র্যাজিডীর ছায়া ছিল তার উপযুক্ত পরিবেশ আমি খুঁজে পাচ্ছিলাম না। সুতরাং ওর সঙ্গে আমার কথা বলার দরকার হল, ওর

অন্তরকে জানবার কৌতূহল হল। কিন্তু আমি যদি শিল্পী হিসাবে ওর কাছে দাঁড়াতাম, বড় বড় কথা বলতাম তাহলে কি হত? হাই-হিল জুতোর লাথির সঙ্গে 'বেজন্মা' নামক একটি গাল আমাকে বসিয়ে দিত। সুতরাং পথ একটি—সে যে রকম মানুষ বা শিকার খুঁজছে তাই সাজা। ফল হল, বাইরে গেলাম। মেয়েটির নাম লিডা। এটা-ওটা আবোল-তাবোল কথা বলে আমি লিডার অবস্থা জানলাম, তার আশা আকাঙ্খার টুকরো টুকরো পরিচয় পেলাম। দেখলাম যে তার আত্মা মরেনি দেখলাম সে একটা অন্ধ পতঙ্গ—সুখৈশ্বর্য্যের আলোর চারদিকে মুগ্ধ হয়ে ঘুরছে, তিলে তিলে আত্মাহুতি দিচ্ছে। অনেক ঘুরলাম, হঠাৎ রাস্তার একটু নির্জ্জন অংশে সে দাঁড়াল, একটা ল্যাম্প পোষ্টের পাশে দাঁড়িয়ে একটা সিগারেট ধরিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে আমার দিকে তাকাল, হাসল। মুহূর্ত্তে আমার মনের ক্যান্‌ভাসে আমি লিডার ছবি এঁকে ফেললাম। আশে পাশে আবছা অন্ধকার, পেছনে কুয়াসার মত অস্ফুট একটা আলোর পালিস্ করা নোনা ধরা দেওয়াল, টিমটিমে একটা গ্যাসলাইটের নীচে, উৎকটভাবে সজ্জিত একটি যুবতী মেয়ে। গ্যাসের আলোতে চক্ চক্ করছে তার রেশমী চুল, দুটো জলন্ত ও প্রতীক্ষমাণ চোখের নীচে অন্ধকার শেড, অথচ সেই অন্ধকারেও তার লাল ঠোঁট দুটো দেখা যাচ্ছে আর তার এনামেল করা আঙুলের ফাঁকে একটা জলন্ত সিগারেট্। ছবির নাম 'রাত্রি'। সঙ্গে সঙ্গেই আমার কাজ ফুরোলো, আমি তার ঠিকানাটা নিয়ে একটা ট্যাক্সিতে তুলে দিলাম তাকে, তার আগুনের মত উত্তপ্ত হাতের মুঠোয় গুঁজে দিলাম দুটো নোট আর ফিরে এলাম।"

আমার দিকে তাকাল সুব্রত, হেসে বলল, "এখনো প্রশ্ন করবে?"

ধীরে ধীরে মাথা নাড়লাম, বললাম "করব।"

"কি ?"

"তুমি শিল্প-সাধনা কর কিসের জন্য ?"

"জীবনের জন্য। আমার কাছে জীবন মানে একটা বনস্পতি—বিরাট ও বিচিত্র তা—আর প্রতিটি নরনারীই হচ্ছে সেই গাছের ফুল। এক রকমের দেখতে তারা, কিন্তু প্রত্যেকটির রং প্রত্যেকটি থেকে আলাদা।"

"স্পষ্ট করে বলো সুব্রত।"

"ড্যাম্ ইট্—এখনো স্পষ্ট হলো না ? তবে শোন—আর্ট ফর আর্টস্ সেক নয়—আমার কাছে আর্ট হচ্ছে—আর্ট্ ফর লাইফস্ সেক্। আরো বোঝাব ?"

খুশী হ'য়ে মাথা নাড়লাম, জবাব দিলাম, "না।"

সুব্রত মুখুজ্জের এই পরিচয়। কাহিনী এখনো সুরু হয়নি। আসল কাহিনী সুব্রতের ভালোবাসার কাহিনী। সে কাহিনী এবার ধীরে ধীরে উদ্ঘাটিত হবে। এতক্ষণ যা বর্ণিত হল তা ভূমিকা। কেউ 'কেন' বলে প্রশ্ন করলে তার জবাবে এই বলা হবে যে ভূমিকার দরকার আছে। কাহিনীর নায়ককে ভালোভাবে না চিন্‌তে পারলে কাহিনীর রসাস্বাদনে বিঘ্ন জন্মাবে। আর কাহিনীর নায়ক-প্রসঙ্গে যে বারবার আমি নিজেকে তুলে ধরেছি তা একটু বিসদৃশ হলেও তারও কারণ আছে। আমি কাহিনীকার, আমিই সুব্রতের প্রেমের কাহিনীকে পরিবেশন করব। কিন্তু ভয় নেই, আমি এবার থেকে দূরে দূরেই থাকব। ঠিক ততটা দূরে থাকব যতটা আমি কাহিনীর মধ্যেও ছিলাম।

ওপরে যে ঘটনাটি সর্ব্বশেষে বলেছি, তার পরে অনেক দিন কেটে গেল। বেশ কয়েক মাস। আর এই সময়ের মধ্যেই নানা ঘটনা ঘটল সুব্রতের জীবনে। মানুষের জীবনের সবচেয়ে স্মরণীয় ঘটনাও এই সময় তার জীবনে বৈপ্লবিক পরিবর্ত্তন আনল। সে ভালোবাসল।

একের পর এক এই সব ঘটনাগুলোকেই আমি এবার তুলে ধরছি সবার কাছে। ঘটনার সঙ্গে নায়ক ছাড়া অন্যান্য নর-নারীরও সমাবেশ ঘটে। তাদেরও আমি একের পর এক সবার কাছে নিয়ে আসব। চরিত্র, ঘটনা, কোনটাই অস্বাভাবিক নয়, নূতন নয়। যুগযুগান্ত কেটেছে, কাটবে। মানুষ আগেও ভালবেসেছে, আজো ভালবাসছে। বসন্তকালে চিরকাল ফুল ফোটে, কোকিল ডাকে। ভালবাসার কাহিনী চিরকালের কাহিনী। কিন্তু পুরোণো ব্যাপার হলেও তার স্বাদ পুরোণো হয় নি। নিত্য নূতন আগন্তুকরা আসছে পৃথিবীতে, তারা বড় হচ্ছে, যৌবনের রঙে রঙীন হয়ে উঠছে তাদের জীবন, তারা ভালবাসছে। একই ভালবাসা তারা নতুন নতুন ভঙ্গীতে প্রকাশ করছে। এই বহু পুরাতন ভালবাসাই তাদের কাছে অনাস্বাদিত ও নতুন বলে মনে হচ্ছে। অর্থাৎ সুব্রতের প্রেমের কাহিনীটা আশ্চর্য্য একটা ব্যাপার না হলেও তা পৃথিবীর এক নতুন প্রেম, তা নিয়ে কাহিনী বলা চলে।

সেই কাহিনীই এবার সুরু হল।"

এক

সেই যে সেদিন রাতে একটি এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান্ মেয়ের সঙ্গে সুব্রত বেরিয়ে গিয়েছিল, সেই ঘটনার পর আটদিন আর সুব্রতের পাত্তা পাইনি। সেদিন বড় বড় কথার মধ্যে আমার খেয়ালই হয়নি যে, আমার কাগজের পূজা-সংখ্যার কয়েকটা ছবির জন্য তাকে আবার জোর তাগিদ দিতে হবে। ব্যাপারটা স্রেফ ভুলে গিয়েছিলাম। মনে পড়ার পর থেকে এই আটদিন শুধু নিঃশব্দে আঙুল কামড়াচ্ছি। শেষে মরীয়া হয়ে স্থির করলাম যে, আর একটা দিন দেখেই সুব্রতের আশা ছেড়ে দেব, অন্য কোনো শিল্পীকে দিয়েই আমার কাজ চালিয়ে নেব। সুব্রতের পাকা হাতের ছাপ হয়ত তার কোনোটাতেই থাকবে না; কিন্তু, উপায় কি?

সন্ধের দিকটায় একা থাকলে প্রায়ই কলেজ ষ্ট্রীটের কফি-হাউসে যাই। আমার ভালো লাগে। মস্ত বড় হল-ঘরটা ও ওপরের ব্যাল্‌কনি সব ভরে যায়, হরেক-রকম নর-নারীতে তা ভর্ত্তি হয়ে উঠে। দেয়ালের গায়ে আঁকা নানা পাখীর ছবিগুলো যেন একটা বিচিত্র পরিবেশ-সৃষ্টির সহায়তা করে। তার মধ্যে বসে বসে এক পেয়ালা কফি খেতে আমার ভালো লাগে। কলেজ-ষ্ট্রীটের কফি-হাউসের একটি বাঙালী চেহারা আছে। ধনী, মধ্যবিত্ত ও নিঃসম্বল—হরেক-রকমের বাঙালী সেখানে দেখা যায়। আর দেখা যায় বাঙালী লেখকদের, শিল্পীদের, রাজনৈতিক কর্ম্মী ও ছাত্রদের। এক কাপ কফির সামনে বসে তারা পৃথিবীর ইতিহাস, শিল্প ও সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করে, তর্ক করে, ঝিমোয়, চিন্তা করে, স্বপ্ন দেখে।

সেদিনও বেরোলাম।

এক কাপ কফি নিয়ে প্রায় এক ঘণ্টা ধ্যান করলাম। মানে নতুন একটা উপন্যাসের প্লটকে আগাগোড়া ঝালাই করে নিলাম। শীগ্‌গীরই লিখতে সুরু করব। চারদিকের কোলাহল আমার কোনো ক্ষতিই করছিল না, বরং ভালই লাগছিল। মানুষের সম্মিলিত কণ্ঠস্বর মিলে যেন একটা অদ্ভুত সিম্ফনী তৈরী হচ্ছিল।

হঠাৎ চমক ভাঙ্গল। সামনে বয়। এক কাপ কফির তুলনায় আমি অনেকক্ষণ বসেছি।

বেরিয়ে আসছিলাম। সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে হঠাৎ বাঁকের মুখে থমকে দাঁড়ালাম। দেখলাম যে, নীচের দিক থেকে উঠে আসতে আসতে আমার সামনে এসে সুব্রত দাঁড়াল। তার বেশভূষা দামী নয়, তবে পরিচ্ছন্ন, ফিট্‌ফাট্ আর মুখের উপর খোঁচা খোঁচা দাড়ি-গোঁফের জঞ্জাল নেই, খুব সযত্নে শেভ করেছে। দেখে ভালো লাগল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই তা আবার উড়ে গেল, রীতিমত ঈর্ষান্বিত হয়ে উঠলাম তার ওপর। কারণ সে একা ছিল না, তার সঙ্গে আর একজন ছিল। সে একটি মেয়ে।

মেয়েটি সুন্দরী। বয়স কুড়ি একুশের কম নয়। উগ্র গৌরবর্ণের ওপর উগ্রভাবে পাউডার ও রুজ লাগিয়েছে সে, দুটি পুরু ঠোঁটের ওপর লিপস্টিক ছুঁইয়েছে, গায়ে মেখেছে দামী ও উত্তেজক বিলিতী এসেন্স। মেয়েটির রুচি আছে কিন্তু তা দেশীও নয়, বিদেশীও নয়। মানে বুঝতে পারলাম না। নীল রঙের হাল্‌কা সিল্কের সাড়ীটাকে সে মেমেদের মত করে পরেছে, ফলে তার দেহ-রেখা সুস্পষ্ট, ভয়ঙ্কর স্পষ্ট, প্রায় নির্লজ্জ।

আমি কোন কথা খুঁজে পেলাম না। আচমকা সুব্রতকে দেখতে

পাব এমন আশা ছিল না, দেখতে পেলেও তাকে যে এমনভাবে একটি মেয়ের সঙ্গে দেখা যাবে সে কথা ভাবতে পারি নি।

কি বলব না বলব ভাবতে ভাবতেই সুব্রত হাসল, ঝক্ঝকে দাঁত মেলে বলল, "হোয়াট এ সার্প্রাইজ!"

মেয়েটির দিকে একবার আড়-নয়নে তাকিয়ে নিয়ে আমি গম্ভীর হয়ে বললাম, "সার্প্রাইজ না শক্?"

মেয়েটি অনুচ্চকণ্ঠে হেসে উঠল, দাঁতে দাঁত চেপে বলল, "ইন্ডীড ভেরী ইণ্টারেস্টিং—"

একটু অবাক হয়ে মেয়েটির দিকে তাকালাম। মেয়েটিকে ভালো লাগল না। মেয়েটির রূপ আছে, দেখে ধনীর দুলালী বলেই মনে হল, যে তিনটী ইংরিজী শব্দ তার মুখ দিয়ে বেরোল তাদের উচ্চারণ-ভঙ্গী শুনে মনে হল যে সে খাঁটি ইংরেজ মেয়েদের চেয়েও ভালো উচ্চারণ করে, অর্থাৎ সে বিলিতী স্কুলে লেখাপড়া শিখেছে, সাহেব মেমদের আওতায় মানুষ হয়েছে। কিন্তু ভালো না লাগার কারণ তা নয়। অনেক সময় একটা মানুষের মুখ, চোখ, তার দাঁড়াবার তাকাবার ও কথা বলার ভঙ্গী থেকেই তার চরিত্রের বিষয়ে একটা মোটামুটি ধারণা জন্মায়। এ ক্ষেত্রেও তাই হল। মেয়েটির চিবুক উঁচু করে চিবিয়ে চিবিয়ে কথা বলার ভঙ্গী থেকেই স্পষ্ট বোঝা গেল যে মেয়েটির অহঙ্কার আছে, ধরাকে সরা জ্ঞান করে সে, মানুষকে ওপর থেকে দেখে। তা ছাড়া তার প্রসাধন-বাহুল্য থেকে আর একটা কথা আমার বিশেষ করে মনে পড়ল—সে নিজেকে ভালবাসে। যে শুধু নিজেকে ভালবাসে সে কখনো অপরকে ভালবাসতে পারে না। অতএব।—কিন্তু বেশী কিছু ভাববার আগে তো আমার জানা উচিত যে মেয়েটি কে? সুব্রতের সঙ্গে তার কি সম্বন্ধ?

মেয়েটির দিকে ভালো করে তাকালাম। তাকে কি এর আগে

আমি দেখেছি? কিছুই মনে পড়ল না, তবু মনে হল যেন মেয়েটিকে দেখেছি। কি আশ্চর্য্য!

সুব্রত আমার কাঁধে হাত রাখল, বলল, "হে জ্ঞানবৃদ্ধ শান্ত হও"—

প্রতিবাদ-সূচক ভঙ্গী করে তর্জ্জনী তুললাম, সুব্রত তাড়াতাড়ি সহাস্যে বলল, "দেখা হয়ে খুব ভাল হল অনিমেষ রায়। এসো, আলাপ করিয়ে দিই। কিন্তু তার আগে বল দেখি এঁকে চেন কিনা? সুব্রত মুখুজ্জের চিত্তজয়ী এই সুন্দরীকে কি তুমি চিন্‌তে পারছ না?"

ঠিক, মুহূর্ত্তে মনে পড়ে গেল। তাইত! এ যে সুব্রত'র সেই ছবির মডেল! একটি যুবতী তার পরিপূর্ণ যৌবনশ্রী দেখে মুগ্ধ হয়ে হাসছে। হ্যাঁ, এই তো সেই মেয়েটি যার সঙ্গে প্রেমে পড়ে সুব্রত হাবুডুবু খেতে চাইছে।

মাথা নাড়লাম, মেয়েটির দিকে তাকিয়ে কাষ্ঠ হাসির একটুকরো ঠোঁটের কোণে টেনে এনে, মেয়েটিকে নমস্কার জানিয়ে বললাম, "চিনেছি। উনি শিপ্রা দেবী"—

মেয়েটি আনাড়ির মত প্রতি-নমস্কার জানাল আমাকে।

বললাম, "আর আমি কে জানেন?"

শিপ্রা মাথা নাড়ল, "না তো—আপনি"—

"বল্‌ছি—বল্‌ছি"—সুব্রত তাড়াতাড়ি বলে উঠল।

তার আগে আমিই বললাম, "আমি অনিমেষ রায়, 'ভালো কাগজ, নামক একটি কুখ্যাত কাগজের দরিদ্র সম্পাদক"—

সুব্রত বলল, "ব্যাস, এবার তুমি বিদেয় হও সম্পাদক, আমরা কফি খেতে যাই"—

পরিহাস করে বললাম "কেন? আমাকেও তোমাদের সঙ্গদানে কৃতার্থ কর না"—

শিপ্রা জোর করে হাসল, বলল "হোয়াই সুয়োরলি ইউ আর ওয়েল-কাম—মানে আসুন"—

মাথা নেড়ে বললাম, "ধন্যবাদ। মানে মানে আজ আমি সরেই পড়ছি ভাই। আপনি আমাকে প্রলুব্ধ করলেও আমার নাড়ীজ্ঞান টন্‌টনে—আমি জানি যে যৌবন চিরকাল বিগত যৌবনকে পরিহার করে, শত্রু বলে গণ্য করে। সুতরাং আপনারা চক্ষু-লজ্জা পরিত্যাগ করে নির্লজ্জই হোন্, আমাকে বিষবৎ পরিত্যাগ করে ওপরে যান, ব্যালকনির নিভৃত এক কোণেতে বসে পারাবত যুগলের মত মৃদু গুঞ্জনধ্বনি তুলুন আর হতভাগ্য সম্পাদক কলেজ-স্কোয়ারে বসে সিগারেটের ধোঁয়া টানতে টানতে ভাবুক যে পৃথিবীর সব কিছুই অনিত্য, নশ্বর, মায়াময়। কিন্তু সুব্রত মুখুজ্জে, একটা কথা"—

সুব্রত সহাস্যে তাকাল আমার দিকে, প্রশ্ন করল, "কি ?"

"পূজো-সংখ্যার ছবিগুলো ?"

বিব্রত হয়ে পড়ল সে, মুহূর্তের জন্য অপরাধীর মত ঢোক্ গিল্‌ল সে, কিন্তু পরমুহূর্তেই সামলে নিয়ে সে আমার দিকে ঝুঁকে দাঁড়াল, নিম্নকণ্ঠে বলল, "অনিমেষ রায়, তোমার কি দয়া নেই ? তুমি কি পাষাণ ?"

সজোরে মাথা নেড়ে জানালাম, "না।"

"তবে ? তবে কেন তুমি আমাকে পরিত্রাণ দিচ্ছ না ? আমার সঙ্গে দাঁড়িয়ে আছে একটি স্বর্গের অপ্সর-কন্যা এবং বহু মূল্যবান্ সময় কারো জন্যে থামে না—তা কি তুমি জানো না ?"

বুঝলাম। শিপ্রাকে হাত তুলে বললাম, "নমস্কার শিপ্রা দেবী, আবার দেখা হবে।"

শিপ্রা জবাব দিল, "আই শ্যাল্ বি গ্ল্যাড্"—

গ্ল্যাড্ না হাতী। রাগে গর্‌গর্ করতে করতে নিঃশব্দে কফি-হাউস

থেকে বেরিয়ে এলাম, একবারও পেছন ফিরে তাকালাম না। গেছে, সুব্রত মুখুজ্জে গেছে। শিপ্রার মত একটা স্নব মেয়ের সঙ্গে সময়ের অপব্যয় করে সে নিজের শিল্পী-মনকে খুন করছে। করুকগে ছাই, চুলোয় যাকগে, আমার ভাববার দরকার কি বাবা ?

সঙ্গে সঙ্গে একটা বিষয়ে সিদ্ধান্ত একেবারে স্থির করে ফেললাম। অন্য কোন আর্টিষ্ট পাকড়ে আমার পূজো সংখ্যার কাজগুলো এবার করিয়ে নিতেই হবে। সুব্রতের কাছ থেকে এবার আর কোনো কাজ পাবার আশা নেই। কোনকালেও সে আশা হবে কিনা সে বিষয়ে এখন সন্দেহ হচ্ছে। অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলেকে আর্টিষ্ট হলেও কস্মিনকালে বিশ্বাস করা যায় না। যার অভাব নেই তার দায়িত্ব বোধ থাকে না। দায়িত্বজ্ঞানহীন লোককে দিয়ে পৃথিবীতে কোন কাজই হয় না। সুতরাং সুব্রত ভাল লোক হলেও তাকে দিয়ে আমার কাজ চলবে না, তার ওপরে বিশ্বাস করলে আমার 'ভালো কাগজ' রাবিশ কাগজে রূপান্তরিত হবে। না, আজ থেকে সুব্রতের সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই। জীবন-বৃক্ষের শুধু বৈচিত্র্যের সন্ধান করতে করতে সে চুলোয় যাক।

দিন পনেরো, হ্যাঁ, তারপরে দিন পনেরো কেটে গেল! কাজের চাপ পড়ছিল, নিঃশ্বাস ফেলারও ফুরসুৎ পাচ্ছিলাম না। নতুন আর্টিষ্ট ডাকিয়ে, আমার কাজ করিয়ে নিয়ে ব্লক করিয়ে ফেলেছি ইতিমধ্যে, সুব্রতের তোয়াক্কা করিনি। একটা কাগজ চালাতে গেলে তো আর একজনের ওপর নির্ভর করে বসে থাকা যায় না।

সেদিন বিকেলে কাজের চাপ একটু কম মনে হল। ঘড়ি দেখে

হিসেব করে মনে হল যে ঘণ্টা দু'য়েক আমি একটু আড্ডা মেরে আসতে পারি। কিন্তু কোথায় যাই? শেষে ঠিক করলাম যে কফি হাউস তো দরজা খুলে অপেক্ষাই করছে, সেখানেই যাওয়া যাক, এক আধজন চেনা লোকের সঙ্গে ঠিক দেখা হয়ে যাবে!

হ্যারিসন রোড ধরে এগোলাম। রাস্তায় বিকেলের ভীড়। আপিস প্রত্যাগতেরা গৃহমুখী জন্তু জানোয়ারের মত ট্রামে বাসে ঝুলতে ঝুলতে আসছিল। রাস্তাতেও কম ভীড় নয়, মানুষ ঠেলে এগোনো দায়। মন্থর গতিতে চলতে লাগলাম কোন মতে।

হঠাৎ অবাক হয়ে গেলাম। ফুটপাথের বাঁ দিকে একটা চায়ের দোকান, সেখানে সুব্রত বসে আছে। সামনে এক কাপ চা রাখা আছে বটে কিন্তু তাতে চুমুক দেবার কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। গভীর ভাবে কি যেন সে চিন্তা করছে।

সব রাগ জল হয়ে গেল। লোকটার বসবার ও চিন্তা করার ভঙ্গীতে এমন একটা ছেলেমানুষী ও তদ্গত ভাব ছিল যে, দেখে মনের রাগকে ঘোরতর রাগে পরিণত করতে পারলাম না। পরিবর্ত্তে মনে মনে হাসলাম, সুব্রতের খামখেয়ালী ঠিক বজায় আছে। হ্যারিসন রোডের এই ছোট চায়ের দোকানেও সে জীবনের রূপ দেখতে এসেছে। তাকে অবাক করে দেবার একটা দুর্নিবার ইচ্ছে হল মনে, তাই নিঃশব্দ পদে চায়ের দোকানের ভেতর ঢুকলাম, ঠিক তার পেছনে গিয়ে দাঁড়ালাম।

সুব্রত পূর্ব্ববৎ চিন্তামগ্ন।

পেছন থেকে সহাস্যে বললাম, "এ পেনী ফর ইয়োর থট্‌স্ সুব্রত মুখার্জ্জী—কি ভাবছ?"

সে চমকে উঠল। লক্ষ্য করলাম যে তার চমকানোটা সুস্থ ও স্বাভাবিক নয়। মনে হল সে যেন একটা পীড়াদায়ক ও জটিল চিন্তার জালে আটকে

গিয়েছে। চিন্তার স্বরূপ অনুমান করতে না পেরে ভাবলাম যে শিল্পী মানুষ, এমন গভীরভাবে চিন্তামগ্ন হওয়াটা খুব অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়।

চম্‌কে পেছন ফিরে তাকালে সুব্রত, আমাকে দেখে হাসল, বলল, "তুমি! এসো, বোস"—

বসতে বসতে আরো লক্ষ্য করলাম যে সুব্রতের আজকের হাসিটা যেন আগেকার মত সহজ, প্রাণবান্ ও উজ্জ্বল নয়। ব্যাপার কি?

প্রশ্ন করলাম, "কি ভাবছিলে বলত?"

সংক্ষিপ্ত জবাব দিল সুব্রত, বলল, "কিছু না। বয়, আর এক কাপ চা"—

সুব্রত'র উত্তর দেওয়ার ভঙ্গী ও কণ্ঠস্বর থেকে স্পষ্ট বুঝতে পারলাম যে সে আমার প্রশ্নকে এড়িয়ে গেল, মিথ্যে কথা বলল। অথচ মিথ্যে কথা বলা তার স্বভাব নয় বলেই চোখে মুখে একটা অপরাধীর ভাবও সুস্পষ্ট হয়ে উঠল। তবু বাধা দিলাম না, কোন কথাই বললাম না, কেবল সুযোগের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম।

বললাম, "তারপর? কি খবর? পিকাডিলীর মত এখানেও কি জীবনের পরিচয় পেতে এসেছ?"

সুব্রত মাথা নেড়ে মৃদু হাসল, তারপর ধীরে ধীরে আবার গম্ভীর হয়ে বলল, "না, স্রেফ চা খেতে এসেছি। জীবনের পরিচয়ের জন্য আর আমাকে ঘুরে বেড়াতে হবে না—জীবন এসে এবার আমার মুখোমুখী দাঁড়িয়েছে"—

"তার মানে?"

"সব কথার মানে থাকেনা অনিমেষ রায়।"

কথা বাড়ালাম না। ব্যাপারটা বুঝবার জন্য ভালো করে তাকালাম তার দিকে। এবার আরো অনেক কিছুই লক্ষ্য করলাম। সুব্রতর

চুলগুলো বড় ও রুক্ষ হয়ে উঠেছে, দাড়ি গোঁফ বোধ হয় চার পাঁচদিন ধরে কামানো হয়নি, আর তার পরণের ধুতি ও পাঞ্জাবীটা রীতিমত ময়লা। যা লক্ষ্য করলাম তা সাধাণরতঃ খুব আশঙ্কাজনক নয়, কারণ এসব লক্ষণ শিল্পীজনোচিত। কিন্তু তবু তা আমার কাছে লক্ষণীয় ও গুরুতর মনে হ'ল এই কারণে যে এসব বিষয়ে সুব্রতকে কোনদিনই আমি বাড়াবাড়ি করতে দেখিনি। না একটা কিছু নিশ্চয়ই হয়েছে তার। মানসিক যন্ত্রণার একটা পরিষ্কার ছায়া পড়েছে তার সর্ব্বাঙ্গে, তাকে রীতিমত রোগা দেখাচ্ছে।

কৌতূহল আর দমন করতে না পেরে হঠাৎ ব্যগ্রকণ্ঠে প্রশ্ন করলাম, "তোমার চেহারাটা খুব খারাপ মনে হচ্ছে কেন বলত?"

আগের মতই ছোট্ট একটা জবাব দিল সুব্রত, "তার কারণ আছে।"

"আর খুব চিন্তিত মনে হচ্ছে?"

"ঐ একই কারণে।"

"সেই কারণটা কি?"

সুব্রত জবাব দিল না, আমার দিকে তাকিয়ে সে কি যেন ভাবতে লাগল, তার মুখের এমন কোন ভাবান্তর হল না যাতে তার ভাবনার কোন হদিস পাওয়া যায়। কয়েক সেকেণ্ড এমনিভাবে আমার দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে সে মুখ খুলল, বলল, "তাহলে বলেই ফেলি"—

চুপ করে রইলাম, তার কথার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম।

সে বলল, "আমি এখন আর ভবানীপুরে নেই, বাসা বদলেছি।"

"বটে! আর নিজেদের বাড়ীটা বুঝি ভাড়া দিলে? তা মন্দ নয়, যা দিনকাল পড়েছে তাতে বেশ মোটা অঙ্কের ভাড়া পাবে।" ধারালো হাসি ছড়িয়ে পড়ল তার মুখে, সে বলল, "সব কিছুই কি অত সহজে কল্পনা করা যায় অনিমেষ বাবু? উঁহু—তা নয়।"

"তবে !" একটু বোকা বনে গেলাম।

"ওবাসা ঠিকই আছে, বাড়ী ভাড়াও দেওয়া হয়নি—আসলে তা নয়, আমি মাকে নিয়ে ও বাড়ী ছেড়ে এ পাড়ায় চলে এসেছি।"

অবাক হয়ে প্রশ্ন করলাম, "কিন্তু কেন ? ব্যাপার কি হল ?"

সুব্রত সিগারেট বের করে আমার দিকে এগিয়ে দিতে দিতে বলল, "ব্যাপার জটিল"—

"যথা ?"

"নিশ্চয়ই জানো যে বাবা মারা যাবার পর আমার ও মায়ের নামে যা কিছু ছিল তা মন্দ নয়। কিন্তু আমি অল্পবয়স্ক, তাছাড়া ওসব নিয়ে ভাবতে আমার ভালো লাগত না আর মাও সমান বোকা বলে আমাদের সব কিছুই দেখাশোনা করার ভার পড়েছিল আমার কাকার ওপর। এসব কথা তো জানো আর এটাও জানো বোধ হয় যে কাকা বুদ্ধিমান লোক, তিনি সুযোগের সদ্ব্যবহার ভালো ভাবেই করেছেন। বাড়ীটা এজমালী, কিন্তু তাও ভেতরে ভেতরে সুকৌশলে স্বনামে লিখিয়ে নিয়েছেন। সবই জানা ছিল আর তাতে আপত্তি ছিল না আমার। কি যায় আসে ? সম্পত্তি নিয়ে হানাহানি করা আমার ধাতে সয় না, আমার মনে হয় তাতে মানুষের চরিত্রহানি ঘটে। আর আমার চিন্তাটা কোথায় ? মা ক'দিনই বা বাঁচবেন ? নিজেকে কোনদিনই সমস্যা বলে মনে হয়নি। ভেবেছিলাম, চলে যাবে দিন। কিন্তু ভেতরে ভেতরে যে কাকাবাবুর সঙ্গে আমাদের সম্পর্কটা একটা পাৎলা সুতোর বন্ধনে এসে দাঁড়িয়েছিল তা বুঝতে পারিনি—

"হঠাৎ"—

এই বলে সুব্রত থামল, সিগারেটে টান দিতে লাগল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, "তারপর ?"

চুলগুলো বড় ও রুক্ষ হয়ে উঠেছে, দাড়ি গোঁফ বোধ হয় চার পাঁচদিন ধরে কামানো হয়নি, আর তার পরণের ধুতি ও পাঞ্জাবীটা রীতিমত ময়লা। যা লক্ষ্য করলাম তা সাধারণতঃ খুব আশঙ্কাজনক নয়, কারণ এসব লক্ষণ শিল্পীজনোচিত। কিন্তু তবু তা আমার কাছে লক্ষণীয় ও গুরুতর মনে হ'ল এই কারণে যে এসব বিষয়ে সুব্রতকে কোনদিনই আমি বাড়াবাড়ি করতে দেখিনি। না একটা কিছু নিশ্চয়ই হয়েছে তার। মানসিক যন্ত্রণার একটা পরিষ্কার ছায়া পড়েছে তার সর্ব্বাঙ্গে, তাকে রীতিমত রোগা দেখাচ্ছে।

কৌতূহল আর দমন করতে না পেরে হঠাৎ ব্যগ্রকণ্ঠে প্রশ্ন করলাম, "তোমার চেহারাটা খুব খারাপ মনে হচ্ছে কেন বলত ?"

আগের মতই ছোট্ট একটা জবাব দিল সুব্রত, "তার কারণ আছে।"

"আর খুব চিন্তিত মনে হচ্ছে ?"

"ঐ একই কারণে।"

"সেই কারণটা কি ?"

সুব্রত জবাব দিল না, আমার দিকে তাকিয়ে সে কি যেন ভাবতে লাগল, তার মুখের এমন কোন ভাবান্তর হল না যাতে তার ভাবনার কোন হদিস পাওয়া যায়। কয়েক সেকেণ্ড এমনিভাবে আমার দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে সে মুখ খুলল, বলল,"তাহলে বলেই ফেলি"—

চুপ করে রইলাম, তার কথার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম।

সে বলল, "আমি এখন আর ভবানীপুরে নেই, বাসা বদলেছি।"

"বটে! আর নিজেদের বাড়ীটা বুঝি ভাড়া দিলে ? তা মন্দ নয়, যা দিনকাল পড়েছে তাতে বেশ মোটা অঙ্কের ভাড়া পাবে।" ধারালো হাসি ছড়িয়ে পড়ল তার মুখে, সে বলল, "সব কিছুই কি অত সহজে কল্পনা করা যায় অনিমেষ বাবু ? উঁহু—তা নয়।"

"তবে!" একটু বোকা বনে গেলাম।

"ওবাসা ঠিকই আছে, বাড়ী ভাড়াও দেওয়া হয়নি—আসলে তা নয়, আমি মাকে নিয়ে ও বাড়ী ছেড়ে এ পাড়ায় চলে এসেছি।"

অবাক হয়ে প্রশ্ন করলাম, "কিন্তু কেন? ব্যাপার কি হল?"

সুব্রত সিগারেট বের করে আমার দিকে এগিয়ে দিতে দিতে বলল, "ব্যাপার জটিল"—

"যথা?"

"নিশ্চয়ই জানো যে বাবা মারা যাবার পর আমার ও মায়ের নামে যা কিছু ছিল তা মন্দ নয়। কিন্তু আমি অল্পবয়স্ক, তাছাড়া ওসব নিয়ে ভাবতে আমার ভালো লাগত না আর মাও সমান বোকা বলে আমাদের সব কিছুই দেখাশোনা করার ভার পড়েছিল আমার কাকার ওপর। এসব কথা তো জানো আর এটাও জানো বোধ হয় যে কাকা বুদ্ধিমান লোক, তিনি সুযোগের সদ্ব্যবহার ভালো ভাবেই করেছেন। বাড়ীটা এজমালী, কিন্তু তাও ভেতরে ভেতরে সুকৌশলে স্বনামে লিখিয়ে নিয়েছেন। সবই জানা ছিল আর তাতে আপত্তি ছিল না আমার। কি যায় আসে? সম্পত্তি নিয়ে হানাহানি করা আমার ধাতে সয় না, আমার মনে হয় তাতে মানুষের চরিত্রহানি ঘটে। আর আমার চিন্তাটা কোথায়? মা ক'দিনই বা বাঁচবেন? নিজেকে কোনদিনই সমস্যা বলে মনে হয়নি। ভেবেছিলাম, চলে যাবে দিন। কিন্তু ভেতরে ভেতরে যে কাকাবাবুর সঙ্গে আমাদের সম্পর্কটা একটা পাৎলা সুতোর বন্ধনে এসে দাঁড়িয়েছিল তা বুঝতে পারিনি—

"হঠাৎ"—

এই বলে সুব্রত থামল, সিগারেটে টান দিতে লাগল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, "তারপর?"

সুব্রত হাসল, "তারপর আর কি ? বড় খুড়তুতো বোন ইলার বিয়েকে উপলক্ষ্য করে হঠাৎ সেই পাৎলা সুতোর বাঁধনটা ছিঁড়ে গেল।"

"কিন্তু কেন ? বোনের বিয়েতে"—

"হ্যাঁ। ইলা জয়ন্ত বলে একটি ছেলেকে ভালবেসেছে। সে কায়স্থ। কাকা ঘোর আপত্তি তুললেন। আমি বোনের পক্ষ নিলাম কারণ ইলা চমৎকার মেয়ে আর জয়ন্ত চমৎকার ছেলে। তাছাড়া জাতিভেদটা একটা সিলি ব্যাপার—তাকে প্রশ্রয় দেওয়াটা রীতিমত বর্ব্বর প্রথা। কাকা যখন পূরো অসহযোগিতা ঘোষণা করে বিপ্লবাত্মক পন্থা অনুসরণ করার মৎলব ভাঁজছিলেন আমি তখন রেজিষ্ট্রি আফিসে ইলাদের সিভিল ম্যারেজ ঘটিয়ে দিলাম। মেয়ে জামাই গিয়ে কাকাবাবুকে প্রণাম করল, তাদের তিনি আশীর্ব্বাদ না করে পারলেন না, কিন্তু তার সমস্ত রাগ এসে পড়ল আমার ওপর। সম্পত্তির ব্যাপার নিয়ে আমি তাঁর কাছে একটা কাঁটা হয়ে দাঁড়িয়েছিলাম অনেকদিন, এইবার থেকে আমি তাঁর একজন পয়লা নম্বরের শত্রু বলে ঘোষিত হলাম। ফলে একদিন বিস্ফোরণ ঘটল, তিনি আমাকে বাড়ী ছেড়ে যেতে নির্দ্দেশ দিলেন। বিয়ের ব্যাপারে কাকার কথা শুনিনি কিন্তু এবার আমি তাঁর সম্মান রাখলাম। মাকে জানো তো, বোকা হলে কি হবে মহিলার বেশ আত্মমর্য্যাদা বোধ আছে। ফলে ভবানীপুরের ভালো বাড়ী ছেড়ে একেবারে এপাড়ায়, রাজা রাম বোস লেনের একটা পুরোনো অন্ধকার বাড়ীতে এসে হাজির হয়েছি।"

"তারপর ?"

সুব্রত উঠে দাঁড়াল, হেসে উঠে বলল, "তাঁরপর আবার কি, বজ্রের আলোতে—মৃত্যু নয়, জীবনের সঙ্গে মুখোমুখী হয়ে দাঁড়ালাম। বুঝলাম যে জীবন সহজ নয়, তাকে এড়াতে চাইলেও তার জটিল জাল থেকে

পালানো যায় না। আগে হোক বা পরে হোক জীবনের সামনাসামনি গিয়ে শেষ পর্য্যন্ত দাঁড়াতেই হবে। বয়—চায়ের দাম নাও'—

"সে কি তুমি চললে নাকি?"

সুব্রত বয়কে টাকা পয়সা দিতে দিতে মাথা নাড়ল, বলল, "হ্যাঁ দরকার আছে। আচ্ছা, তাহলে আজ আসি অনিমেষ। পারো তো এসো একদিন, কেমন? ৪৩ বি, রাজারাম বোস লেন—মনে থাকবে তো?

"থাকবে।"

সুব্রত দোকান ছেড়ে বাইরে চলে গেল।

বাইরে তখন সন্ধ্যে হয়ে এসেছে। হ্যারিসন রোডের ওপর দিয়ে মানুষ ও যানবাহনের স্রোত উদ্দাম ও সশব্দ হয়ে উঠেছে। ছোট্ট চায়ের দোকানটাও ভীড়ে গিজগিজ করছে, একবার সুব্রতের গমনপথের দিকে তাকিয়ে তার সঙ্গে যাবার কথা ভাবলাম। পরে তা না করাই স্থির করলাম। সুব্রত আজ আমাকে এড়াতে চাইছে, একা থাকতে চাইছে। তাই হোক। এক্ষেত্রে আদিম প্রথাটাই ভাল। নিজের দুঃখকে সে একাই বহন করুক, সহ্য করুক, জয় করুক।

সুব্রতের নতুন ঠিকানাটা মনে ছিল, কিন্তু যাব যাব করতেই দিন সাতেক কেটে গেল। সে দিনটা ছিল রবিবার। বিকেলের দিকেই বেরিয়ে পড়লাম বাড়ী থেকে। ঠিকানাটা খুঁজে নিতে খুব সময় লাগল না। বৌবাজার এলাকাতেই জায়গাটা। অত্যন্ত সংকীর্ণ একটা গলি, এঁকে বেঁকে গেছে একটা কুৎসিত অজগরের মত। অন্ধকার, স্যাঁতসেঁতে ছাই আর তরিতরকারীর খোসায় ভর্ত্তি। পাশেই মস্তবড় একটা বস্তী। সেখানে মুচি, ডোম আর কারখানার বাঙালী

ও উড়ে মজুরেরা থাকে। গলিটার একটা বাঁকের মুখে মস্ত বড় একটা দোতালা বাড়ী। নীচের তলায় এক বাঁকে একটা মিষ্টি ও এক ফুলুরীর দোকান, আর এক বাঁকে একটা দেশীমদের দোকান। সেখান থেকেই বস্তী এলাকাটা সুরু হয়েছে। টিনের শেড-দেওয়া কয়েকটা খুপরীর মধ্যে দুটো চায়ের দোকান, সারাদিনরাত তা খোলা থাকে, যখন তখন পুরোণো একটা গ্রামাফোনের ওপর ভাঙ্গা ভাঙ্গা সিনেমার রেকর্ড চাপিয়ে দেওয়া হয়। তারপাশে একটা ধোবাখানা, নাম 'ইলেক্ট্রিক লণ্ড্রি'। একটা মিস্ত্রীর দোকান। আর বস্তীর মুখের প্রথম চার পাঁচটা বাড়ীর মেয়েদের দেখে মনে হল যে তাদের রাত জাগতে হয়। রাতের বেলা চারদিকের বাড়ীঘরগুলো যখন অন্ধকার ও নিঃশব্দ হয়ে ওঠে তখন বস্তীর মুখের ঐ ঘরগুলোতে টিম্‌টিমে কেরোসিনের পিদিম জ্বালিয়ে ওই মেয়েরা জাগে আর দেশী মদের নেশায় পাগল বহু পুরুষদের রক্তে আর একটা হিংস্র নেশার আমেজ ধরিয়ে দেয়, তাদের বুকে লুটিয়ে পড়ে। বিচিত্র ও মিশ্র একটা পরিবেশ।

নম্বর মিলিয়ে বাড়ীটাকে খুঁজে পেলাম। ভেতরে যাবার পথটাও দেখতে পেলাম কিন্তু হুড়মুড় করে ভেতরে যেতে পারলাম না, সঙ্কোচ হল। তাই উচ্চকণ্ঠে সুব্রতকে কয়েকবার ডাকলাম।

কিন্তু কেউ সাড়া দিল না।

"সুব্রত—সুব্রত—সুব্রত"—

একবারও জবাব দিল না কেউ। ব্যাপার কি? বাড়ীর নম্বরটা আর একবার দেখে নিলাম। না, ঠিক আছে, নম্বর দেখতে কোন গোলমাল করিনি।

হঠাৎ দরজার গোড়ায় একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক এসে দাঁড়ালেন

বয়স পঁয়তাল্লিশের কাছাকাছি হবে। লম্বাটে, রোগা ভদ্রলোকের আধখানা মাথায় টাক, দেখলেই অজীর্ণরোগী ও খিটখিটে বলে মনে হয়। চোখের তারা ভারী তীক্ষ্ণ ও সন্দিগ্ধ, গায়ের রং তামাটে, নাকের নীচে একজোড়া পরিপুষ্ট গোঁফ, পরণে একটা ফতুয়া আর লুঙ্গির মত ভাঁজকরা শাড়ী।

ভদ্রলোক আমার দিকে তাকিয়ে ভুরু কুঁচকে প্রশ্ন করলেন, "কাকে চাই ?"

"সুব্রত"—

ভদ্রলোক পূর্ব্ববৎ প্রশ্ন করলেন, "সে আবার কে ?"

বিনীতকণ্ঠে বললাম, "আজ্ঞে—শ্রীসুব্রত মুখোপাধ্যায়, ইয়ে—পেণ্টার মানে চিত্রশিল্পী"—

তাড়াতাড়ি বোঝাবার জন্য কথার সঙ্গে তুলি দিয়ে ছবি আঁকবার একটা ভঙ্গী করলাম।

ফল হল না।

ভদ্রলোক মাথা নেড়ে বললেন, "নেই"—

"নেই মানে ? সে কি"—

ভদ্রলোক বাধা দিয়ে বললেন, "নেই মানে বুঝতে আপনার কষ্ট হচ্ছে দেখছি। আরে মশাই 'নেই' মানে ওই নামের কেউ এখানে থাকে না।"

মনে মনে সুব্রতের মুণ্ডপাত করতে করতে ভগ্নহৃদয়ে ফিরবার কথা ভাবার সঙ্গে সঙ্গেই একটা কাণ্ড হল।

ভদ্রলোকের কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর পেছনে এসে দাঁড়াল সুব্রত, তরলকণ্ঠে বলল, "সে কি ভোলানাথ বাবু, কথাটা যে ভুল বলে ফেললেন"—

"মানে ?" ভদ্রলোক চমকে পেছনে তাকালেন।

"মানে আমি তো স্বশরীরে এবং বহালতবিয়তে বাড়ীতেই আছি"—

"আপনাকে তো আমি চিনি না"—

"তাহলে চিনুন, আমার নাম সুব্রত মুখুজ্জে, এই বাড়ীর একজন নতুন ভাড়াটে"—

"হুঁ, তা কি করে জানব ? দরকারটাই বা কি আমার ? নিত্য নতুন ভাড়াটে আসবে আর আমি তার ঠিকুজী জানতে বসব নাকি ? যত্ত সব"—

ভোলানাথ বাবু কলেজ স্কোয়ারে কেনা টায়ারের স্যাণ্ডেল দিয়ে শব্দ তুলে অন্তর্হিত হলেন। যাবার ভঙ্গী দেখে বেশ বোঝা গেল যে ভদ্রলোক ক্ষেপেছেন।

সুব্রত হাসল, "এসো, এসো সম্পাদক"—

এতক্ষণ যেন দম বন্ধ করে ছিলাম, এবার হাঁফ ছেড়ে বললাম, "বাঁচলাম বাবা—উঃ—তোমার বাড়ী এবং তোমাকে খুঁজে বার করাটা একটা রীতিমত রোমাঞ্চকর ঘটনা"—

"এসো, এসো। আর বলোনা, ভদ্রলোক আমাকে চেনেন ভাল করেই, অথচ প্রথম দিন থেকে শত্রুর মত ব্যবহার করছেন"—

"কেন বলত ?"

"স্বভাব।"

আমি হাসলাম, "শুধুই স্বভাব ? কোন দুর্ব্যবহার করনি তো ?"

"দুর্ব্যবহার ! আমার মত ভদ্রলোক ওসব করতে পারে ?"

"তাহলে ? ভদ্রলোকের কি কোন মেয়ে আছে ?"

"আছে। কিন্তু তার সঙ্গে আমার কি সম্বন্ধ !" সুব্রত আমার কথায় অবাক হল।

"দেখতে সুন্দরী ?"

"সুব্রত হো হো করে হেসে উঠল, "সম্পাদক, তুমি স্কাউণ্ড্রেল্।" পরে হাসি থামিয়ে সে সুর নীচু করে বলল, "তার মেয়ে দেখতে অত্যন্ত সাধারণ, তা ছাড়া তুমি কি জানোনা যে আমার হৃদয় আর আমার কাছে নেই ?

"জানি তুমি হৃদয়হীন।"

"ঠাট্টা নয়। আমি আমার হৃদয়কে দান করে ফেলেছি।"

"চমৎকার। হিন্দী ছবির নায়কের মত কথাটা হৃদপিণ্ডে দু'হাত রেখে বলতে পারতে"—

"কিন্তু অনিমেষ রায়, তুমি কি দোরগোড়াতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই রহস্যালাপ করবে ? আমার অবস্থান্তর ঘটেছে বলে বুঝি তুমি আর ভেতরে যেতে উৎসুক নও ?"

পা বাড়িয়ে কপট গাম্ভীর্য্যের সঙ্গে বললাম, "ওহে নীচাশয়, আমাকে ভুল না বুঝে তুমি এবার পথ দেখাও, আমি তোমার অনুসরণ করি"—

"সুস্বাগতম্"—

ভেতরে ঢুকলাম। মধ্য-কলকাতার চিরাচরিত চেহারা। ভিজে, স্যাঁতসেঁতে, অন্ধকার। দোতালা বাড়ী। নীচে তিনটে ঘরওয়ালা দুটো ফ্ল্যাট। প্রতিটি ফ্ল্যাটে জল ও রান্নার স্বতন্ত্র ব্যবস্থা আছে। ওপরে দুটো ঘরওয়ালা একটা ফ্ল্যাট, তা ছাড়া রান্নাঘর ও বাথরুম। চল্লিশ টাকা ভাড়া। সুব্রত ওপরটা নিয়েছে, নীচের বাঁ দিকে থাকেন ভোলানাথ বাবু, ডানদিকে থাকেন গুরুপদবাবু। একপাল ছোট বড় মাঝারি ছেলেমেয়ে দেখে, মা ষষ্ঠী যে জাগ্রত দেবী তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া গেল। এগোলাম। বাইরে তখনও দিনের আলো রয়েছে।

কিন্তু ভেতরে সন্ধ্যের ঘুটঘুটে অন্ধকার। রীতিমত হাৎড়ে হাৎড়ে এগোতে হল। বাঁ-দিকে সিঁড়ি, তিনটে পাক খেয়ে ওপরে উঠে গেছে। উঠলাম।

পাশাপাশি দুটো ঘর। সিঁড়ির সামনেরটাতে সুব্রত'র মা থাকেন, পরেরটায় থাকে সে। মাঝারি সাইজের ঘর জানালাগুলো দক্ষিণ-মুখো, রোদ বাতাস আসে। উলটো দিকে ছোট্ট একটা রান্নাঘর, তার পাশে এক চিলতে ছাদ। সাধারণ জীবনের পক্ষে অসুবিধের কিছু নেই। ঘরের ভেতরে ঢুকে দেখলাম যে বেশী জিনিষপত্র নেই সুব্রতদের। মেঝের ওপর বিছানা পড়ে আছে। ছবিগুলো এদিক ওদিক স্তূপীকৃত, কয়েকটা টাঙ্গানো হয়েছে। বই, ম্যাগাজিন, রং, তুলি, ব্রাস সব এক কোণে জমা হয়ে আছে। একটা চেয়ার, টিপয় একটা, ইজেল আর একটা মোড়া হচ্ছে ফার্ণিচার। দেয়ালে আট আনার একটা ব্রাকেটে ঝুলছে জামা কাপড়। সেই পুরানো অগোছাল ভাব। কিন্তু আগে অগোছাল থাকলেও স্বচ্ছলতার ছাপ ছিল সব কিছুতে, এখন দেখে পরিষ্কার মনে হল যে কাণ্ডকারখানা বিপরীত চলছে।

চা নিয়ে সুব্রতর মা ঘরে এলেন, আমাকে দেখে সহাস্যে বললেন "অনেক দিন পরে এলে বাবা"—তারপর একটু থেমে যোগ করলেন, "এর মধ্যে চাকা ঘুরে গেছে বাবা, আমরা তার তলায় পড়েছি"—

মুখে জোর করে হাসি ফুটিয়ে বললাম, "তাতে কি খুড়ীমা, আবার চাকার ওপরে উঠবেন। ভয়ের কিছু নেই, যে চাকার তলায় পড়েছেন তার কিন্তু একটা মজা আছে—সেটা থামে না, ঘোরে"—

সুব্রতের মা হাসিমুখে বললেন, "তোমরা সাহিত্যিক, কথায় কি পারবার জো আছে বাবা। আচ্ছা বোস, গল্প কর"—

তিনি চলে যেতে আমি সুব্রতকে প্রশ্ন করলাম, "তারপর কি ব্যাপার? সংসারের দায়িত্ব ঘাড়ে আসায় ভয় পাওনি তো?"

সে নাটকীয় ভঙ্গীতে জবাব দিল, "ভয়! আমি কি ডরাই কভু, ভিখারী রাঘবে? না! মা আর আমি, এই তো দুটি প্রাণী, ভয়ের কি আছে?"

"কি ভাবে চালাবে?"

"কি ভাবে আবার, ছবি এঁকে চালাব। এর মধ্যে দু'তিন জায়গায় ঘুরে কিছু কাজও পেয়েছি ইতিমধ্যে। পত্রিকা, খবরের কাগজ আর প্রকাশকদের কাছে যেতে হবে, একটা পাবলিসিটি ফার্মে চাকরীর চেষ্টাও করছি। যা হোক করে চলবেই।"

"তা জীবন-সংগ্রামটি কেমন লাগছে?"

সুব্রত একগাল হাসল, "চমৎকার। দেখছি যে ঘাম ঝরলেও আনন্দ আছে।"

কথাটা এত ভাল লাগল যে কয়েক সেকেণ্ড শুধু চুপচাপ চা'য়ে চুমুক দিতে লাগলাম, তারপর জিজ্ঞেস করলাম, "এখানে এসে ছবি আঁকা বেড়ে গেছে না কমেছে?"

"কমেছে।"

এই উত্তরটাই প্রত্যাশা করছিলাম, তবু প্রশ্ন করলাম, "কেন?"

"ঐ যে ভদ্রলোককে দেখলে? ঐ ভোলানাথ বাবু আর গুরুপদ বাবুর এককাঁড়ি ছানা পোনাদের চীৎকার, হট্টগোল দিনরাত লেগেই আছে।"

"ভদ্রলোকেরা কি করেন?

"ভোলানাথ বাবু নাকি কোন এক মার্চেণ্ট অফিসে কেরাণী,

শ'দেড়েক টাকা মাইনে পান। বাড়ীতে পোষ্য বলতে স্ত্রী আর ছেলে মেয়ে। বড় সন্তানটি বিবাহযোগ্যা একটি মেয়ে। অবস্থাটা বুঝতে পারছ? আজকালকার দিনে দেড়শ'টি টাকায় আটটি মুখ মানে একেবারে 'প্রলয়-পয়োধি-জলে' আর সেই বিবাহযোগ্যা মেয়েটির জন্য প্রলয়-পয়োধিতে মহাপ্রলয়ের লক্ষণ দিয়েছে। গুরুপদ বাবুর ইতিহাসও তদ্রূপ।”—

“আহা, এ একেবারে আদর্শ বাঙালী জীবন!”

“শুধু তাই নাকি? ভোলানাথ বাবুর একজন আত্মীয় থাকেন তাঁর সঙ্গে—লোকটি গানের মাষ্টারী করে। সকালে আর রাতে তার সঙ্গীত চর্চ্চায় আমার জ্বর আসে।”

“বাঃ—চমৎকার!”

“আর বলো না, উপায় নেই বলেই থাকতে হবে।” সুব্রত মুখ বিকৃত করল।

তা লক্ষ্য করে বললাম, “এবং উপায় নেই বলেই এক বাড়ীর ভাড়াটেদের সঙ্গে একটু মিলেমিশে থাকতে হয়।”

“তা জানি। সেদিক থেকে কোন ত্রুটি হয়নি। হাজার হোক বাঙালী তো। ভোলানাথ বাবুর স্ত্রী এসে মায়ের সঙ্গে একদিন দুপুরে আলাপ করে গেছেন, মায়ের সঙ্গে বেশ জমে গেছে তাঁর, ফলে মহিলাকে মাসীমা বলে ডাকতে হচ্ছে আমাকে। বাচ্চাদের সঙ্গেও বেশ ভাব হয়েছে, আমি তাদের দাদা বনে গেছি। শুধু ভোলানাথ বাবুর সঙ্গেই আলাপটা জমেনি! বে-রসিক লোক, আমাকে কেমন যেন অপছন্দ করেন। ভালো করে লক্ষ্য করেছি ভদ্রলোককে। খিটখিটে, রাসভারী, মহারাজ মনুর সুযোগ্য উত্তরাধিকারী।”

কথা বলতে বলতে সন্ধ্যে পার হল। সুব্রত ঘরের আলো জ্বালিয়ে

দিল। জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখলাম যে দূরবর্ত্তী বাড়ীগুলোতেও আলো জ্বলে উঠেছে। মহানগরীতে রাত এসেছে।

সুব্রতের দিকে ফিরে তাকালাম, "সুব্রত"—

"কি ?"

"আজকালও কি পিকাডিলি আর হুইস্কি চলছে ?"

"পাগল, টাকা কোথায় ?"

"তা হলে ? আঙ্গুর ফল টক বলে ছেড়ে দিলে নাকি ?

সুব্রত ছেলে-মানুষের মত হাসল, বলল, "ছাড়িনি, ব্র্যাণ্ড বদ্‌লেছি।"

"তার অর্থ ?"

"বিদেশী দুর্লভ হওয়ায় স্বদেশীর সুলভতা আমার চিত্তহরণ করেছে। বুঝলে না ? আহা ধান্যেশ্বরী, মানে—ধেনো"—

"ছি ছি ছি—শেষে"—

"বাজে কথা বলো না ভাই, গেঁয়ো যোগী ভিখ্ পায় না তাই, তা নইলে গুণে দুর্গুণে তা বিলিতীর চেয়ে কম নয়"—

"তুমি মরবে।"

"তা মরব বটে, পৃথিবীতে কেউই বাঁচে না।"

"হুঁ, তা হলে ধেনোই চলছে !"

"চলছে। বাড়ীর নীচে দোকান দেখনি ?"

"দেখেছি। সেইখান থেকে কিনে আনো ? সবার চোখের সামনে ?"

"সবার তোয়াক্কা করি নাকি আমি ?"

"না ?"

"তা করি এবং সেই জন্যেই একটা নভেল উপায় বের করেছি।"

"কি ?"

"এই জানালা দিয়ে একটা দড়িতে খালি বোতল ও পয়সা বেঁধে ঝুলিয়ে দিয়ে একটা হাঁক দিই, দু'মিনিটে বোতল ভরে ফিরে আসে"—

এই বলে সে কোণের দিক থেকে একটা দড়ি নিয়ে এল, হেসে বলল, "দাঁড়াও, কাণ্ডটা দেখিয়ে দিই তোমাকে"—

সত্যি তাই। তিন চার মিনিটের মধ্যে এক বোতল দেশী মদ ওপরে উঠে এল। দেখে হাসব কি কাঁদব ভেবে পেলাম না, চুপ করেই রইলাম। দুঃখ হল একটু। তবু আশ্বস্ত হলাম এই ভেবে যে, দিন কয়েক আগে তার যে উত্তেজিত ও অসহায় ভাব লক্ষ্য করেছিলাম আজ তা নেই। দুঃখের সংঘাতে যে সাময়িক বিভ্রান্তি তার মধ্যে পরিলক্ষিত হয়েছিল আজ তা অন্তর্হিত হয়েছে। সহজভাবে গ্রহণ করেছে সে তার অবস্থান্তরকে, সাহসের সঙ্গে বজায় রেখেছে তার মনোবলকে।

"একটু গলা ভিজিয়ে নিই কি বল?" সুব্রত প্রশ্ন করল।

জবাব দিলাম, "তোমার ইচ্ছে।"

সে একটা চায়ের কাপে খানিকটা জলের সঙ্গে কিছুটা মিশিয়ে নিয়ে চুমুক দিতে সুরু করল, আমাকে রাগাবার জন্ত বলল, "চমৎকার! সম্পাদক কুলতিলক, তুমি জানো না তুমি কি হারাইতেছ।"

কথা বললাম না। হঠাৎ স্তূপীকৃত ছবিগুলোর দিকে তাকাতে তাকাতে দেখলাম যে একটা ছবি চার পাঁচ টুকরো হয়ে পড়ে আছে। কৌতূহল হল। আঁকা ছবি ছিঁড়ে ফেলেছে কেন সুব্রত? এক একটা করে টুকরোগুলোকে সাজিয়ে অবাক্ হয়ে গেলাম। সুব্রতের দিকে তাকালাম।

আমার চাউনি লক্ষ্য করে সে মৃদু হাসল, বলল, "ছিঁড়ে ফেলেছি, ডাষ্টবিনে ফেলে আসব ঠিক করেছিলাম, পরে একটু ভেবে তা করলাম,

না। কাল ঐ ছেঁড়া টুকরোগুলো ছবির মালিককে পাঠিয়ে দেব, তার সঙ্গে একটা নোট পাঠাব—"বাঁচা গেল।"

অজ্ঞাতসারেই মুখ দিয়ে প্রশ্ন বেরোল, "ব্যাপার কি? হঠাৎ এত বিরাগ কেন? কি হয়েছে?"

কাপে চুমুক দিয়ে সে বলল, "বলছি"—

কিন্তু বাধা পেল সে। ঠিক সেই মুহূর্তেই দরজার গোড়ায় একটি পুরুষের হাসিমুখ দেখা গেল আর কথা শোনা গেল, "সুব্রত বাবু আছেন? এই যে—আসতে পারি?"

সুব্রত কাপটা এক পাশে সরিয়ে রেখে তাকাল লোকটির দিকে বলল, "আসুন"—

লোকটি ভিতরে এল। বছর চৌত্রিশ বয়স হবে তার, অত্যন্ত কালো দেখতে। কিন্তু তাতেই তার বর্ণনা শেষ হয় না, দেখতে লোকটি কুৎসিতও বটে? মোটা নাক, ভাঙ্গা গাল, পুরু ঠোঁট, জ্বলজ্বলে চোখ আর মাথায় একরাশ কোঁকড়ানো চুল। অনেকটা নিগ্রোদের মত দেখতে। দেখে আকৃষ্ট হলাম।

লোকটি বসল, বলল "তারপর কি খবর সুব্রত বাবু, আজ ক'টা ছবি আঁকলেন?"

সুব্রত শুষ্ককণ্ঠে বলল, "এঁকেছি দু'তিনটে, ভাল হয় নি।"

"হেঁ হেঁ, কি যে বলেন,—আপনার হাত-তো চমৎকার।"

সুব্রত আমার দিকে একবার তাকিয়ে হাসল, পরে লোকটিকে বলল, "আসুন আপনাদের আলাপ করিয়ে দিই—"

আমার সঙ্গে লোকটির পরিচয় হল। তার নাম গোকুল ভট্টাচার্য্য সে একজন সঙ্গীত-শিক্ষক, ভোলানাথ বাবুর সঙ্গে অতিদূর সম্পর্কের একটা আত্মীয়তা আছে, তাঁর সঙ্গেই থাকে। সুব্রতের মতে বেশ গুণী

লোক। অবশ্য কিছুক্ষণ আগে এই "গুণ" সম্পর্কে সুব্রত আমাকে যা বলেছিল তা মনে থাকায় আমি বুঝতে পারলাম যে 'গুণীলোক' শব্দ দুটির পেছনে একটা প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গের আভাসই আছে। কিন্তু গোকুল এই স্তুতিবাদে খুসী হয়ে উঠল। তার চোখে মুখে একটা বাস্তব কৃতজ্ঞতা ফুটে উঠল।

আমি একজন লেখক ও কাগজের সম্পাদক শুনে গোকুলের দু'চোখে সম্ভ্রম ও বিস্ময় ঘনীভূত হয়ে উঠল। যেন আমি একজন দেবতাবিশেষ। যেন আমি হিমালয়-প্রত্যাগত একজন সিদ্ধ মহাপুরুষ। হাসি পেল, কিন্তু পরমুহূর্তেই বুঝলাম যে লোকটি বোকা নয়, বুদ্ধিমান এবং বুদ্ধিমান বলেই সে আমার পরিচয় পেয়েই অমন ভাব দেখাল।

গোকুল বিনীতকণ্ঠে প্রশ্ন করল, "তা রায়মশাই, আপনার কাগজে কি সবাই লিখতে পারে?"

"হ্যাঁ। যে কোন লোকের লেখাই আমরা ভাল হলে ছাপি।"

"আর তার জন্য ইয়ে—হেঁ হেঁ, পারিশ্রমিক"—

"দিই—সাধ্যমত।"

গোকুলের মুখে প্রসন্ন ও উজ্জ্বল হাসি ছড়িয়ে পড়ল, "আজ্ঞে, তাহলে একটি নিবেদন আছে"—

"বলুন"—

"আমি গান নিয়ে অনেক রিসার্চ্চ করেছি, স্বরলিপি-সমেত প্রবন্ধাকারে আমি তা ছাপতে চাই। আপনার কাগজে"—

অসম্ভব। সবেগে মাথা নাড়লাম, "না"—

"কেন?" গোকুলের মুখে অমাবস্যা নামল।

নরম গলায় জবাব দিলাম, "আমাদের কাগজ সাহিত্য বিষয়ক—ওতে—সঙ্গীত সম্বন্ধে প্রবন্ধ চলে না"—

"ওঃ"—শুষ্ককণ্ঠে গোকুল হাসল, "হেঁ হেঁ, তা জানা ছিল না। আচ্ছা, তাহলে আমি গল্প আর কবিতাই না হয় দিয়ে আসব—কয়েকটা লিখেছি—হেঁ হেঁ, মন্দ লিখিনি মনে হচ্ছে"—

সমূহ বিপদ! উপায় নেই, পড়েছি মোগলের হাতে। সুতরাং ভাসা ভাসা কথায় বললাম, "তা বেশ তো, দেখা যাবে"—

"বেশ, বেশ, আপনার সঙ্গে আলাপ করে কিন্তু বড় আনন্দ হল অনিমেষ বাবু। কত নাম শুনেছি, কিন্তু এমন ভাবে"—গোকুল মাঝপথে থেমে গেল, দু'তিনবার একটা চতুষ্পদ জন্তুর মত বাতাস টেনে নিয়ে বলল, "কি রকম যেন একটা গন্ধ পাচ্ছি সুব্রতবাবু"—

সুব্রত কিছুটা গাম্ভীর্য্যের সঙ্গে প্রশ্ন করল,"কি রকম? ধোঁয়ার গন্ধ?

"উঁহু"—

"তবে?"

"ইয়ে—ইয়ে—হেঁ হেঁ, কিছু মনে করবেন না ব্রাদার, বাতাসে যেন দিশি মালের গন্ধ পাচ্ছি"—

সুব্রত মাথা নাড়ল, "আপনার মস্তিষ্ক বিকৃত হয়েছে গোকুলবাবু"—

"মস্তিষ্ক! মানে মাথা—আমার? কেন?"

"কেন নয় শুনি? নীচে যে একটা দেশী মদের দোকান আছে তা কি আপনি জানেন না?"

"এ্যাঁ!" গোকুলবাবুর চোখের তারা বড় হয়ে উঠল, "হ্যাঁ! তা—তাইত, কথাটা মনেই পড়েনি"—

সুব্রত হাসল এবার, "বুঝলেন না, গন্ধটা ঠিকই ধরেছেন আপনি, তবে তা নীচের থেকে আসছে। কিন্তু ব্যাপারটা কি বলুন তো, চট্ করে গন্ধ থেকেই ধরে ফেলতে পারেন আপনি, সেটা বড় সোজা কথা নয়"—

"হেঁ হেঁ হেঁ"—আত্মপ্রসাদের হাসি সশব্দ হয়ে উঠল গোকুলের গলায়।

"একটা কথা বলবেন গোকুলবাবু?"

"বলুন"—

চোখ ঘুরিয়ে সুব্রত গলার সুর নামাল, "অভ্যেস আছে নাকি আপনার?"

"মানে?" গোকুলের হাসি-হাসি মুখটা হঠাৎ প্যাঁচার মত হয়ে গেল।

"আহা, বলেই ফেলুন না, আমি বন্ধুলোক, অত ঢাক ঢাক গুড় গুড় কেন?"

"ইয়ে, আপনার কথা তো কিছু বুঝতে পাচ্ছি না সুব্রতবাবু"—মান করার ভঙ্গী করে সুব্রত লঘুকণ্ঠে প্রশ্ন করল, "চলে নাকি?"

গোকুল জিভ্ বের করল, "রামো রামো—হেঁ হেঁ—ছি ছি ছি, আমি ওসবের ত্রিসীমানায় নেই মশায়। আচ্ছা, আজ তাহলে উঠি সুব্রতবাবু। অনিমেষবাবু—নমস্কার"—

ঘর থেকে গোকুল প্রায় লাফিয়েই চলে গেল।

সুব্রত আমার দিকে তাকিয়ে হাসল, "কেমন লাগল?"

"চমৎকার।"

"আরো চমৎকার লাগবে ভদ্রলোকের গান শুনলে। গলা মন্দ নয়, জানেও বিস্তেটা, কিন্তু তার অত্যধিক চর্চ্চা করে আমার নার্ভগুলোকে অকর্ম্মণ্য করে ফেলার উপক্রম করেছে।"

"ভদ্রলোকের ওপর আমার শ্রদ্ধা বাড়ছে।"

"শ্রদ্ধা না ছাই। শুধু কি নিজে গায়, ভোলানাথবাবুর মেয়েদেরও শেখায় লোকটা। বড় মেয়েটি মন্দ গায় না কিন্তু বাকী সব—হুঃ—সারে গামা'র বেসুরো ধমকে আমার তুলি থেমে যায়, ছবি খারাপ হয়ে যায়"—

হেসে উঠলাম, বললাম, "তাহলে তো বেশ ভালই আছ দেখছি।

মানুষ দেখছ, অভিজ্ঞতা লাভ করছ"—জলমিশ্রিত মদের কাপটি আবার টেনে নিল সুব্রত, এক চুমুক খেয়ে আমার দিকে একটা তির্য্যক দৃষ্টি হেনে বলল, "লেখকের কাছে যা অভিজ্ঞতা হয়ত সব সময়ে একজন চিত্রকরের কাছে তা মূল্যবান নাও হতে পারে"—

কথাটায় ভুল ছিল। জীবনের সমস্ত অভিজ্ঞতাই ছবি বয়ে আনে না, তা জানা কথা। কিন্তু অভিজ্ঞতায় লেখক ও চিত্রশীল্পির মধ্যে একই ফল উৎপাদন করে—তা দৃষ্টিভঙ্গী। ভাবলাম যে সুব্রতকে বুঝিয়ে বলি কথাগুলো। বলি যে অভিজ্ঞতা থেকে দৃষ্টিভঙ্গী এবং তার থেকেই শিল্প-বস্তু নির্ব্বাচন স্থিরীকৃত হয়।

তাকালাম সুব্রতের দিকে। সে কি যেন ভাবছে। কথাগুলো আর বলা হল না, ঘরের মধ্যে নিঃশব্দতা নেমে এলো।

হঠাৎ মনে পড়ল, বললাম, "বাঃ, গল্পটা যে চাপা পড়ে গেল সুব্রত!"

সুব্রত চমকে উঠল, "কোন্ গল্প!"

"ঐ ছেঁড়া ছবিটার গল্প। কেন ছিঁড়েছ ওটাকে?"

"ওঃ—আচ্ছা—শোন"—

সুব্রত যা বলল তার সারমর্ম্ম এই।

সেদিন। মানে দিন চারেক আগেকার কথা।

সুব্রত শিপ্রার বাড়ীতে গেল। আর আগে আরো পাঁচ দিন গিয়েছিল সে, শিপ্রার দেখা পায়নি। গিয়ে হয়ত শুনত যে আজ সে মিঃ দাসের বাড়ী গেছে, এই একটু আগে সে আই, সি, এস, মিঃ ব্যানার্জ্জীর মেয়ের বিয়েতে নেমন্তন্ন খেতে গেছে, অথবা শুনত শিপ্রা নিউমার্কেটে গেছে, পিকনিকে গেছে। দেখা পেত না সুব্রত। প্রতিদিনই সে ফিরে আসতো,

একটা চিঠি রেখে আসতো, 'আজ ফিরে গেলাম। কাল ঠিক এই সময়েই আসব, থেকো।' কিন্তু পরদিনও নির্দ্দিষ্ট সময়ে গিয়ে সে দেখত যে শিপ্রা নেই। দেখে ক্ষেপে উঠত সে, মুখচোখ কালো হয়ে যেত, চোখের কোণে উত্তেজনার বহ্নি জ্বলত, ভাবত ব্যাপার কি, ব্যাপার কি? শিপ্রা কি তার সঙ্গে দেখা করতে চাইছে না? কথাটা নিয়ে সুব্রত খুব গভীরভাবে চিন্তা করেছিল। পর পর পাঁচদিন সে তার দেখা পায়নি। কেন? তার আগে তিন চারবার শিপ্রার দেখা পেয়েছিল সে, লক্ষ্য করেছিল যে সাক্ষাৎ করাটা খুব সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য হতো। আর শিপ্রা যেন দূরে দূরে থাকত, সুব্রতের কাছে ঘেঁষত না সুব্রত তার হাত ধরতে গেলে সরে যেত। আর তখনি মনের মধ্যে খট্কা জাগত। ব্যাপার কি? শিপ্রা এমন ব্যবহার কেন করে?

এমনি একটা দিনের কথা।

সিঁড়ি দিয়ে উঠতেই শিপ্রাকে দেখতে পেয়েছিল সুব্রত। শিপ্রা তখন বেরিয়ে যাচ্ছিল।

সুব্রত প্রশ্ন করেছিল, "কোথায় যাচ্ছ?"

শিপ্রা মৃদু হেসে উত্তর দিয়েছিল, "মিঃ মজুমদারের মেয়ে রমলা আমার বান্ধবী, তার বিয়ের জন্য ডিনার দেওয়া হচ্ছে ফিরপোতে—সেখানে যাচ্ছি"—

সে যখন কথাগুলো বলছিল তখন সুব্রত লক্ষ্য করছিল যে, শিপ্রা সেদিন একটু অতিরিক্ত মাত্রায় সাজসজ্জা করেছে, ঠোঁটের লিপ্‌ষ্টিক আর আর গালের রূজকে সে একটু বেশী পরিমাণে গাঢ় করেছে। আর কথাগুলো বলার সময় তার মুখে চোখে ফুটে উঠছিল একটা অসহায় অপরাধী ভাব। অপ্রত্যাশিতভাবে ধরা পড়ে যাওয়ায় একটা ক্রোধ-মিশ্রিত বিনয়ের ভাব।

সুব্রত শিপ্রার পথ আটকে বলেছিল, "ফিরপো! তা এখন তো বেলা চারটে মাত্র, এখুনি কেন?"

শিপ্রার গাঢ় রং-মাখা ঠোঁট দুটো নিঃশব্দে নড়ে উঠেছিল, একবার ঢোক গিলে সে মুখের ওপর আয়াস-সাধ্য হাসি টেনে এনে বলেছিল, "ইউ আর সিম্‌প্লি এ চাইল্ড্‌ সুব্রত।"

"আমি প্রতিবাদ কচ্ছি – আমি চাইল্ড্‌ নই।"

"বাট্‌ ইউ আর—নইলে কথাটা বুঝতে পারছ না কেন? আমি এখন রমলার ওখানে যাব, আরো সব ফ্রেণ্ড্‌স্‌ আসবেন—তাদের সঙ্গে আমরা পরে ফিরপোতে যাব এ্যাণ্ড্‌ ডিনার উইল বি সার্ভড্‌ এ্যাট সেভেন"—

"কিন্তু—একটুও বসবে না? আমার সঙ্গে দুটো"—

শিপ্রা তরল কণ্ঠে হেসে বলেছিল, "হোয়াট এ বয়! কিছুতেই কথা শুনবে না? কিন্তু কেন? আই এ্যাম নট লস্ট টু ইউ। প্লীজ—আমাকে আজ ক্ষমা করো"—

"ক্ষমা!" সুব্রত পথ ছেড়ে দিয়ে হেসেছিল, "মি লেডী—দি রোড ইজ ওপেন ফর ইউ। কিন্তু কাল দেখা হবে তো—কাল?"

"টু'মরো?" চোখে শাণিত কটাক্ষের আগুন জেলে শিপ্রা বলেছিল, "নিশ্চয়ই দেখা হবে—এ্যাজ স্যুয়োর এ্যাজ টু'মরো।"

লঘুপক্ষ প্রজাপতির মত যেন বাতাসে ভর দিয়ে চলে গিয়েছিল শিপ্রা।

পর পর পাঁচ দিনের অনুপস্থিতি, তার আগেকার দিনের ফিরপো-যাত্রার কাহিনী এবং তারও আগেকার দিনগুলোর এড়িয়ে যাওয়ার লক্ষণ—এগুলো সুব্রতকে উত্তেজিত করে তুলেছিল। ব্যাপার কি? কেন শিপ্রা এই রকমভাবে তাকে এড়িয়ে চলছে? উদ্দেশ্যটা কি তার? বানার্ডশ'য়ের মতে মেয়েরাই পুরুষদের নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরায়। কথাটা মিথ্যে নয়। মেয়েরা চিরকালের শবরী। দি ইটার্নাল

হানুট্রেস্। শিপ্রাও তাকে ঘোরাচ্ছে। ঘোরাক, তার নারীমনকে একটু উল্লাসের খোরাক দিতে সুব্রত রাজী আছে। কিন্তু শিপ্রার সীমা লঙ্ঘন করে যাওয়াটা সে কিছুতেই বরদাস্ত করবে না। পুরুষেরও একটা অহমিকা আছে। যতক্ষণ সে বুঝতে পারেনা যে, সে ক্রীড়নক ততক্ষণ সে ঠিক থাকে—পুরুষ সে বিষয়ে ছেলেমানুষ। কিন্তু যে মুহূর্ত্তে সে বোঝে যে, তাকে নিয়ে খেলা চলছে তখন সে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। অবশ্য পুরুষের মত পুরুষ হলে। সুব্রত এবিষয়ে ঘোর অহমিকা-সম্পন্ন। সে জানে যে সে পুরুষ-দেহধারী কোনও নারী নয়। তাই যে মুহূর্ত্তে সে শিপ্রার ব্যাপারটা নিয়ে একটু চিন্তা করেই উপলব্ধি করল যে তাকে নিয়ে খেলা চলছে, তখন সে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। খেলা। এ খেলা বন্ধ করতে হবে। হৃদয় নিয়ে খেলা বেশীক্ষণ চলে না। আর খেলার মাত্রা যখন সীমা ছাড়িয়ে যায় তখন তাকে সন্দেহ করা উচিত, তখন পুরুষের থামা উচিত। কারণ বেশী খেলা মানেই ক্লান্তি, অগভীর হৃদয়ের অনুরাগহীনতা, যবনিকা-পতনের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত।

কিন্তু কেন? নাটক সুরু হতেই পঞ্চম অঙ্কের শেষ দৃশ্য কেন? শিপ্রার আবেগের এই পরিবর্ত্তন হল কেন? সুব্রত ভেবে আকুল হয়েছিল। হঠাৎ যেন চেতনার মধ্যে বিদ্যুৎস্ফুরণ ঘটেছিল। সুব্রত হিসেব করে দেখেছিল যে শিপ্রার এই অবহেলা সুরু হয়েছে প্রায় দু'সপ্তাহ আগে থেকে। অর্থাৎ কাকার সংসার থেকে চলে আসার পর থেকে। তাহলে কি—কথাটা একটু ভাবতেই সুব্রতের শরীর ইস্পাত-কঠিন হয়ে উঠেছিল!

তারপর—ঠিক চারদিন আগে, যেদিন শিপ্রা নিশ্চিত দেখা হবে বলেছিল, সেদিনই সুব্রত গেল তাদের বাড়ী। এবং যা প্রত্যাশা করেছিল ঠিক তাই হল—শিপ্রাকে বাড়ীতে পেল না সে। শিপ্রার মা

বললেন যে, সে কোথায় গেছে তা জানা নেই তাঁর, তবে সে নাকি যাবার আগে বলে গিয়েছে যে ফিরতে তার একটু রাত হবে। চুপচাপ নীচে নেমে গেল সুব্রত। চোয়াল দুটো তার শক্ত হয়ে উঠল, চোখের কোনে, দৃঢ়সংবদ্ধ দুই ঠোঁটের পাশে দেখা গেল একটা কঠিন সঙ্কল্প।

বাইরে বাইরে অনেকক্ষণ ঘুরে বেড়াল সে। মাঠে, গঙ্গার ঘাটে, হোটেলে, রেঁস্তোরাঁতে। উদ্ধত প্রেতের মত তাকে অনবরত শিপ্রার কথা অনুসরণ করতে লাগল। রাত প্রায় সাড়ে আটটার সময় সে আবার তার বাড়ী গেল। চাকর বলল যে শিপ্রা তখনো ফেরেনি। ওপরে উঠল না সুব্রত, নীচের বারান্দায় নিঃশব্দে অপেক্ষা করতে লাগলো।

আরো আধ ঘণ্টা কাটল।

হঠাৎ মোটরের আওয়াজ পাওয়া গেল ফটকের সামনে। সুব্রত একপাশে সরে দাঁড়াল। একটা গাড়ী এসে দাঁড়াল। ঝক্‌ঝকে ক্রাইস্‌লার। দরজা খুলে নেমে এল একজন সাহেবী পোষাক পরা যুবক। তাকে চিনতে পারল সুব্রত। সাব-জজ মিঃ চৌধুরীর ছেলে, সদ্য বিলেত-ফেরত ডাক্তার। যুবকটির ঠিক পেছনে পেছনেই নেমে এল শিপ্রা। ব্যাপারটা বুঝতে পারল সুব্রত। তার সিদ্ধান্তই সত্যি। সুব্রতের অবস্থান্তরের সঙ্গেই শিপ্রার রূপান্তর ঘটেছে। একজন গরীব চিত্রশিল্পীর সঙ্গে দু'একদিন ফান্ করা যায়—তার বেশী নয়। তার চেয়ে বড় শিকারে অনেক লাভ। সাবজজের ছেলে, বিলেত-ফেরত ডাক্তারের তুলনায় সুব্রত কি?

কথাবার্ত্তা শোনা গেল।

যুবকটি সহাস্যে বলল, "তাহলে আবার কাল?"

শিপ্রা তরল হেসে বলল, "হ্যাঁ কাল, এ্যাণ্ড্ কাম্ আর্লিয়ার্"—

"অল রাইট—চিয়ারিও সুইট ওয়ান।"

"চিয়ারিও।"

গোঁ গোঁ শব্দ তুলে হুস্ করে অদৃশ্য হয়ে গেল ক্রাইস্‌লারটা। শিপ্রা গুণ গুণ করে একটা ইংরেজী গান গাইতে গাইতে এগিয়ে এল কাছে। সে সুব্রতকে দেখতে পায়নি, সোজা সিঁড়ির দিকে চলে যাচ্ছিল এমনি সময়ে সুব্রত ডাকল।

"শিপ্রা দেবী—"

শিপ্রা চমকে উঠল, দাঁড়াল, ঘুরে তাকাল। সুব্রতকে দেখতে পেয়ে তার মুখটা হঠাৎ বিবর্ণ হয়ে এল, চোখের তারায় দেখা দিল একটা অপরাধীর ভাব।

তবু জোর করে হাসবার চেষ্টা করে সে বলল, "হ্যালো—এত রাতে যে সুব্রত? আই এ্যাম সো সরি—রিয়েলি, ভারী দুঃখিত।"

ঝক্‌ঝকে দাঁত মেলে সুব্রত হিংস্র হাসি হাসল, বলল, "দুঃখ করে কোন লাভ নেই শিপ্রা দেবী। একজন গরীবের জন্য"—

"তুমি আমাকে ব্যঙ্গ করছ।"

"ব্যঙ্গ! তোমাকে! হাউ ডেয়ার আই? না, তা নয়। সত্যি কথাই বলছি। পৃথিবীতে টাকাকড়ি ছাড়া যে কিছুই করা যায় না একথা জেনেও কারো গরীবকে ভালবাসা উচিত নয়।"

"সুব্রত!"

"আর খেলা করো না শিপ্রা দেবী—ঢের হয়েছে। শোন, সুব্রত মুখুজ্জে খুব বোকা নয়, বুঝলে?"

"তুমি আমাকে চোখ রাঙাচ্ছ!" শিপ্রা উত্তেজনায় কাঁপতে কাঁপতে বলল।

"চোখ রাঙাবো কেন—আদিম আইন প্রচলিত থাকলে আমি তোমাকে বেশ একটা শিক্ষা দিতাম –"

"ও গড্—মাই গড্—"

"থামো চকোলেট গার্ল, থামো। খুব শকিং মনে হচ্ছে? তা হোক। কিন্তু শুনে রেখো, তোমার অন্তরকে আমি আবিষ্কার করেছি। তুমি একটি থার্ড ক্লাস স্ট্রীট-ওয়াকার—"

"গেট আউট,"—শিপ্রা হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল, "গেট আউট"—

সুব্রত শ্বাপদের মত হেসে উঠল, "তা যাচ্ছি। যাব বলেই তো আজ সন্দেহের নিরসন করে গেলাম, খেলা শেষ করে দিলাম। তোমার মত মেয়ের হাতে আমি খেলনা হব না—সার্টেনলি নট। তা বেশ করেছো শিপ্রা দেবী, ইউ আর ভেরী ওয়াইজ"—

"বেরিয়ে যাও এখান থেকে, বেরোও বলছি—"

"বেরোচ্ছি সুন্দরী, তার আগে শেষ কথাটা বলে যাচ্ছি শোন—আমি তোমার সঙ্গে মোটেই প্রেমে পড়িনি, তবে ইচ্ছে ছিল, প্রেমে পড়ার একটু সখ হয়েছিল বলে। কিন্তু এখন দেখছি যে তুমি আমার প্রেমের যোগ্য নও, তুমি একটি বাজে ফিরিঙ্গী মেয়ের মত লঘুচেতা—আন্‌ফেথ্‌ফুল—"

"তুমি যদি এখন না যাও, তাহলে আমি দারোয়ানকে ডাকব· সুব্রত"—শিপ্রা রাগে প্রায় কেঁদে ফেলল।

"ডাকো - আমার নক্-আউট ব্লো'এর একটা সংখ্যা বাড়বে। তার দরকার কি শিপ্রা দেবী, আমি এমনিই যাচ্ছি। যাবার আগে তোমায় আমি শুভেচ্ছা জানাচ্ছি—হে বিশ্বাসঘাতিনী, কপটচারিণী, পুরুষ-চিত্ত বিমর্দ্দিনী, শ্বেতদ্বীপপ্রত্যাগত সব-জজ-পুত্রের মোটর-বিহারিণী ও অঙ্কশায়িনী হয়ে তুমি যেন অনন্তকাল নারকীয় সুখে দিনযাপন কর—চিয়ারিও"—

ঝড়ের মত সেখান থেকে বেরিয়ে গেল সুব্রত। তৃপ্তিতে তার বুক ভরে উঠল। যাক্, কয়েকটা কড়া কড়া কথা সে শুনিয়ে দিয়েছে শিপ্রাকে। উঃ, মেয়েটা খুব নাচিয়েছে কয়েকদিন। তার শোধ নেওয়া হল।

সব কথা বলে সুব্রত তাকাল আমার দিকে, হেসে বলল, "শুনলে তো? বাড়ী ফিরে এসে শিপ্রার ছবিটা দেখে চিত্ত জ্বলে উঠল, টুকরো টুকরো করে ছিঁড়লাম ওটাকে। ভেবেছিলাম যে ডাষ্টবিনে ফেলে দেব ওটাকে—পরে ভাবলাম যে তা না করে ওটা শিপ্রার নামে বাই পোষ্ট পাঠিয়ে দেব—খুব সারপ্রাইজড্ হবে"—

বললাম, "তুমি ভারী ছেলেমানুষ সুব্রত।"

"আর্টিস্ট মাত্রেই একটু ছেলেমানুষ হয়।"

"কিন্তু এত মেলোড্রামা কেন? ভুলে যাও সব কিছু। শেক্স্পীয়রের কথা জাননা—ফ্রেলটি, দাই নেম ইজ উম্যান'?"

সুব্রত মাথা নাড়ল, "জানতাম, কিন্তু এটা জানতাম না যে, 'ট্রেচারি, দাই নেম ইজ উম্যান'—"

"উত্তেজিত হয়োনা। আবার কাউকে ভালবাসলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।"

"আবার ভালবাসা! বাপ্, ভগবান আমাকে রক্ষা করুন, আমি আর ওর মধ্যে নেই। এখন থেকে আমার ধারণা এই যে, মেয়েরা বিশ্বাসঘাতিনীর জাত, ওরা এনার্জ্জি নষ্ট করে দেয়।"

"তোমার মত বদলাবে পরে।"

"না।"

চুপ করে রইলাম।

সুব্রত বলল, "তবে তোমার কথাটা ঠিক, ছবির টুকরোগুলো আমি

ডাস্টবিনেই ফেলে দেব, তা নইলে শিপ্রাকে একটু গুরুত্ব দেওয়াই হবে”—

এবারও জবাব দিলাম না। বুঝলুম যে সুব্রত একটু উত্তেজিত। ভালই হল। একটি সুন্দর মুখের কাছে আঘাত পেয়ে সে তার প্রজাপতি-বৃত্তিটাকে পরিহার করবে, এবার থেকে জীবনকে অধিকতর গুরুতরভাবে গ্রহণ করতে শিখবে। সে বুঝুক যে ভালবাসা আকস্মিক হলেও অত সুলভ নয়, ভালবাসার মত নারীও যে-সে নয় এবং যাকে তাকে ভালবাসতে চাইলেই ভালবাসা যায় না। যেমন তেমন ভালবাসা আর সবাইকে মহৎ প্রেরণা যোগালেও শিল্পীকে ঠেলে দেবে ধ্বংসের পথে। অন্যের জীবনে যে প্রেম আশীর্ব্বাদ, শিল্পীর জীবনে সে প্রেম অভিশাপ। কারণ শিল্পীর কাছে নারী মানে শুধু রূপ নয়, দেহকান্তি নয়, অতি আধুনিক বিলাসবতী ও কৌতুকচঞ্চলা নায়িকা নয়—তার কাছে নারী মানে গভীর হৃদয়ানুভূতি, সমবেদনা, শান্তি, সৌন্দর্য্য ও বন্ধুত্ব।

নিস্তব্ধতা নেমে এল ঘরের মধ্যে।

ঘড়ির দিকে তাকালাম। অনেকক্ষণ বসেছি, এবার না উঠলেই নয়।

“এবার উঠছি সুব্রত।”

সুব্রত নড়ে বসল, “যাবে ?”

“হ্যাঁ। তুমি কিন্তু কাল দু’তিনটে ছবি দিয়ে এস আমাকে, বুঝলে ? পূজো সংখ্যা তো বয়কট করলে, তবু দিও, সাধারণ সংখ্যার জন্য চাই।”

“আচ্ছা।”

উঠলাম। সুব্রত পেছন পেছন এল।

সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগলাম। শেষ বাঁকটা ফিরতেই হঠাৎ সিঁড়ির গায়ে লাগানো ঘরের ভেতরটা নজরে এল। তখন নীচের তলার ঘরগুলোতে বাতি জ্বলে উঠেছে; বাচ্চাদের কলরব শোনা যাচ্ছে,

রান্নাঘরে মেয়েদের হাঁড়িকুড়ির আওয়াজ হচ্ছে। দেখলাম যে ঘরের ভেতর, দেওয়ালে টাঙ্গানো একটা আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে একটি উনিশ কুড়ি বছরের মেয়ে চুল বাঁধছে। আমাদের পায়ের শব্দ পেয়ে মেয়েটি ফিরে তাকাল। দেখলাম মেয়েটিকে।

সুব্রত মৃদুকণ্ঠে বলল, "সেই মহাশয় ব্যক্তি, মানে ভোলানাথ বাবুর মেয়ে ওটি—নাম কৃষ্ণা।"

"বটে!"

আর একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করে হতাশ হলাম। মেয়েটি একপাশে সরে গেছে।

বললাম, "তুমি এবার ফেরো, আর ভদ্রতা করতে হবেনা সুব্রত, আমি একাই যেতে পারব।"

সুব্রত থামল। আমি বেরিয়ে এলাম।

সিনেমার ট্রেলারে নায়ক, নায়িকা ও মুখ্য পার্শ্বচরিত্রদের এক ঝলক করে দেখা যায়। সুব্রতের নতুন ঠিকানায় এই প্রথম পদার্পণে আমি তার প্রেমের কাহিনীর মুখ্য চরিত্র ও পার্শ্বচরি৷দেরও তেমনি দেখতে পেলাম। ভোলানাথবাবু, গোকুল ভট্টাচার্য্য, কৃষ্ণা। কিন্তু ট্রেলার দেখলে যেমন কাহিনীর খানিকটা আঁচ করা যায়, আমি কিন্তু সেদিন ওঁদের দেখে কিছুই অনুমান করতে পারিনি। খাপছাড়া একজন বয়স্ক ভদ্রলোক, আধ-পাগ্‌লাটে একজন সঙ্গীতশিক্ষক ও সাধারণ একটি বাঙ্গালী মেয়ে—তাদের দেখে কি করে বুঝব যে সুব্রতের জীবনে আরও পরিবর্ত্তন আসবে?

অথচ এখন থেকে তাই ঘটতে লাগল। দিগন্তের পরপারে দৃশ্যমান একটুকরো মেঘ যেন ক্রমে সারা আকাশে পরিব্যাপ্ত হয়ে পড়ল, চারিদিক অন্ধকার করে ফেলল। ধীরে, ধীরে—

দুই

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে দেখলাম যে ভোলানাথবাবুর মেয়ে আয়নার সামনে চুল বাঁধছে। সুব্রতের কাছে শুনলাম যে তার নাম কৃষ্ণা। দেখতে সাধারণ। বয়স মনে হল উনিশ-কুড়ি।

সেই এক ঝলক দেখে কৃষ্ণার বিষয়ে কিছুই বলা যায় না। যদিও কাহিনীকারেরা তা পারে, তবু আমি মিথ্যের আশ্রয় নেব না। পরে আমি তার বিষয়ে যা কিছু জেনেছিলাম তার ওপর ভিত্তি করেই আমি এখানে কৃষ্ণার বিষয়ে কিছু বলছি। আমি যে অবস্থায় তাকে দেখে এলাম ঠিক তার পর থেকে সে রাতে যা হল তাই বলছি। সেটা অবশ্য অসাধারণ কিছু নয়। এই চুল বাঁধা, ভাই-বোনদের সঙ্গে আবোল-তাবোল কথা বলা, গোকুল দা'র তাড়া খেয়ে একটু গানের অভ্যেস করা, একটা মাসিক-পত্র পড়া, সবাইকে খাওয়ান, নিজের খাওয়া, রান্নাঘর গুছিয়ে বিছানায় এসে বসা, তারপরে ঘুমোবার জন্য তৈরী, এই সব আর কি।

কিন্তু ঘুম এল না। মাথাটা কেমন যেন গরম হ'য়ে উঠেছে।

কৃষ্ণা চারদিকে তাকাল। ভাই-বোনেরা সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। মাগো, বিশুটা কেমন বিশ্রীভাবে শুয়ে থাকে! অমুটা'র নাক ডাকছে। ছায়া'র মুখে মিষ্টি হাসি। কি স্বপ্ন দেখছে হতভাগী? মণ্টু আর খোকা ঘুমুচ্ছে ওঘরে, ওরা দু'জনে মাকে ছেড়ে থাকতে পারে না। বাবা বোধ হয় এখনো জেগে আছেন। মা আর বাবার মৃদু কথাবার্তা চলছে। কি কথা? হয়ত আজকের খরচের কথা, কালকের সম্ভাব্য

খরচের তালিকা। বাড়ীর অন্য ভাড়াটেরা সবাই ঘুমোচ্ছে। কেবল জেগে আছেন গোকুল দা। তানপুরো বাজাতে বাজাতে কি যেন একটা সুর ভাঁজছেন। বোধ হয় সোহিনী। আর জেগে আছে ওপরের ঐ নতুন ভাড়াটে ভদ্রলোক। ভদ্রলোক ছবি আঁকে। তার মায়ের সঙ্গে আলাপ হয়েছে তাদের। চমৎকার মহিলা, মুখে সব সময়েই হাসি। কেমন ছবি আঁকে ভদ্রলোক! একদিন দেখতে হবে। নাঃ, ঘুম আসছে না। কিন্তু কেন?

কেন তা কৃষ্ণার জানা নেই? জানে বৈকি সে। জানে যে আজ তার আবার চার মাস আগেকার একটি দিনের কথা মনে পড়ছে।

কৃষ্ণা উঠল। বাজে চিন্তায় সময় নষ্ট করে লাভ নেই। সকাল সকাল উঠে আবার রান্নার জন্য মাকে সাহায্য করতে হবে।

দেয়ালের ধারে গিয়ে সে সুইচ্ টিপল। ক্লিক্ করে একটা শব্দ হল। মুহূর্তে নরম অন্ধকার এসে ঘরের মধ্যে বাসা বাঁধল। পা টিপে টিপে নিজের জায়গায় পৌছে শুয়ে পড়ল কৃষ্ণা। সারা দেহটা যেন একটি নিঃশব্দ মর্ম্মরধ্বনি তুলল—আঃ। কয়েক মিনিট কাটল, কিন্তু কি আশ্চর্য্য! ঘুম আসছে না তো! তার পরিবর্ত্তে, দু'চোখের সামনে ঘন অন্ধকারের মধ্যেও যেন চার মাস আগেকার সেই দিনটি ফুটে উঠছে। স্পষ্ট নিজেকে দেখতে পাচ্ছে সে—পরিষ্কার—খুঁটিনাটি প্রত্যেকটি কথা—

কৃষ্ণা দেখছে। চারমাস আগেকার সেই দিনটিতে সে কি করেছিল, কি ঘটেছিল তার জীবনে:

ভোর হল।

আজ ?

নতুন আশা নিয়ে নতুন করে মনে প্রশ্নটা জাগে। জানালা দিয়ে আসা ভোরের আলোর প্রসন্ন ও কোমল রেখার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে কৃষ্ণা স্বপ্ন দেখে। শাড়ীর আঁচলটাকে আঁট করে গায়ে জড়িয়ে নিয়ে সে মনে মনে প্রশ্ন করে—আজ ? দিন কুড়ি হতে চঞ্চল অথচ এখনো জবাবটা এল না! প্রতিদিনই সে আশা করে একটা জবাবের, কিন্তু সকাল থেকে বিকেল পর্য্যন্ত একবারও পিয়ন এসে তার নামের কোন খাম এগিয়ে দেয় না। কৃষ্ণার প্রতি রাতের ঘুম দুশ্চিন্তা আর দুঃস্বপ্নে বারংবার বাধা পায়। আজও ভোর হয়েছে। আর একটা দিন সুরু হল! আজো কি তার আশা ব্যর্থ হবে।

চোখের সামনে একটা মুখ ভেসে উঠল। গৌরবর্ণ একটি পুরুষের মুখ। টানা টানা চোখ, একটু মোটা নাক, প্রশস্ত ললাট, মাথা-ভর্ত্তি কোঁকড়ানো চুল। বিকাশের মুখ। সেই বিকাশ আজ পনেরো দিন ধরে একটা জবাব দিচ্ছে না। কৃষ্ণার একটা চিঠির জবাবে সে আজো এক ছত্র জবাব দেয় নি।

কিন্তু না, ভোর হয়ে গেছে। গলি দিয়ে লোক চলাচল সুরু হয়েছে। বড় রাস্তা দিয়ে নিশ্চয়ই ট্রাম চলছে। জাগ্রত মানুষের গুঞ্জনধ্বনি শোনা যাচ্ছে। অমু, বিশু, ছায়া—তিনজনে এখনো ঘুমোচ্ছে। ঘুমুক। মায়ের শরীর ভালো যাচ্ছে না, তাকেই সব করতে হবে।

কৃষ্ণা বিছানা থেকে নামল। এখন গিয়ে তাকে উনুন ধরাতে হবে, জল ভরতে হবে, চা করতে হবে। অনেক কাজ। কিন্তু অবচেতন মনটা ভয়ে কাঁপছে। আজ—আজ কি বিকাশের চিঠি আসবে ?

ভোলানাথবাবু আর যোগমায়া আগেই উঠেছিলেন। বাকী সবাইকে জাগিয়ে কৃষ্ণা চা দিল।

অমু, মানে অমিয় বলল, "আমাকে আর এক কাপ চা দিতে হবে দিদি"—

"ইস্, সখ তো কম নয় তোর"—

"তোর পায়ে পড়ব কিন্তু"—

"দেখা যাবে"—

মা ডেকে বললেন "আমি আসছি খুকু, একটু বাদে।"

"তুমি জিরোও মা, আমি একাই পারব।"

দিন পনেরো জ্বরে ভুগে উঠেছেন মা, তবু স্বভাব যাবে কোথায়? কাজ না করতে পারলে যেন হাতপা উসখুস করে।

কৃষ্ণা রান্নাঘরে গিয়ে আর এক কাপ চা তৈরী করে অমুকে দিয়ে এল।

অমু বলল, "থ্যাঙ্ক্ ইউ দিদি"—

কৃষ্ণা সহাস্যে গাল দিল ভাইকে, "তুই একটা বাঁদর"—

ছায়া খিল্‌খিল্ করে হেসে উঠল।

একগাল হেসে বিশু সায় দিল, "যা বলেছিস্ দিদি—"

কৃষ্ণা রান্নাঘরে ফিরে গেল। নিজের চা ঢাকা দেওয়া ছিল, তাই তুলে নিয়ে বসে বসে বসে চুমুক দিতে সুরু করল। উনুনে তখন দুধ জ্বাল দিচ্ছে সে। আধসের দুধ। বাসি রুটি আছে দুটো, তাই একটু দুধে ভিজিয়ে মণ্টু ও খোকা খাবে। ডালের হাঁড়ি পরে চড়বে। আজ তাড়াহুড়ো নেই, রথযাত্রার ছুটি। অমু, বিশু, ছায়ার ইস্কুল তো বন্ধই, বাবারও দশটায় যাবার তাড়া নেই, আর গোকুলদার তো অফিসের বালাই নেই। ধীরে সুস্থে রান্না করলেই চলবে। আর কিইবা এমন পদ হবে? ডাল, ভাজা, কালকের রাখা মাছের একটা তরকারী আর ভাত। ব্যাস।

উনুনের আঁচে গরম বোধ হচ্ছে। বাইরেও একটা গুমোট। বাতাস নেই, আকাশটা ঘোলাটে, হয়ত পড়ে ঝড় বৃষ্টি নামবে। রথযাত্রার দিন নাকি এমন হয়। আর হয়ও সত্যি সত্যি। আশ্চর্য্য! কৃষ্ণা তরকারী কুটতে বসল।

সব কথা আর একবার ভাবতে ইচ্ছে হল তার, গোড়া থেকে। বিকাশ কে? কেউ না, তার বাবার এক বন্ধু-পুত্র! কলকাতা থেকে পড়াশোনা করত সে, একই গ্রামের লোক বলে আত্মীয়-তুল্য ও ঘনিষ্ঠ মনে করে সবাই! মাঝে মাঝে সে বেড়াতে আসত এ বাড়ীতে—সে অনেক দিন আগেকার কথা। প্রায় তিন বছর হল। তখন গোকুল ছিল না, সে তো সবে বছরখানেক হল এ বাড়ীতে এসেছে। কৃষ্ণা তখন ম্যাট্রিক ক্লাসে পড়ত। ভোলানাথবাবু তাঁর স্বভাব-অনুযায়ী আড়াল থেকে লক্ষ্য করতেন বিকাশকে। কিন্তু বেশ কিছুদিন কড়া নজর রেখেও তিনি বিকাশের চরিত্রে কোন খুঁত পেলেন না। তখন তিনি বিকাশকে একটু খাটিয়ে নিতে চাইলেন। বিকাশ যেন এরি জন্ম অপেক্ষা করছিল, ভোলানাথবাবুর স্বভাব জানা ছিল বলেই বোধ হয় সে তার চলাফেরা একেবারে নিখুঁত করে তুলেছিল। তাই ভোলানাথ একদিন বিকাশকে কৃষ্ণার পড়া-শোনায় একটু সাহায্য করতে অনুরোধ জানানোর সঙ্গে সঙ্গেই বিকাশ রাজি হয়ে গেল। ছাত্র সে ভালো, কলেজে নাম আছে তার। বাড়ীর অবস্থা খুব ভালো নয় বলে সে সকালবেলা এক ঘণ্টার একটা মাস্টারি করত। সন্ধ্যেবেলা এক ঘণ্টা করে সে কৃষ্ণাকে পড়াতে আরম্ভ করল।

দিন কাটতে লাগল। ক্রমে পড়ানোর সময় বাড়তে লাগল। পড়াতে পড়াতে কৃষ্ণার দিকে মাঝে মাঝে একটা বিচিত্র দৃষ্টি মেলে তাকাতে লাগল বিকাশ। সেই দৃষ্টি দেখে কৃষ্ণার শরীর কেমন যেন

রোমাঞ্চিত হয়ে উঠত। সেই দৃষ্টি সে আর কারো চোখে আগে দেখেনি, তবু যেন তার অর্থ বুঝতে এক মুহূর্ত্তও দেরী হল না তার। পড়াতে পড়াতে বিকাশ যেন সময়ের দুরন্ত গতির কথা ভুলেই গেল। এক ঘণ্টার জায়গায় দু'ঘণ্টা হল, শেষে দু'ঘণ্টাতেও পড়ানো শেষ হয় না, তিন ঘণ্টায় গিয়ে দাঁড়াল তার পড়ানো।

ভোলানাথবাবুর কাছে কেমন যেন একটা খট্‌কা লাগল। ছোক্‌রা বড্ড বেশী যত্ন নিয়ে পড়াচ্ছে! ব্যাপার কি? দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তিনি বিকাশ ও কৃষ্ণাকে লক্ষ্য করতেন। কিন্তু অস্বাভাবিক কোন কিছুই তিনি আবিষ্কার করতে পারলেন না। কৃষ্ণা টের পেত বাবার এই গোয়েন্দাগিরির কথা। তবু কিছু হল না, অদৃশ্য পিতার চোখের শাসনকে সহজেই ফাঁকি দিয়ে মনে মনে একটা অদৃশ্য যোগাযোগ ঘটল। পড়া ও পড়ানোর ভেতর দিয়ে গড়ে উঠল একটা নিবিড় সম্বন্ধ। কোন কিছুই মুখে বলে না তারা, একজন পড়ায় আর একজন শোনে। তবু তার ভেতর দিয়েই যেন দুটো মনের মাঝে একটা অদৃশ্য স্বর্ণ-সেতু গড়ে উঠল।

"খুকী"—

যোগমায়া খোকনকে কোলে নিয়ে এসে একটা পিড়ি টেনে একপাশে বসলেন।

মেয়ের দিকে তাকিয়ে তিনি হাসলেন, "তরকারী সামনে রেখে কি কি ভাবছিস্ মা? ঘুম পাচ্ছিল বুঝি? দে আমি কুটে দেই।"

কৃষ্ণা লজ্জা পেল। ভাবতে ভাবতে কখন যে তার তরকারী কোটা বন্ধ হয়ে গেছে তা সে বুঝতেও পারে নি। তাড়াতাড়ি সে বলল, "না মা, আমিই সেরে ফেলছি।"

"আমায় বুঝি কিছু করতে দিবি না?"

"এখন নয়।"

যোগমায়া সস্নেহ দৃষ্টি মেলে মেয়ের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

ঠিক সেই সময়েই অমু ও বিশুরা এসে মাকে ধরল। এমন কি ঐ পাঁচ বছরের মণ্টুটা পর্য্যন্ত। অমু তাদের নেতা।

"মা"—

"মা গো"—

যোগমায়া তাকালেন। একটা কিছু মতলব আছে ওদের। সন্ত্রস্ত হয়ে তিনি বললেন, "কি? গুণ্ডাদের মত অমন জোট পাকিয়ে এসেছিস্ কেন? কি চাস?"

অমু বলল, "শেয়ালদায় রথের মেলা—আমরা যাব, পয়সা দিতে হবে মা।"

কৃষ্ণা ধমক দিল, "মেলায় যাবি তো এখন কি? সে তো দুপুরে"—

যোগমায়া সায় দিয়ে বললেন, "হ্যাঁ, এখন গিয়ে পড়গে, পরে দেখা যাবে।"

একে একে চলে গেল সবাই।

যোগমায়া দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বললেন, "ওদের সখের দোষ নেই, কিন্তু দেব কোথেকে? গোণাগুন্‌তি কয়েকটা টাকা আছে, তাতে হাত দিলে তো চলবে না। মাস গেলে মাত্র দেড়শ'টি টাকা আসে—তাতে সংসারই চলে না, তার আবার সখ"—

কৃষ্ণা চুপ করে রইল। এ সব কথা শুনলেই তার মনটা ভারী দমে যায়। ভারী দুঃখ হয়। সংসারের অবস্থা সে জ্ঞান হতেই দেখে আসছে। তার ছোট বেলায় এমন খারাপ অবস্থা ছিল না। চার পাঁচ বছর ধরে যা অবস্থা হয়েছে তা আর বলবার নয়। কেন হবে না? চাল, ডাল, তেল, নুন, কাপড়—কোন্ জিনিষটার দাম স্বাভাবিক?

তবু সে বলল, "তার জন্য অত ভাববার কিছু নেই মা—আমার কাছে দু'তিনটে টাকা আছে তার থেকে কয়েক আনা দেব'খন।"

যোগমায়া বিষণ্ণ হাসি হাসলেন, "তুই কেন দিবি মা? বিয়ে থা হোক তোর, আপনার সংসার হোক তখন দিবি বৈকি"—

"ওসব বাজে কথা থাক মা।"

যোগমায়া চুপ করলেন। মেয়ের জ্বালাটুকু তিনি টের পেলেন। জ্বালা হবে না কেন? কুড়ি বছর পেরোতে চলল মেয়ে, ম্যাট্রিক পাশ করেছে, অথচ এখনো পর্য্যন্ত একটা পাত্র জুটল না। চেষ্টা চরিত্তির হয়, কিন্তু সবই ভেস্তে যায়। কেউ টাকার জন্য ফিরে যায়, কেউ দেখে পছন্দ না হওয়ায় চলে যায়। টাকার সমস্যা যে দূর হবে না তা জানা কথা। মৃত্যুর মত সুনিশ্চিত। কিন্তু তার মেয়ের চেহারা এমন কি খারাপ? শ্যামাঙ্গী মেয়ে তাঁর, স্বাস্থ্যবতী, লক্ষ্মীর মত শান্ত, বুদ্ধিমতী। তবে!

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে যোগমায়া সেখান থেকে উঠে গেলেন।

কৃষ্ণা চুপ করে বসে রইল। মায়ের দুঃখু ও বাবার বদমেজাজের কারণ সে খুব বুঝতে পারে। তার চিন্তায় তাঁদের অভাবের জীবন বিষিয়ে উঠেছে। তার বিয়ের চিন্তায়। গত বছর দু' জায়গা থেকে লোক এসেছিল। এবছরও তিন জায়গা থেকে এসেছিল। কারুর পছন্দ হয়নি, কারুর বা দরে পোষায়নি। বিয়ের ব্ল্যাকমার্কেটটা এখনও পুরোদমে চলছে। তাছাড়া দেশের যে চরম অবস্থা হয়েছে তাতে তার বিয়ের পাত্র পাওয়া অসম্ভব ব্যাপার। তাছাড়া সে অন্য কাউকে বিয়ে করতে রাজী হয়ই বা কি করে?

কৃষ্ণার মনে পড়ল। ম্যাট্রিক পাশ করার পর একদিন সে নিজের ঘরে বিকাশকে প্রণাম করল। ঘরে তখন কেউ ছিল না। শুধু সে আর

বিকাশ। বাবা তখনো আপিস থেকে ফেরেননি। সন্ধ্যেবেলা। ঝুঁকে আশীর্ব্বাদের ছলে তার কাঁধে হাত রেখে হঠাৎ তাকে টেনে তুলেছিল বিকাশ, তীব্র একটা অন্তর্ভেদী দৃষ্টি মেলে বলেছিল, "পাশ তো করলে, এবার ?"—

সে প্রশ্ন করেছিল, "এবার কি ?"

প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গেই কেঁপে উঠেছিল কৃষ্ণা। তার দু'কাঁধে বিকাশের দুটো হাত। অপ্রত্যাশিত আনন্দে সে একটু কেঁপে উঠেছিল।

বলেছিল, "পুরস্কার চাই।"

"কি ?"

তাকে বুকের ভেতর টেনে নিয়ে, আচম্‌কা তার দুটো ঠোঁটকে পুড়িয়ে দিয়ে বিকাশ বলেছিল, "তুমি—তোমাকে"—

আকস্মিক প্রেম-নিবেদন। ভালো লাগলেও ভয় পেয়েছিল কৃষ্ণা, দু'হাতে সবলে বিকাশকে ঠেলে দিয়ে সে বলেছিল, "মাথা ঠাণ্ডা কর বিকাশদা, আমি ত আছিই।"

মাঝে মাঝে সবার দৃষ্টি এড়িয়ে বিকাশ এসে এমনি ভাবে কৃষ্ণাকে বুকে টানবার চেষ্টা করেছিল আরও কয়েকবার, মাতালের মত জড়িতকণ্ঠে জানিয়েছিল তার ভালবাসার কথা। কৃষ্ণা দুর্ব্বলভাবে আত্মরক্ষাও করত, আবার বিকাশের স্পর্শ ও গদগদ কথাগুলোতেও রোমাঞ্চিত হয়ে উঠত।

তারপর এক পালা শুরু হল। বিকাশকে না দেখলে কেমন যেন লাগে। ঠিক যন্ত্রণা নয়, তবু একটা অভাব বোধ হত। একজন তাকে ভালবাসে এইটে ভাবতে ভারী ভালো লাগত, যে ভালবাসে তাকে আবার তারও ভালবাসতে ইচ্ছে করত। বিচিত্র এক অবস্থা।

এরই মধ্যে পড়া শেষ হলো বিকাশের। লেখাপড়ায় সে মেধাবী

কৃষ্ণা। ছাই দেখতে সে। অনেক পড়াশুনা করার ফল, বেশী পড়ে পড়ে মাথার ছিট হয়েছে বিকাশের, তাই সে ওধরণের আবোল তাবোল কথা বলে। শুধু কথার মানুষই বিকাশ, কাজের নয়। তা নইলে সে চিঠির জবাব দিচ্ছে না কেন? এদিকে কৃষ্ণার অবস্থা তো কাহিল হয়ে এসেছে। আজ চিঠি আসবে তো?

চুল আঁচড়ে সে মাকে ডেকে নিয়ে খেতে বসল। কিন্তু খেতে কি আর ভাল লাগে? প্রতিটি দলা যেন পাথরের মত আটকে যায় গলার মধ্যে, নামতে চায়না। সকাল কেটে গেল, দুপুর হল, বেলা এখন দেড়টা আন্দাজ হবে, তবু তো বিকাশের চিঠি এল না! তাহলে? আজও কি তার কপালে নিরাশার দুঃখটাই লেখা আছে? পনেরো দিনের নৈঃশব্দ কি শেষে ষোল দিনের পর্য্যায়ে যাবে? ভালো লাগে না, কিছু ভালো লাগে না। শরীরটা কেমন যেন দুর্ব্বল বোধ হয়, হাতপা অবশ হয়ে আসে, মাথাটা ঘুরতে থাকে। ভালো লাগেনা, কিছুই ভালো লাগেনা।

"ওকি! খেতে খেতে থামলি কেন রে?"

"থামিনি মা, এই খাচ্ছি"—

"শরীরটা ভালো লাগছে না বুঝি?

"কে বল্লে? আমি ত বেশ—আছি।"

"বেশ না ছাই। একা একা খেটেই তুই গেলি আর আমারও অসুখ হয়েছে তোদের কাবু করার জন্য, কিন্তু কাল থেকে আমি আর শুনছি না মা, আমি—"

"আচ্ছা গো বাবু, আচ্ছা। এখন মাথা ঠাণ্ডা করে চাট্টি খাও দেখি।"

যোগমায়া মুখ ভার করে খেতে আরম্ভ করলেন। বোঝেন তিনি সব, তিনি বেশ বোঝেন যে মেয়ে তার বাপমায়ের দুশ্চিন্তার কথা ভেবেই

শুকিয়ে যাচ্ছে। কি যে করবেন তা তিনি ভেবে পান না, কোন উপায়ই তিনি স্থির করতে পারেন না। যাক গে যা হবার হবে। স্রোতের মুখে না হয় খড়কুটোর মতই ভেসে যাবে তারা। উপায় নেই।

খাওয়া দাওয়ার পর বিছানায় বসেও ভাবছিল কৃষ্ণা। দুপুর শেষ হতে চলেছে। এখনো তো এল না চিঠি? বাইরে জনসমাকীর্ণ রাজপথে নানা শব্দের সংঘাত, যানবাহনের ভীড়। আকাশটা আগের মতই ঘোলাটে, গুমোট বেড়েছে, অমু, বিশুরা সবাই গলিতে খেলছে, মণ্টু, খোকন বোধ হয় মায়ের কাছে। পাশের বাড়ীটার কার্নিসে বসে পায়রা ডাকছে। কোথায় যেন একটা বাড়ীতে রেডিও বাজছে। বেশ লাগে। শুধু একটা চিঠির অভাবে সব কিছু চমৎকার হয়ে উঠছে না।

একটা চিঠি। কৃষ্ণা জানে তাতে কি থাকবে। কি আর থাকবে? ঠিকানা লিখে লিখবে যে তার এ বিষয়ে কোনো দ্বিমত নেই, সে নিজেও আর অপেক্ষা করতে পারছে না। নানা ঝামেলায় এতদিন সব গুছিয়ে উঠতে পারেনি বলেই সে এতদিন এবিষয়ে কিছু লেখেনি। কিন্তু এখন সে প্রস্তুত। আর কোন বাধা নেই। বিদেশে একা একা সে আর দিন কাটাতে পারছে না। রাতের বেলা ঘুম হয় না তার, বিরহানলে সে পুড়ে যাচ্ছে, শুকিয়ে যাচ্ছে, তৃষ্ণায় বিদীর্ণ হচ্ছে তার হৃদয়। শীগ্‌গীরই, আগামী শ্রাবণ মাসের মধ্যেই সে কৃষ্ণাকে পাশে পেতে চায়। কৃষ্ণার নির্দ্দেশ অনুযায়ী সে ভোলানাথবাবুকে চিঠি দিচ্ছে।

তারপর? ভাবতে পুলকানুভূতিতে কেঁপে ওঠে সারা দেহ। দিল্লী। রাজধানী শহর। কত রাজবংশের স্মৃতিমুখর পরিবেশ। ছোট্ট একটি বাসা। সংসার। সে আর বিকাশ। আশ্চর্য্য সুন্দর

দিন ও রাত। স্বপ্ন। ভরা নদীর দুর্ব্বার স্রোতের মত তাদের ভালবাসা। বাধা, বিপত্তি, অভাব, দুঃখকে দূরে ঠেলে সরিয়ে দেবে তারা, এগিয়ে চলবে। তারপর—

"দিদি, একটা চিঠি"—

ছায়া ভেতরে এল।

বুকের স্পন্দনটা অতি মাত্রায় বৃদ্ধি পেল, উত্তেজিত রক্তস্রোতের শব্দটা ভেসে এল তার কানের মধ্যে।

"কৈ? দেখি, দেখি"—

প্রায় ছুটে গেল কৃষ্ণা। কিন্তু একটু এগিয়েই থামল সে। না, চিঠিটা তার নয়। রঙিন থাম—অন্য কিছু হবে।

ছায়া চিঠিটা দিয়ে বেরিয়ে যেতে যেতে বলল, "বাবার নামে এয়েচে"—

তাই বটে। রঙীন থামে ভরা একটা ছাপা চিঠি। ওপরে 'শুভ-বিবাহ' লেখা।

কৃষ্ণা চিঠিটা পড়ল। এক নিঃশ্বাসে পড়ল সে। পড়ে সে কেঁপে উঠল। শিউরে উঠল, আবার পড়ল। না, চোখের ভুল নয়। লাল কালিতে পরিষ্কার ছাপা হরফে লেখা আছে কথাগুলো, আগুনের মত ভাস্বর হয়ে ফুটে উঠেছে। বিকাশের বাবা বিমলবাবুর নামযুক্ত ছাপা চিঠি। আগামী শ্রাবণ মাসের সাত তারিখে, দিল্লী-প্রবাসী ব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যা লীলার সঙ্গে শ্রীমান্ বিকাশের শুভ-বিবাহ অনুষ্ঠিত হবে এবং তদুপলক্ষ্যে ভোলানাথ বাবুর উপস্থিতি একান্তভাবে প্রার্থনীয়।

চোখের সামনে সব কিছু দুলে উঠল, আবছা হয়ে এল, অন্ধকারে মিলিয়ে যেতে চাইল। ধীরে ধীরে, আহত একটা জন্তুর মত কৃষ্ণা

বিছানায় ফিরে গেল, তার ওপর লুটিয়ে পড়ল। সব মিথ্যে, মিথ্যে। সব ভাণ। মুখোসপরা-প্রেমিক। দিল্লীতে গিয়ে আর একটিকে বশ করেছে। লীলা। নিশ্চয়ই মেয়েটি শিক্ষিতা, সুন্দরী, ধনীর দুলালী। তাই চিঠি কম আসত! তাই আর এবার চিঠির জবাব এল না। এখানে, ওখানে, সর্ব্বত্রই বোধ হয় সে একটি নায়িকা ঠিক করে রেখেছিল। সেকালের কুলিন বামুনদের মত। তবে তারা বিয়ে করত। এখানে সে সব বালাই নেই। কিছু মিষ্টি মিষ্টি কথা, হাত ধরা, বুকে চেপে চুমু খাওয়া এবং সুযোগ পেলে চরম কিছু আদায় করা—এই তার মৎলব ছিল। ফূর্ত্তি করা। কিন্তু যাক্, চুকে গেল, শেষ হয়ে গেল। হাওয়ার কেল্লাটা ভেঙ্গে পড়ল, হাওয়ায় মিলিয়ে গেল। আর তার বুকের ভেতর কোথায় যেন একটা পাৎলা তার ছিঁড়ে গেল।

তারপর কি করে যে সময় কাটতে লাগল। সময়মতই উঠে গেল কৃষ্ণা। বিকেলের জল ভরল, উনুন ধরাল, রান্নাও চাপাল। অমু বিশুরা সবাই শেয়ালদার মেলা থেকে ফিরে এসে ভেতরের ঘরে কলরব সুরু করল। সে সব দিকে লক্ষ্য করল না কৃষ্ণা। একটা স্প্রিংয়ের পুতুলের মতই কাজ করে চলল সে। তার কানের মধ্যে একটা বিচিত্র ভোঁ ভোঁ শব্দ হতে লাগল, ললাটের দু'পাশের শিরাগুলো দপ্ দপ্ করে লাফাতে লাগল, চোখ দুটোতে জ্বালা সুরু হল, ঘৃণায় অন্তর পুড়তে লাগল। মিথ্যে, সব মিথ্যে।

ক্রমে সন্ধ্যা হল। অন্ধকার হয়ে এল। টিপ টিপ বৃষ্টি পড়তে লাগল, দম্‌কা জোলো হাওয়া এসে একটা উন্মাদের মত দরজা, জানালাগুলোতে আঘাত করতে লাগল। কিন্তু কোনদিকেই খেয়াল করল না কৃষ্ণা, উনুনের দিকে স্থিরদৃষ্টি মেলে সে পাথরের মতই দাঁড়িয়ে রইল। বাড়ীর অন্যান্য ঘরে তখন আলো জ্বলছে, শুধু রান্নাঘরটাই অন্ধকার। মনেও অন্ধকার।

সব শেষ। বিকাশের আশা নির্মূল হল। মিথ্যে, সব মিথ্যে। লোভীর পৃথিবী, স্বার্থপরের পৃথিবী, লালসাতুর জন্তুর পৃথিবী। অরণ্যের মত দুর্গম। এখানে আদায় করে নিতে হয়, চোখ রাঙ্গিয়ে বড় হতে হয়, ভয় দেখিয়ে লাভ করতে হয়, চুরি ডাকাতি করে সুখী হতে হয়। অন্ধকার। মনের ভেতরেও অন্ধকার। যেন অমাবস্যা। জীবনটাও কি তাই হবে? না, না, তা হবে না? তা হলে চলবে কেন? সে হারবে কেন, হার মানবে কেন?

হঠাৎ সে উঠে দাঁড়াল, অন্ধকারে হাৎড়ে হাৎড়ে দেওয়ালে গিয়ে সুইচ্ টিপল। মুহূর্তে আলোয় আলোয় ঝলমল করে উঠল রান্না ঘরটা।

বিছানায় পাশ ফিরে কৃষ্ণা হাসল। জীবন-দেবতা নিষ্ঠুর নন, তিনি আবার সুযোগ দেবেন। ভালই হয়েছে, তার শিক্ষা হয়েছে। পুরুষ জাতকে সে চিনতে পেরেছে। তারা মুখে মধু নিয়ে নির্দ্দোষ সেজে ঘুরে বেড়ায়। আসলে তারা প্রত্যেকেই গুহাবাসী। যেখানে ভালবাসা যায় সেখানে তো তারা ভালবাসার কথা বলেই, আবার যেখানে ভালবাসা যায় না সেখানেও তারা ভালবাসার কথা বলে, কারণ লোকসান তো নেই। ভালবাসার কথা বললেই মেয়েরা গলে যায় দেখে পুরুষেরা অনেক সময় দুটো কথা বলেই অতর্কিতে দেহটাকে অধিকার করে। কিছু না। জীবন তাকে প্রথম মূল্যবান শিক্ষা দিয়েছে। ভালবাসার মত মানুষ পেলেই অন্ধ হতে নেই, আবেগের আতিশয্যে অসুস্থ হতে নেই, সব কিছুই রঙীন করতে নেই!

কৃষ্ণা অন্ধকারে হাসল। আজ সে বুঝতে পারছে যে বিকাশকে তার ভালো লাগলেও তাকে সে ভালোবাসে নি। বিকাশই তার কুমারীজীবনের প্রথম পুরুষ। সেটা এমন কিছু গুরুতর নয়। আজ

সে বুঝতে পারছে যে, সে বুদ্ধি দিয়ে, হৃদয় দিয়ে বিচার করেনি, সেদিন বাস্তব দৃষ্টি মেলে সে বিকাশের অন্তরকে দেখেনি। প্রথম পুরুষের চিন্তা তাকে দেহের স্থূল অনুভূতির ওপরে, দেহাতীতের সূক্ষ্ম জ্যোতির্লোকে নিয়ে যেতে পারে নি। বসন্তকালের পুষ্পবৃক্ষের মত সে তখন তার অজস্র পুষ্প-সমারোহে গর্ব্বিত, অন্ধ, উত্তেজিত। কিন্তু আজ? কৃষ্ণা হাসল। অন্ধকার। গলিতে 'দু' একটা মাতাল চেঁচাচ্ছে। বাইরের ঘরে গোকুলদা' গান গাইছে। ঠিক, সোহিনী। ওপরে যেন আলো জ্বলছে! সেই লোকটা কি ছবি আঁকছে? একদিন দেখতে হবে। লোকটাকে দেখে ক্ষ্যাপাটে মনে হয়। ঘুম আসছে। উঠোনে বুঝি ইঁদুর চলাচল করছে। গোকুলদা'র গলাটা ভয়ঙ্কর ভারী। রাত হয়েছে, সহর নিঃঝুম হয়ে আসছে। গানটা বেশ লাগে। আবার কাল—সে তলিয়ে যাচ্ছে। কালো কুয়াসার ভেতরে। কিন্তু একদিন একজন আসবে—চমৎকার দেখতে, রাজপুত্রের মত। কৃষ্ণার কাছে এসে সে একদিন হাঁটু গেড়ে বসবে, কবিতার মত সুন্দর ভাষায় তাকে জানাবে—সে তাকে ভালবাসে—অন্ধকার—

কৃষ্ণা ঘুমোল। ঘরের ভেতর অন্ধকার, কৃষ্ণাকে সে অন্ধকারে দেখা যাবে না। তা সম্ভব হলে দেখা যেত যে কৃষ্ণার দুটো পাৎলা পাৎলা ঠোঁটের ওপর সোনার গুঁড়োর মত একটা হাসির আভাস। বোধ হয় স্বপ্ন দেখছে সে—দেখছে যে জীবনদেবতা তাকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন, বলছেন, ভয় নেই সোনার মেয়ে। জীবনে অমন ভুল হয়, প্রথম যৌবনে অনেককেই মনের মানুষ বলে ভুল হয়। তাতে কোন ক্ষতি হবে না। নির্ভয়ে থাকো, তোমার পুরুষকে একদিন ঠিক তোমার কাছে এনে দেব, ঠিক চিনতে পারবে—সে দিন তোমার রক্তের নদী ফুলে ফেঁপে সমুদ্র হবে, সেদিন তোমার পায়ের নীচেকার পৃথিবী পুলকে দুলে উঠবে—

তিন

সুব্রতের নতুন বাসা দেখে আসার পর বেশ কিছুদিন কাটল। প্রায় দু'মাস। এই দু'মাসে আমি কয়েকবার গিয়েছিলাম তার ওখানে, সেও এসেছিল আমার কাছে বার কয়েক। তার বেশ-ভূষার দৈন্য দেখে মাঝে মাঝে সন্দেহ হত যে সে ভালো নেই। কিন্তু সে বিষয়ে কোন প্রশ্ন করলেই সে তার বিচিত্র ও ছেলেমানুষী হাসি হেসে বলত, 'কিছু না, কিছু না। চলে যাচ্ছে, চলে যাবেও।' বিশ্বাস করতাম না। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নানা রকমের প্রশ্ন করে করে যা জানতে পেরেছিলাম তা থেকে খানিকটা এবং বাকীটা অনুমান করে যা দাঁড়িয়েছিল তা বিশেষ সুবিধের নয়। দিন কাটছিল বটে, কিন্তু কাটছিল কঠিন সংগ্রামের ভেতর দিয়ে।

সংগ্রাম। শিল্পীর জীবনের মানসিক সংগ্রাম নয়, কঠোর ও বাস্তব জীবন-সংগ্রাম। জাগ্রতাবস্থায় প্রতিটি মুহূর্ত্তই সুব্রত লড়াই করতে লাগল। ছবি আঁকার সময় কল্পলোকের শূন্যতা থেকে রং ও রেখা আহরণ করার জন্য, আবার সেই ছবি নিয়ে বাস্তব জগতের বাজার থেকে অর্থ ও খাদ্য সংগ্রহের জন্য। দু'রকমের সংগ্রাম। অদৃশ্য এক শত্রুর সঙ্গে সে দাঁতে দাঁত চেপে কঠিন লড়াই সুরু করল। সে হারবে না।

দিনরাত খাটতে লাগল সুব্রত। অয়েল, ওয়াটার, স্কেচ, কোনটাই বাদ দিল না সে। মাথার মধ্যে যত ছবি জমা ছিল সব সে একের পর এক এক উজাড় করতে লাগল। সকালে ছবি আঁকে সে, দুপুরে আঁকে, রাত্রে আঁকে। বিকেল থেকে সন্ধ্যা আটটা নয়টা পর্য্যন্ত বাইরে বাইরে

ঘোরে টাকার ধান্ধায়। পত্রিকা, পাবলিসিটি ও খবরের কাগজের অফিস এবং পুস্তক-প্রকাশকদের দোকানে যাতায়াত আরম্ভ করল সে। কিন্তু শক্তিমান্ শিল্পী হলে বিপদে পড়তে হয়। প্রথম দিকে তার কপালে স্বীকৃতি জোটে না! তা ছাড়া প্রতিযোগিতার পৃথিবীতে কতকগুলো বিশেষ ধরণের চাতুরী জানা চাই। সুব্রত সে বিষয়ে কাঁচা, নীরেট-মস্তিষ্ক। ফলে ঘুরেও ফল হল না প্রথমটায়। এদিকে হাতে যা ছিল তা ফুরিয়ে এল, অবশিষ্ট রইল শুধু মায়ের কিছু গয়নাপত্তর। মা বললেন গয়না বিক্রী করতে। সুব্রত মাথা নাড়ল। অসম্ভব, মরে গেলেও সে ওসব পাপ কাজে যাবে না। কিন্তু উপায় কি হবে? চলবে কি করে?

ইতিমধ্যে ইলা আর শীলা একদিন বাড়ীতে এল।

"দাদা, তোমাকে ফিরে যেতে হবে।" তারা বলল।

"কোথায়?" সুব্রত না বোঝার ভাণ করল।

"বাড়ীতে। মাও বলে পাঠিয়েছেন।"

সুব্রত মাথা নাড়ল, "অসম্ভব ভাই, আমি নোঙ্গর তুলে জাহাজ ছেড়েছি। ঝড় এসেছে, দিক নির্ণয়ও করতে পারছি না—বয়ে গেছে, থামতে হয় তো নতুন কোন বন্দরেই থামব, পুরোণো বন্দরে আর না।"

"আমরা বলছি—আমাদের—"

"তোরা কি? বিয়ে হলে মেয়েদের কি বাপের সংসারে কোন কর্তৃত্ব থাকে?"

শীলা বলল, "খবরদার দাদা, আমার পায়ে শেকল পড়েনি এখনো—"

সুব্রত হাসল, "পড়ে নি, পড়বে। শিকল ছাড়া হয়ে থাকতে মেয়েদের বেশী দিন ভালো লাগে না।"

"তা হলে তুমি ফিরবে না?"

"না।"

"এই শেষ কথা ?"

"হ্যাঁ।"

"আর জ্যাঠাইমা ?"

"তাকে জিজ্ঞেস করে দেখ্!"

সুব্রতের মা এসে কাছে দাঁড়ালেন, ধীরকণ্ঠে বললেন, "আমার যদি আলাদা কিছু বলার থাকতো তা হলে আমি তা বলতাম। সুব্রত যা বলেছে তার পরে আমার আর কিছু বলবার নেই-গো মায়েরা।"

ইলা ও শীলা নিঃশব্দে বসে রইল, কাঁদল।

সুব্রত রেগে উঠল, "তোরা রাক্ষুসী, কাঁদিস কেন? যে কোন উপায়ে সুখ-সুবিধে খোঁজে জানোয়ারেরা আর যারা মানুষ তারা আইডিয়া বাঁচিয়ে সুখ-সুবিধে চায়। আমি মানুষ হই—এটা বুঝি তোরা চাস না ?"

ব্যর্থকাম হয়ে ফিরে গেল দু'বোন।

তার কয়েকদিন পরের কথা। দিনটা ছিল রবিবার।

শ্যামবাজারে গিয়েছিলাম একজন লেখক বন্ধুর কাছে তাগিদ দিতে। ফিরছিলাম ট্রামে। হেদোর কাছে পৌঁছে হঠাৎ দু'চোখ রগড়ে তাকালাম। যা দেখলাম তা প্রথমে বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হল না। পার্কের এক কোণে রেলিংয়ের গায়ে দড়ি-ঝুলিয়ে, ক্লিপ দিয়ে অনেকগুলো স্কেচ্ আর ওয়াটার-কলার টাঙানো রয়েছে। অধিকাংশই প্রাকৃতিক দৃশ্য। আর সেগুলোকে যে বিক্রী করছে সে আর কেউ না, সুব্রত! তাকে ঘিরে চার পাঁচ জন লোক দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কতকগুলো ছবিও দেখ্ছে।

ট্রামটা ছেড়ে দিয়েছিল, কিন্তু তর সইল না, অল্পবয়সী ছোকরাদের মতই লাফিয়ে নামলাম, তারপর প্রায় ছুটে গিয়ে দাঁড়ালাম সুব্রতের সামনে।

সুব্রত আমাকে দেখতে পেল, একটুও বিচলিত না হয়ে সহাস্যে বলল, "আট আনা করে এক একটা বিক্রী করছি—চাই নাকি একটা ?"

মুখে কথা জোগাল না কিছুক্ষণ, তাকিয়ে তাকিয়ে শুধু দেখলাম। একজন লোক দুটো ছবি তুলে নিয়ে একটা টাকা দিয়ে চলেও গেল। সুব্রত আমার দিকে তাকিয়ে আবার হাসল।

"দেখলে ?"

উত্তেজিত হয়ে বললাম, "দেখলাম, কিন্তু এ সব কি করছ তুমি ? এই স্কেচ্‌গুলোর প্রত্যেকটির কম করে কুড়ি-পঁচিশ টাকা দাম হওয়া উচিত"—

"তা উচিত, কিন্তু ফুটপাথে নামলেই ছবির গোত্রান্তর হয়।"

"তবু"—

"আর ক্রেতারা যদি শিল্পী হত তাহলে হয়ত ঠিক দাম পাওয়া যেত।"

একটু থেমে প্রশ্ন করলাম, "অবস্থা খুবই খারাপ হয়েছে নাকি ?"

"খারাপ !" সুব্রত ঠোঁট উলটোল, "তা তো জানি না। তবে এটা জানি যে হাতে টাকা নেই এবং উপযুক্ত দামে আমার ছবি এখন বিকোবে না। সুতরাং যাতে বিক্রী হয় তারই ব্যবস্থা করেছি। তা মন্দ হয়নি, সাতটাকা এসে গেছে। আর চিন্তা নেই, এখন থেকে টাকার দরকার হলেই রাস্তায় এসে দাঁড়াব। আর কিছু ন্যাংটো ছবি আঁকলে তো কথাই নেই, হু হু করে কেটে যাবে"—

বাধা দিয়ে বললাম, "বাজে কথা বন্ধ কর, কাল আমার সঙ্গে এক জায়গায় যেতে হবে তোমাকে।"

"কোথায় ?"

"একটা পাবলিসিটি অফিসে, কিছু কাজ পাবে।"

"ভেবে দেখব।"

"প্রকাশকদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব।"

"কিন্তু ওসব করলে কি সুব্রত মুখুজ্জ্যের অপমৃত্যু ঘটবে না ?"

"লোভী হলে মরবে। যতটা না হলে নয় ততটাই না হয় করবে তুমি—তা ছাড়া উপায় কি বলো ? না খেয়ে সাধনা করলে তোমার দেহ যে সিদ্ধির পথে বাধা দেবে এমন নজীর কি তোমার জানা নেই ?"

"বুঝলাম, অগত্যা তাই। জন্তু জানোয়ারের পৃথিবীতে থাকতে গেলে তাদের নিয়মটাই মানতে হবে বটে"—

হঠাৎ থেমে গেল সুব্রত, বলল, "সেরেছে"—

বুঝতে না পেরে তার দিকে তাকালাম, "মানে ? কি হয়েছে ?"

একটু ঘুরে দাঁড়াল সুব্রত, ইঙ্গিতে রাস্তার দিকে দেখিয়ে বলল, "তাকিয়ে দেখ"—

রাস্তার দিকে তাকালাম। কি দেখব ? কাকে ? এক গাদা লোক চলাচল করছে, তাদের মধ্যে কার কথা বলছে সুব্রত ? ভালো করে তাকাতেই অবশ্য বুঝতে পারলাম।

রাস্তার ধার ঘেঁষে চলেছেন ভোলানাথবাবু, সঙ্গে কৃষ্ণা, অমু, বিশু ও ছায়া। বোধ হয় তারা এদিকেই কোথাও বেড়াতে এসেছিল, এখন ফিরে যাচ্ছে। সবাই অন্যমনস্কভাবে এটা-ওটা দেখতে দেখতে চলেছে বটে কিন্তু কৃষ্ণার দৃষ্টিটা রয়েছে সুব্রতের ওপর। পরিষ্কার বোঝা গেল যে সে সুব্রতকে চিনতে পেরেছে, চিনে অবাক হয়ে গেছে। সে যে

চিনতে পেরেছে তা আরো বোঝা গেল তার এগিয়ে গিয়েও ফিরে চাওয়া থেকে।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই তারা অনেকটা দূরে চলে গেল।

সুব্রত মুখ না ঘুরিয়ে বলল, "আপদ দূরে গেছে?"

"গেছে।"

"বাপ, বাঁচলাম। উঁহু, বাঁচলাম কোথায়? দুর্ঘটনা ঠিকই ঘটে গেছে, মেয়েটা তো দেখেই ফেলেছে।"

"দেখেছে তো কি হয়েছে?"

"তেমন কিছু হয়নি, তবে মধ্যবিত্তের মন কিনা, কু-সংস্কার কেটেও কাটে না।"

আমি বে-কায়দায় ফেললাম সুব্রতকে, সহাস্যে বললাম, "সেই জন্যেই তো বলছিলাম যে, তোমার দ্বারা ফুটপাতে দাঁড়িয়ে চানাচুর-ভাজার মত ছবি বিক্রী চলবে না।"

সে মাথা নাড়ল, "যাই বল না কেন, এই দেখাতে আমার ক্ষতি হবে।"

"কেন?"

"যেমন বাপ তার তেমনি মেয়ে হবে তো। তুমি কি মনে কর যে ঐ মেয়েটা আমার এই কথাকে সালঙ্কারে বর্ণনা করবে না সারা বাড়ীটার মধ্যে?"

"সাধারণ ঘটনার ব্যতিক্রমও তো ঘটতে পারে এক্ষেত্রে?"

"ব্যতিক্রম। ঐ মেয়েটি হবে ব্যতিক্রম?"

"হলেই বা আশ্চর্য্যের কি আছে?"

প্রতিটি কথার ওপর বিশেষ জোর দিয়ে সুব্রত বলল, "হতে পারে না। মেয়েদের ব্যাপারে কোন ব্যতিক্রম নেই।"

"শিপ্রার ওপর চটেছ বলে সবাইকে খারাপ ভাববে? তোমার মতে কি মেয়েরা সবাই সমান।"

"হ্যাঁ।"

সশব্দে হাসতে গিয়ে থেমে গেলাম। থাক্, আশেপাশের লোকেরা হয়ত কিছু ভেবে বসবে। পাগল কিংবা মাতাল।

একটু গম্ভীর হয়েই আবার বললাম, "আচ্ছা দেখা যাবে, একদিন না একদিন কাউকে তো ভালোবাসবেই—তখন না হয় দেখব যে তোমার এই মত বদলায় কি না।"

"আমার মত বদলাবে না সম্পাদক—কারণ আমি আর প্রেমে পড়বই না।"

"তা কি হয়? ইচ্ছে করলেই যেমন প্রেমে পড়েনা মানুষ তেমনি অনেক সময় ইচ্ছে না করলেও হয়ত প্রেমে পড়ে মানুষ।"

"তর্ক করোনা। আমি জানি যে আমি প্রেমে পড়বো না। কেন জানো?"

"কেন?"

"মেয়েরা নিজেদের ছাড়া কাউকে ভালবাসে না।"

হেসে চুপ করে রইলাম। মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে যখন শ্রেণীগত আভিজাত্য হারিয়ে ফুটপাথে এসে দাঁড়ায়, একজন উঁচুদরের শিল্পী যখন তার ভালো ভালো স্কেচ্‌গুলোকে আট আনা দরে জাপানী মালের মত বিক্রী করে তখন তার মনের মধ্যে যে কিরকম রক্তাক্ত বিপ্লবের আগুন জ্বলে তা আমার জানা ছিল বলেই আমি চুপ করে রইলাম। তাছাড়া তর্কে তো সব কিছুর নিষ্পত্তি হয় না। আজ সুব্রত যাই বলুক না কেন, সব কথাই ওখানে শেষ হয়নি। জীবন একটা বিচিত্র ও সুদীর্ঘ পথ, তার কোন্ বাঁকে কি বিস্ময় প্রতীক্ষা করছে কে জানে। মাঝে মাঝে

জীবনে ভূমিকম্প ঘটে, বাজ পড়ে। বহুদিনের সঞ্চিত অভিজ্ঞতা ও জীবন-দর্শন তখন নিমেষে বদলে যায়, মিথ্যে হয়। আজকের নারী বিদ্বেষী সুব্রত যে কাল একই থাকবে একথা কিছুতেই জোর করে বলা যায় না। অতএব চুপ করে থাকাটাই বুদ্ধিমানের কাজ। তাই রইলাম।

পরদিন সুব্রতকে নিয়ে গিয়ে দুটো পুস্তক-প্রকাশালয় থেকে প্রচ্ছদপট আঁকবার কাজ পাইয়ে দিলাম। তাছাড়া পাবলিসিটি অফিস থেকেও কিছু কিছু কাজ পাবে স্থির হল। মাসে একশ টাকা করে আয় হয়ে যাবে সব মিলিয়ে। তারপরে কিছু টাকা সংগ্রহ করে সুব্রতের ছবিগুলোর একটা প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করলেই তার খানিকটা দুঃখ দূর হবে। স্বীকৃতি পাওয়া তার দরকার, এবং তা পেলেই আস্তে আস্তে তার কাজ বাড়বে।

সন্ধ্যে নাগাদ সুব্রত চলে গেল। আমার কাজ ছিল বলে তার সঙ্গে যাওয়া আর সম্ভবপর হয়ে উঠল না। সে একাই গেল।

কিন্তু সোজা বাড়ী গেল না সে। উদ্দেশ্যহীনের মত সে প্রায় রাত ন'টা পর্য্যন্ত এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াল তারপর একটা ছোট্ট দোকানে বসে তিন চার পেগ সস্তা মদ গিলে বাড়ীর দিকে রওনা হল। তখন রাত এগারোটা বেজে গেছে।

বাড়ী পৌছে এক কাণ্ড হল। সকলের অলক্ষ্যে বসে নিয়তি যেন এক বিচিত্র খেলার অনুষ্ঠান করল।

দরজা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। সাধারণতঃ দশটা সাড়ে দশটা পর্য্যন্ত বাইরের দরজাটা খোলাই থাকে, তারপরে তা বন্ধ হয়ে গেলেও

এগারোটার পরে এসে কড়া নাড়লেই কেউ না কেউ দরজা খুলে দেয়। কিন্তু আজ তো কেউ খুলল না।

সুব্রত তাকাল। কোন ঘরের ভেতরেই আলো জ্বলছে না। তার মানে নীচের সবাই শুয়ে পড়েছে। এবং আজ একটু আগেই শুয়ে পড়েছে। আর শুধুই শোয়নি, ঘুমিয়েও পড়েছে। আশ্চর্য্য এত তাড়াতাড়ি সবাই ঘুমিয়ে পড়ল!

আরো জোরে কড়া নাড়ল সুব্রত। উঁহু, কেউ সাড়া দিচ্ছে না।

"মা—মা—"

সুব্রত জানে যে বাইরে থেকে হাজার ডাকলেও মায়ের কানে তা পৌঁছোবে না, তবু সে ডাকল।

কিন্তু বেশীক্ষণ তো ডাকা যায় না, তাই থামল সে। নাঃ, নীচের লোকগুলো শক্রতা করছে।

তাহলে? এবার যে কি করবে? কোথায় যাবে? ভাবতে গিয়ে সুব্রতের নেশা যেন ফিকে হয়ে আসবার উপক্রম হল। মনে মনে সে বলল, 'হেল্', যাব আবার কোথায়? ওই দোরগোড়াতেই থাকব। আর তা সম্ভব না হলে বস্তীর ঐ মেয়েদের ওখানেই রাত কাটাব, ওদের দরজা রাতের বেলাতেও বন্ধ হয় না।

কিন্তু হঠাৎ দরজার ওপাশে একটা শব্দ শোনা গেল। কেউ দরজা খুলছে। নেশায় স্তিমিত দু'চোখকে বড় করে, সোজা হয়ে দাঁড়াতে চেষ্টা করল সুব্রত। কে দরজা খুলছে?

ক্ষীণ একটু শব্দ তুলে দরজাটা ধীরে ধীরে খুলে গেল, যে দরজা খুলল সে একপাশে সরে দাঁড়াল। প্যাসেজের বাতিটার আলো দরজা পর্য্যন্ত পৌঁছোতে পৌঁছোতে একটু ফিকে হয়ে এসেছে, তাই একটু ঝুঁকে পড়ে তাকাল সুব্রত।

চিনতে পেরে একটু মৃদু হেসে, অপ্রস্তুতের মত সে বলল, "ওঃ—আপনি, মানে তুমি—কৃষ্ণা!" অনেকক্ষণ পরে কথা বলতে গিয়ে যে তার কথাগুলো জড়িয়ে গেল তা সুব্রত বুঝতে পারল।

কৃষ্ণা কোন জবাব দিল না। শুধু তীক্ষ্ণদৃষ্টি মেলে সে একবার সুব্রতের দিকে তাকাল।

অপরাধীর মত অনুতপ্তকণ্ঠে সুব্রত এবার আরো পরিষ্কারভাবে বলল, "আমার দেরী হয়ে গেছে—তোমায় কষ্ট দেবার জন্য সত্যি ভারী দুঃখিত—"

সুব্রত কৃষ্ণার দিকে তাকিয়ে একটু বোকার মত হাসবার চেষ্টা করল, কিন্তু কৃষ্ণার কোন ভাবান্তর লক্ষ্য না করে সে দোতালায় যাবার জন্য পা বাড়াল।

"শুনুন"—অনুচ্চ অথচ আদেশমূলক একটা ডাক।

সুব্রত ফিরে তাকাল।

"কি বলছ?"

"আপনি কিছু খেয়েছেন নাকি সুব্রত দা'?"

তীক্ষ্ণ ও অচঞ্চল কৃষ্ণার চাহনি, সুব্রত দেখে হাসল, একপা এগিয়ে এসে সে চাপা গলায় বলল, "হ্যাঁ, খেয়েছি—একটু মদ। কিছু মনে কোরোনা।"

বলেই সে দ্রুতপদে চলে গেল।

কৃষ্ণা ক্ষণকাল তার গমনপথের দিকে তাকিয়ে রইল। সুব্রতবাবু লোকটি মদ খায়! ছিঃ! মদ খাওয়া ভাল নয়। অথচ শিল্পীরা নাকি অনেকেই খায়। কেন? ছবি আঁকেন সুব্রতবাবু। কিন্তু তার একটাও ছবি কৃষ্ণা দেখেনি। মাসীমা বলেছেন একদিন ছবি দেখাবেন। দেখতে হবে। লোকটা কেমন যেন ক্ষ্যাপাটে, বাউণ্ডুলে মত। কথা-

বার্তায় কিন্তু খুবই ভদ্র। তাছাড়া মনে জোর আছে সুব্রতবাবুর। রাস্তায় দাঁড়িয়ে ছবি বিক্রি করে সে, তাতে তার লজ্জা নেই। দুঃখ দারিদ্র্যকে হাসিমুখে সহ্য করার ক্ষমতা আছে লোকটার। নাঃ, কিছুই বলা যায় না। পুরুষদের চেনা যায়না সহজে। বিকাশ। ছিঃ মদ খাওয়া উচিত নয়। আর এভাবে মদ খেয়ে, এত রাতে বাড়ী ফেরাটা ভারী খারাপ। লোকে কি ভাববে! যদি আর কেউ দরজা খুলত আজ। যদি একেবারে বে-সামাল অবস্থায় এসে হল্লা করত? যেমন বাইরের ঐ মদের দোকানে বসে মাতালেরা হল্লা করে? ছিঃ।

দরজাটা বন্ধ করে সে ফিরে যাচ্ছিল, হঠাৎ সে থমকে দাঁড়াল। গোকুল এসে হাজির হল সামনে।

"কে এল কৃষ্ণা? ওপরের ভাড়াটে?"

"হ্যাঁ।"

"মানে সুব্রতবাবু?"

"হ্যাঁ।"

"আর তুমি উঠে এসে দরজা খুলে দিলে?"

"হ্যাঁ, তাতে হয়েছে কি?" কৃষ্ণা একটু কঠিন হয়ে উঠল। গোকুলদাকে সে বেশ ভাল করেই চেনে, একটা কিছু কড়া মন্তব্য করার জন্যই সে এত ভনিতা করছে।

গোকুল গম্ভীর হয়ে বলল, "তোমার আসার কি দরকার ছিল কৃষ্ণা? এত রাতে?"

"তোমরা কেউ সাড়া দিলে না বলেই এলাম।"

"কিন্তু কেউ এসে ডাকলেই কি সাড়া দিতে হবে? কত রকমের লোক অমন রাত-বিরেতে এসে ডাকে। চোর, ডাকাত, মাতাল—তোমার গিয়ে ঐ উনি—ঐ সুব্রতবাবু লোকটি খুব সুবিধের নয়, বুঝলে?"

কৃষ্ণা বিরক্ত হয়ে মাথা নাড়ল, "বুঝেছি, এবার আমি শুতে চললাম।"

সে পা বাড়াল।

গোকুল চাপা গলায় বলল, "যাচ্ছ যাও, সে তো ভালো কথা। তবু কথাটা শুনে রাখো, ঐ সুব্রতবাবু লোকটি দেখতেই ভদ্দর লোক, আসলে কিন্তু লোকটি পয়লা নম্বরের ঝানু। শুধু কি তাই, মদটদও খায় লোকটা, মা কালীর দিব্যি করে—"

কৃষ্ণা আর শুনল না। গোকুলের কথা বেশীক্ষণ সে শুনতে পারে না। ভারী পরনিন্দুক লোকটা, বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে সে ছাড়া যে প্রত্যেকটি লোক খারাপ এই কথাটাই সে অহরহ প্রমাণ করতে চায়। অন্য সময়ে তবু তা সহ্য করা যায়, এত রাতে তার ওসব শোনার মত ধৈর্য্য নেই। তা ছাড়া সুব্রতবাবু লোকটি যে পুরোপুরি খারাপ তার কোন প্রমাণ তো এখনো পাওয়া যায় নি। অতএব গোকুলদার অর্থহীন বকবকানি সে এখন শুনবে না।

কৃষ্ণা চলে গেল।

গোকুল খানিকক্ষণ কটমট করে চেয়ে রইল তার দিকে। বড় দেমাকী হয়ে উঠছে কৃষ্ণা। তাকে সে একটুও গ্রাহ্য করে না। আচ্ছা। ভোলানাথবাবুকে বলে সে সব বন্দোবস্ত করে ফেলবে। ব্যাপারটা ভালো মনে হচ্ছে না। কৈ, এত রাতে এসে দরজা খোলার জন্ত তো আর কারো মাথা ব্যথা হল না! তবে? এত দরদ কেন?

গোকুলের কুৎসিত চোখেমুখে একটা হিংস্রতা ঘনিয়ে উঠল। আচ্ছা, দেখা যাবে, গোকুলের শ্যেন দৃষ্টিকে কেউ ফাঁকি দিতে পারবে না। কিছুতেই না।

রাতে অনেকক্ষণ ঘুম এল না কৃষ্ণার। কেন তা আমি অনুমান করতে পেরেছিলাম। সুব্রতের কথা ভেবেই তার ঘুম আসছিল না। সে ভাবছিল। কেন? কেন মদ খান সুব্রতদা? কথাবার্ত্তায় চমৎকার ভদ্রলোক, রীতিমত শিক্ষিত, আদব-কায়দা সাধারণের চেয়ে অনেক বেশী উন্নত—তবু কেন মদ খান তিনি? নেশা? কিন্তু কেন? মানুষ নেশা করে কেন? লোকটির হয়ত কোন দুঃখ আছে মনে। কিংবা হয়ত কিছুই নেই। স্বভাব। তার মানে খারাপ। নাঃ, সব পুরুষই সমান। সবাই বিকাশ। ছিঃ—

অনেকক্ষণ ভাবতে ভাবতে শেষে এক সময়ে ঘুমিয়ে পড়ল কৃষ্ণা। ফলে সকালে ঘুম ভাঙতে দেরী হল তার। তাড়াহুড়ো করে কাজ করতে গিয়ে সে রাতের ঘটনাটা প্রায় ভুলেই গেল।

ক্রমে দুপুর হল।

দুপুর বেলায় বাড়ীটা একটু শান্ত হয়। ভোলানাথবাবু আর গুরুপদ বাবু আপিসে যান, ছেলেরা স্কুলে যায়, বাচ্চা মেয়েরা ঘুমোয়, গিন্নীরা মাঝে মাঝে গল্প-গুজব করেন, না তো তাঁরাও ঘুমোয়। গোকুল চাকরী করে না কিন্তু তার টিউশনি আছে। সকালে দুটো, দুপুরে দুটো আর সন্ধ্যেয় একটা গানের টিউশানী করে সে। সুতরাং দুপুর বেলাটা, মানে একটা থেকে তিনটে পর্য্যন্ত বাড়ীটাও যেন জিরোতে বসে।

আর এই দুপুর বেলা সমস্ত বাড়ীতে থাকে শুধু একটিমাত্র পুরুষ—সুব্রত। বাড়ীতে একটা শান্ত আবহাওয়া ঘনিয়ে ওঠে বলে দিনের মধ্যে এই সময়টাতেই তার ছবি আঁকা জমে ভাল। তারপর তিনটের

পর যখন বাড়ীতে কর্ম্ম-চাঞ্চল্য জাগে তখন সে বেরিয়ে পড়ে তার ধান্দায়।

তিনটের পর পিয়ন এসে হাঁক পেড়ে চিঠি দিয়ে গেল। কৃষ্ণা গিয়ে তা নিয়ে এল। চিঠিটা সুব্রতের নামে এসেছে। তার মায়ের হাতে দিয়ে আসার জন্য সে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে লাগল।

হঠাৎ মাঝপথে সে থামল, একপাশে সরে দাঁড়াল। ওপর থেকে সুব্রত নেমে আসছে।

সিঁড়িটা সঙ্কীর্ণ, সুব্রতকে স্বচ্ছন্দে যাবার মত পথ করে দেবার জন্য কৃষ্ণা একটু দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়াল।

সুব্রত তাকে দেখতে পেল, কাছে এসে তার অমন জড়সড় ভাব দেখে সে সহাস্যে বলল, "ভয় নেই, আজ আমি মদ খাই নি।"

কৃষ্ণা একবার চকিত-দৃষ্টি মেলে তাকাল সুব্রতের দিকে, তারপর মাথাটা নীচু করে সে বলল, "আমি ভয় পাই নি—"

"পাওনি! বেশ, বেশ। সত্যি তো, ভয় পাবার কি আছে? আমি তো বাঘ-ভালুক নই। নিতান্ত নিরীহ একজন বঙ্গ-সন্তান—"

নিজের জিভ্‌কে কৃষ্ণা আর সামলাতে পারল না, কাল রাত থেকে যে প্রশ্নটা তার মাথার মধ্যে বারংবার ঘুরে বেড়াচ্ছিল হঠাৎ তা সশব্দ হয়ে বেরিয়ে এল। মৃদুকণ্ঠে সে বলল, "তা জানি, কিন্তু একটা প্রশ্ন আছে—"

"কি?

"আপনি ঐ সব ছাই-ভস্ম খান কেন সুব্রতদা?"

সুব্রত সঙ্গে সঙ্গেই হাসিমুখে জবাব দিল, "সখ।"

"মানুষ কি শুধু শুধু বাজে সখ করে?"

সুব্রত গম্ভীর হয়ে গেল, তার মুখের সেই রূপান্তরকে লক্ষ্য করে কৃষ্ণা ঘেমে উঠল। অন্যায় করল নাকি সে?

সুব্রত তাকাল। মেয়েটি দেখতে যেমন নিরীহ ও বোকা, আসলে তেমন নয়। তা ভাল।

সে বলল, "তা হলে আসল কথাই বলি তোমাকে, বুঝবে কিনা জানি না। ব্যাপার কি জানো? একরকম লোক থাকে পৃথিবীতে যাদের আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবের কোন অভাব নেই, অথচ তবু তাদের সঙ্গে খাপ খায় না কারো। আমিও তেমনি একজন—বেয়াড়া, বেখাপ্পা ধরণের লোক—সম্পূর্ণ একা। আর যারা একা তাদের মত দুঃখী আর পৃথিবীতে কেউ নেই—তাই—"

বলতে বলতে এবার থামল সুব্রত, আবার লঘুভাব ফিরিয়ে নিয়ে এসে হাসল, "দূর ছাই, এসব কি বলছি আমি? কিছু না ভাই, স্রেফ প্রলাপ বকছিলাম, এবার কাজে যাই।"

"আপনার চিঠি এসেছে একটা—এই যে।"

"থ্যাঙ্কস্।"

চিঠিটা নিয়ে তরতর করে নীচে নেমে গেল সুব্রত। কৃষ্ণা সেখানেই দাঁড়িয়ে রইল। সুব্রতের বুট-জুতোর শব্দ গিয়ে গলিতে নামল, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তা শোনার পরও কিছুক্ষণ স্থির হয়ে রইল কৃষ্ণা। সুব্রতের কথাগুলো তার মাথায় ঘুরতে লাগল। অমন আবেগের সঙ্গে অতগুলো কথা বলে কি বোঝাতে চাইল সে? পৃথিবীতে যারা একা তারা খুব দুঃখী? কেন? কেন?

সেদিনও কৃষ্ণা সারাদিন সারারাত ভাবল। সুব্রতদা, মানে সুব্রত বাবু মদ খান কেন এই প্রশ্নের সে জবাব পেয়েছে। সুব্রতদা একা। পৃথিবীতে একা'র বড় দুঃখ। তার মানে?

অনেক ভেবে সে যেন কথাটা বুঝতে পারল শেষ পর্য্যন্ত। সে বুঝল কেন সুব্রত মদ খায়।

সুব্রত শিল্পী। সাধারণের সঙ্গে শিল্পীর কোথাও মিল নেই। তার সুখ-দুঃখের সংজ্ঞা সম্পূর্ণ আলাদা, তার আচার-ব্যবহার এবং কথাবার্ত্তা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। ফলে কেউ তাকে আপন ভাবে না, সেও কাউকে আপন ভাবতে পারে না। অথচ মানুষ তো একা থাকতে পারে না। প্রত্যেকেই চায় যে কেউ তাকে একান্ত আপন বলে ভাবুক, কেউ তার একান্ত আপন হোক, তার সুখ-দুঃখে হাসুক, কাঁদুক। প্রত্যেকেই চায় মনের মানুষ। সেই মনের মানুষ না পেলে দুঃখ হয় বৈকি এবং শিল্পীর অনুভূতি অত্যন্ত প্রখর বলেই সে সহ্য করতে পারে না, আত্মরক্ষা করার জন্য সে তখন এটা ওটা করে। মদ খায়, অপরিচিতার দ্বারে করাঘাত করে, আত্মহত্যা করে। সুব্রতও সেই একই কারণে মদ খায়।

কৃষ্ণা বুঝল। বুঝে গভীর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল। সুব্রতের সঙ্গে তার যেন কোথায় একটা মিল আছে। সেও যেন ভারী একা। তারও যেন মনের মানুষ নেই। আর তা পাওয়া তো সহজ নয়। যে সেই তো মনের মানুষ হতে পারে না। তাহলে তো বিকাশও সেই আসন পেত। ছিঃ—

বিকাশের কথা স্মরণ হতেই কৃষ্ণার সর্ব্বাঙ্গ ঘৃণায় সঙ্কুচিত হয়ে উঠল। নাঃ, সব পুরুষই সমান। বাক্-চতুর, মিথ্যাবাদী, লোভী।

কিন্তু পুরুষ জাতকে নীচ মনে করলেও সুব্রতের আঁকা ছবি দেখার লোভটা সামলাতে পারল না কৃষ্ণা।

সুযোগটা পরদিনই এল।

সেদিন সুব্রতকে বারোটা নাগাদই বেরিয়ে যেতে দেখল কৃষ্ণা। তার কিছুক্ষণ পরেই সে ওপরে গেল।

সুব্রতের মা ইন্দুমতী তখন বসে বসে মহাভারত পড়ছিলেন, কৃষ্ণাকে দেখে সস্নেহে ডাকলেন, "এসো মা, এসো—"

কৃষ্ণা গিয়ে একপাশে বসল।

"তারপর, খবর কি বাছা?" ইন্দুমতী হাসলেন।

"মাসীমা—"

"উঁ?"

একটু ইতস্ততঃ করে কৃষ্ণা বলল, "আপনি বলেছিলেন একদিন ছবি দেখাবেন"—

"কোন ছবি?"

"সুব্রতদা'র আঁকা ছবি"—

"সে তো তাকে বলেই দেখে নিতে পার।"

কৃষ্ণা ঘাড় নাড়ল, "তা বলতে পারব না আমি।"

ইন্দুমতী হেসে উঠলেন, "কেন? লজ্জা? আচ্ছা মা, চল—কিন্তু আমি ওখানে দাঁড়িয়ে থাকতে পারব না বাপু। গাদা গাদা হিজিবিজি এঁকেছে, তুমি বসে বসে দেখগে"—

ইন্দুমতী কৃষ্ণাকে নিয়ে পাশের ঘরে গেলেন, বল্লেন, "এই দেখ, ছবিগুলো জঞ্জালের মত ছড়িয়ে রেখেছে চারদিকে। ঘুরে ঘুরে দেখ, আমি ততক্ষণে শান্তি-পর্ব্বটা শেষ করিগে।"

কৃষ্ণা মাথা নেড়ে বলল, "আচ্ছা।"

ইন্দুমতী নিজের ঘরে ফিরে গেলেন। কৃষ্ণা ঘুরে ঘুরে ছবি দেখতে লাগল। কত ছবি। দেখে মুগ্ধ হয়ে গেল সে। কত রকমের মানুষ, প্রাকৃতিক দৃশ্য আর রাস্তা-ঘাটের ছবি! কি আশ্চর্য্য রং আর রেখা! ঠিক যেন সত্যিকারের ব্যাপার! দেখতে দেখতে তার চোখের সামনেকার সব কিছুই রঙীন হয়ে উঠল, মনটা যেন কোথায় চলে গেল, কেমন করে

উঠল। আশ্চর্য্য একটা সুন্দর পৃথিবী যেন ছবিগুলো থেকে বেরিয়ে এল তার সামনে। নানাবর্ণের বিচিত্র সমারোহে ভরা অপরূপ পৃথিবী। দেখতে দেখতে তন্ময় হয়ে গেল সে।

হঠাৎ এক সময়ে বারান্দায় ভারী জুতার শব্দ শোনা গেল। শব্দটা পরিচিত। তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরোবার উপক্রম করার আগেই সুব্রত ঘরে ঢুকল।

কৃষ্ণা ভেবে পেল না সে কি করবে। অপরাধীর মতই একটা সন্ত্রস্ত ভাব ফুটে উঠল তার মুখে। কে জানে কি মনে করবেন সুব্রতদা'? অথচ এত তাড়াতাড়ি তো কোন দিনই ফেরেন না তিনি? তা ছাড়া তার কি দোষ?

কৃষ্ণাকে ঘরের ভেতর দেখে একটু অবাকই হল সুব্রত। একেবারে অপ্রত্যাশিত। কপট গাম্ভীর্য্যের সঙ্গে সে প্রশ্ন করল, "কি ব্যাপার? আমার ঘরে কি হচ্ছে?"

কৃষ্ণা হাসবার চেষ্টা করে বলল, "আ—আমি"—

"হ্যাঁ তুমি—কি করছিলে? ছবি চুরি করছিলে না তো?"

কৃষ্ণার মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল, "আমি—চুরি! বাঃ"—

"তা হলে কি করছিলে?"

কৃষ্ণা আহতকণ্ঠে জবাব দিল, "দেখছিলাম।"

গাম্ভীর্য্যের মুখোস উন্মোচন করে সুব্রত তার সেই চিরাচরিত ছেলেমানুষী হাসি হেসে বলল, "দেখছিলে? তা বেশ, দেখ"—

কৃষ্ণা আশ্বস্ত হল, সলজ্জকণ্ঠে প্রশ্ন করল, "আজ যে আপনি এত তাড়াতাড়ি ফিরে এলেন?"

সুব্রত কৌতুকের সুরে বলল, "এঃ, আমার অবর্ত্তমানে দেখে সরে পড়ার ইচ্ছে ছিল বুঝি? তা আর হল না, কাজ না হওয়ায় ফিরে

এলাম। কিন্তু তাতে কি হয়েছে? আমার ছবি দেখবে—সেখানে আমি থাকলে দোষটা কি? নাও, এই দেখ আরো কতকগুলো ছবি"—

নানা ছবি দেখাল সুব্রত। দেখে বিস্ময়ে, আনন্দে ও শ্রদ্ধায় কৃষ্ণার হৃদয় ভরে উঠল। সব ছবির অর্থ বুঝল না সে, কোন্‌টা কতটা ভালো আর কতটা মন্দ তাও বোধগম্য হল না তার তবু ভালো লাগল, তবু সে এটুকু বুঝল যে সুব্রত একজন উঁচু দরের শিল্পী।

ছবি দেখার পালা এক পর্ব্ব শেষ হলে পর সুব্রত বলল, "তোমার যখনই ছবি দেখতে ইচ্ছে করবে তখনই আমাকে বলো বা দেখে যেও কৃষ্ণা—লজ্জা কর না—"

কৃতজ্ঞভাবে মাথা নাড়ল কৃষ্ণা, মৃদু কণ্ঠে বলল, "আচ্ছা"—

যখন কৃষ্ণা নীচে নেমে এল তখন একটা ছোটখাটো কাণ্ড হল। গোকুল তাকে দেখতে পেল। এক জায়গায় তার ছাত্রী আর সেদিন গান শেখেনি বলে একটু আগেই সে ফিরে এসেছিল। জুতো খুলে হাত-পা ধোবার সময়টাতে সে দেখতে পেল যে ওপর থেকে কৃষ্ণা নেমে আসছে। দূরবীক্ষণ-যন্ত্রের মত শক্তিশালী গোকুলের চোখ, সে দেখতে পেল যে কৃষ্ণার দু'ঠোঁটের কোণে জোয়ারের জল চিহ্নের মত হাসির আভাস, চঞ্চল গতিভঙ্গী। কিন্তু কিছুটা নীচে নেমে গোকুলকে দেখতে পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তার রূপান্তর ঘটল, গতিভঙ্গী মন্থর হয়ে এল, ঠোঁট দুটো দৃঢ় সংবদ্ধ হল।

গোকুল কাছে এগিয়ে এল, প্রশ্ন করল, "ওপরে গিয়েছিলে বুঝি?"

কৃষ্ণা উদ্ধত ভঙ্গীতে উত্তর দিল, "দেখতেই তো পাচ্ছ।"

"সুব্রতবাবুর ওখানে?"

"তার মায়ের কাছে।"

"সুব্রতবাবু ওপরে নেই ?"

"আছে। কিন্তু তুমি অত জেরা করছ কেন বলত গোকুলদা' ?"

গোকুল হাসবার ভান করল, "হেঁ হেঁ, কি যে বল, জেরা আবার করলুম কোথায় ? দুটো কথা কইলেই বুঝি তা জেরা হয়ে ওঠে ? তারপর, আজকাল তো আর গানের অভ্যেস করছ না বেশী। সেই গানটা কেমন তৈরী হয়েছে ? সেই 'গুণীজন গাওত রাগ হাম্বীর' ?"

"হয়েছে তৈরী।"

"হেঁ হেঁ, তৈরী হয়ে গেছে। এত সহজেই কি হয় ? বেশ, আজ শুনব, তা ছাড়া আর একটা নতুন ভজন শিখবে আজকে। কাকাবাবু কালকেই বলছিলেন, কৃষ্ণাকে ভজন-টজন শেখাও গোকুল, আমার তা শুনতে বড় ভাল লাগে।"

কৃষ্ণার শরীর জ্বলে উঠল। বাবার ভজন ভালো লাগে না ছাই। ডাহা কতকগুলো মিথ্যে কথা আউড়ে যাচ্ছে গোকুলদা। নির্জ্জলা মিথ্যে।

সে সংক্ষিপ্ত ভাষায় বলল, "বেশ তো, শিখব।"

"হেঁ হেঁ, বেশ"—চট্ করে গলার সুর নামিয়ে ফেলল গোকুল, বলল, "কিন্তু পরশুর কথাটা দেখছি মনে নেই তোমার"—

"কোন কথা ?" কৃষ্ণা ভ্রূ-কুঞ্চিত করল।

"মানে তোমার গিয়ে ঐ সুব্রতবাবুর কথা। লোকটি যে সুবিধের নয়, তা কি তোমায় বলি নি ? অত ঘন ঘন ওপরে যেও না, বুঝলে ?"

কৃষ্ণা গম্ভীর হয়ে বলল, "বুঝেছি। আমি ত' ঘন ঘন যাই না ওখানে। গিয়েছিলাম মাসীমার সঙ্গে গল্প করতে, মাসীমা ছবি দেখাচ্ছিলেন, এমন সময় এলেন সুব্রতবাবু; আমার দোষ কি ?"

"না না, তোমার দোষ হবে কেন? ছি ছি—তা বলছি না। তা কেমন ছবি দেখলে? বিচ্ছিরী, তাই না?"

কৃষ্ণা অবাক হল, "কেন, আমার তো ভালই লাগল।"

গোকুল বিজ্ঞের মত মাথা নেড়ে নেড়ে হাসল, "ভালো লাগল। হেঁ হেঁ, কি আর বলব, তুমি তো ছেলেমানুষ। আজ পনেরো বছর ধরে সঙ্গীত-সাধনা করছি, আমি কি ছবি বুঝি না? আরে ভয়ঙ্কর কাঁচা হাত লোকটার, ক্লাস সেভেনের ছাত্রের মত। রবি বর্ম্মার পর কি এদেশে আর কেউ ছবি আঁকতে পেরেছে? কিন্তু সত্যি কথা তো আর বলা যায় না, বুঝেচ না হেঁ হেঁ হেঁ"—

কৃষ্ণা রান্নাঘরের দিকে পা বাড়াল।

গোকুল হাসি থামিয়ে বলল, "আমার কথাগুলো মনে রেখো কৃষ্ণা, বুঝলে?

"বুঝেছি।"

কৃষ্ণা চলে গেল। কিন্তু তার কণ্ঠের চাপা বিরক্তির আঁচ পেল গোকুল। মনে মনে সে হাসল। হেঁ হেঁ, বয়ঃসন্ধিকাল বাবা, এসব কি আর সে বোঝে না। কিন্তু ঘাবড়াবার পাত্র নয় সে, ভোলানাথবাবু মিলিটারী লোক, তাঁকে বলে আজই সে নিষেধের কড়া দেয়াল খাড়া করে দেবে।

তারপর গোকুল যা করেছিল তাও আমি জানতে পেরেছিলাম।

বুদ্ধিমান লোক গোকুল ভট্টাচার্য্য। কার কাছে কি ভাবে কথা পাড়তে হয় তা তার জানা আছে। সন্ধ্যের পর ফিরে এসে সে পাকা

এক ঘণ্টা ভজন গান শোনাল ভোলানাথ বাবুকে। খবরের কাগজ পড়তে পড়তে ভোলানাথবাবু গানের খানিকটা শুনলেন, খানিকটা শুনলেন না, যেখানে বাহবা দেওয়া উচিত সেখানে কিছু না বলে হয়ত অন্য এক জায়গায় 'বেশ বেশ' বলে উঠলেন।

গান শেষ হল।

"হেঁ হেঁ, কেমন লাগল কাকাবাবু?" গোকুল প্রশ্ন করল।

"ভালই। তা কৃষ্ণা কেমন শিখছে আজকাল?"

গোকুল হঠাৎ অতিমাত্রায় গম্ভীর হয়ে গেল, চট করে কোন জবাব দিল না।

"কৈ গোকুল, বলছ না যে কিছু? বোধ হয় হতভাগীর দ্বারা আর কিছু হবে না? আর বল কেন, জ্বালিয়ে খেলে রাক্ষুসী। বিয়ে হবে না, কোন গতি হবে না, কেবল পাষাণ হয়ে আমার বুকে চেপে থাকবে। কি যে করি কিছুই বুঝি না।"

গোকুল সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল, কথার মোড় বুঝিবা ঘুরে যায়। তাড়াতাড়ি সে বলল, "আজ্ঞে চিন্তা করার মত ব্যাপার নয়। কৃষ্ণার গলা ভালো। মন দিয়ে শিখলে পরে ওর গান রেডিও রেকর্ডেও চলবে। কিন্তু"— গোকুল একটা বোড়ের চাল দিয়ে থামল।

ভোলানাথবাবু তীক্ষ্ণদৃষ্টি মেলে তাকালেন, "কিন্তু কি?"

গোকুল অত্যন্ত বিনীতভাবে, মৃদুকণ্ঠে বলল, "আজ্ঞে, তেমন মন দিয়ে চর্চ্চা করে না"—

"করে না! কেন করে না? বাড়ীতে হতভাগীর কি এমন কাজ যে চর্চ্চা করতে পারে না?"

"আজ্ঞে সংসারের কাজকর্ম্ম তো আছে—তারপর যে সময় পায় তখন গুরুপদবাবুর বাড়ী আর ওপরতলায় গিয়ে গল্পগুজব করে"—

দু'চোখ ছোট করে ভোলানাথবাবু সন্দিগ্ধ কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন. "ওপর তলায়—মানে ঐ"—

গোকুল মৃদু হেসে মাথা নাড়ল,"আজ্ঞে হ্যাঁ—ঐ সুব্রতবাবুর ওখানে।"

"কার সঙ্গে আড্ডা দেয় ?"

"বলে তো ওপরে বুড়ীর কাছে যায়"—

অবিশ্বাসভরা গলায় ভোলানাথবাবু উচ্চারণ করলেন, "হুঁ"—অর্থাৎ না, তা কিছুতেই নয়।

গোকুল সুযোগ পেল, পূর্ব্ববৎ মৃদুকণ্ঠেই সে বলল, "ব্যাপার কি জানেন কাকাবাবু—ঐ সুব্রতবাবু লোকটাকে আমার সুবিধের মনে হয়না! যারা ছবি আঁকে আর থেটার করে তারা লোক একটু গোলমেলেই হয়—"

ভোলানাথবাবু মাথা নাড়লেন, "আমারও ঐ ছোঁড়াকে বদ্‌মায়েস বলে মনে হয়"—

গোকুল একটু ঝুঁকে পড়ল সামনের দিকে, সমস্ত দাঁতগুলো মেলে সে সহাস্যে বলল, "শুধু কি তাই, লোকটা যে মাতাল সে বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই"—

"মাতাল !"

"আজ্ঞে হ্যাঁ"—

ভোলানাথবাবুর দুটো রক্তারুণ চোখ আরো লাল হয়ে উঠল।

গোকুল বলল,"কৃষ্ণার উচিত নয় ওপরের লোকদের সঙ্গে মেলামেশা করা; বুঝেচেন না' কিসে কি হয় কে জানে ?"

"ঠিকই তো, একশোবার ঠিক কথা। আচ্ছা আমি আসছি।"

ভোলানাথবাবু উঠে গেলেন সেখান থেকে। গোকুল বুঝল যে মেয়েকে তিরস্কার করতে গেলেন ভোলানাথবাবু। খরগোশের মত

দুটো কান খাড়া করে সে বিড়ি টানতে লাগল। ঠিক হয়েছে, সে কিস্তি মাৎ করেছে।

ভোলানাথবাবু সোজা রান্নাঘরে গেলেন।

যোগমায়া তরকারী কুটছিলেন, কৃষ্ণা ডালে সম্বরা দিচ্ছিল। আড়-নয়নে তাকিয়ে কৃষ্ণা দেখল যে দরজার পাশে এসে বাবা দাঁড়িয়েছেন, তাঁর চোখে-মুখে একটা থমথমে ভাব।

যোগমায়া স্বামীর সঙ্গে একটু পরিহাসের চেষ্টা করে বললেন, "কি ব্যাপার, একেবারে যে রান্নাঘর অবধি ধাওয়া করেছ ?"

ভোলানাথবাবু রুক্ষকণ্ঠে বললেন, "দরকার পড়লে তা মাঝে মাঝে করতে হয় বৈকি।"

যোগমায়া শঙ্কিত কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন, "কেন ? কি দরকার পড়ল ?"

ভোলানাথবাবু গম্ভীর গলায় পাল্টা প্রশ্ন করলেন, "তোমার মেয়ের—মানে তোমার বড় মেয়ের বয়স কত জান ?"

"কত আর—উনিশ"—

"উনিশ না কুড়ি ?"

যোগমায়া অবাক হলেন, কৃষ্ণা একটা বজ্রপাতের আশঙ্কা করতে লাগল।

যোগমায়া শান্ত কণ্ঠে বললেন, "তা উনিশ আর কুড়িতে এমন কি যায় আসে ?"

ভোলানাথবাবু ভেংচি কাটলেন, "কি যায় আসে ? বটে তাহলে দশে আর উনিশেই বা কি যায় আসে ?"

যোগমায়ার ধৈর্য্য অসীম, আগের মতই শান্তভাবে তিনি বললেন,

"মানলাম। উনিশ বলে ভুল হয়েছে, ওর বয়স কুড়ি। কিন্তু হয়েছে কি সেটা শোনালেই তো পার।"

"তা তো শোনাচ্ছিই। তার জন্য এ কথাগুলোও যে দরকারী।"

"তাও মানলাম। তারপর?"

"তারপর আবার কি? বিয়ের যুগ্যি মেয়ে তোমার, বিয়ে দিলেই মা ষষ্ঠীর দয়া হবে—অথচ চালচলনটি তার তো বয়সের যুগ্যি নয়।"

"নয় কেন?"

ভোলানাথবাবু চিবিয়ে চিবিয়ে বললেন, "মেয়ের জন্য যে খুব দরদ দেখছি! আরে বাপু, দরদ আমারও হয়, তবু একটু কড়া হতে হবে। এত বড় মেয়ে তোমার, যখন তখন যার তার ওখানে যাওয়াটা যে তার পক্ষে শোভা পায় না, সে কথা হতভাগীকে বুঝিয়ে দিও"—

"কোথায় যায় ও?"

"জানো না?"

"না তো।"

চোখ আর আঙুল নাচিয়ে ওপরদিকে নির্দেশ করে ভোলানাথবাবু বললেন, "ওপরে—ঐ সুব্রত না কে ঐ ছোঁড়ার ওখানে। বলি, কি দরকার বাপু? সেখানে কি ওর বয়িসী কোন মেয়ে আছে? তবে? তাছাড়া ঐ ছোঁড়াকে আমার ভালো মনে হয় না, স্রেফ একটা ভ্যাগাবণ্ড চরিত্রহীন লোক। ওখানে যাওয়াটা যেন বন্ধ হয় মেয়ের এই কথাটিই তোমাদের বলে গেলাম। ওসব বাজে আড্ডা না দিয়ে মেয়ে যেন একটু গানের চর্চা করে। রূপ আর অর্থ তো ঠনঠন্, একটু গুণ অর্জন করুক।" বলেই ভোলানাথবাবু সেখান থেকে নাটকীয় ভঙ্গীতে অন্তর্হিত হলেন।

ঘরের ভেতরটা কিছুক্ষণের জন্য ঘোরতর নিস্তব্ধ হয়ে গেল। যোগমায়া

আবার তরকারী কুটতে সুরু করলেন, কৃষ্ণা ডাল নামিয়ে বেগুন ভাজার জন্য কড়াই চাপাল। লজ্জায়, ঘৃণায়, অপমানে আক্রোশে তার মাটিতে মিশিয়ে যেতে ইচ্ছে হল।

কিছুক্ষণ বাদে যোগমায়া প্রশ্ন করলেন, "তোর বাবা কি করে জানল বলত?"

মৃদুকণ্ঠে কৃষ্ণা জবাব দিল, "কি করে আবার, গোকুলদা বলেছে।"

"হুঁ"—যোগমায়া মাথা নাড়লেন, "কি আর বলব মা, বলবার কিছু নেই। শুধু এটুকুই বলি যে আমাদের কোথাও স্বস্তি নেই। বাপের ঘর সোয়ামীর ঘর—সর্ব্বত্রই আমরা জেলের কয়েদী।" তারপর কিছুক্ষণ চুপ থেকে আবার বললেন, "পুরুষের সঙ্গে কথা বললেই যে মেয়েমানুষের জাত যায়না তা ওদের কে বলে দেবে। তাছাড়া সুব্রত ছেলেটি তো খুব খারাপ নয়, আর তার মা তো চমৎকার লোক। সে যাক্‌গে মা, ওই গোক্‌লো হতভাগা বাড়ীতে থাকলে তুই আর বাবু ওপরে যাস্‌নি।"

"আচ্ছা মা"—

একে একে সব কাজ শেষ হল, খাওয়া দাওয়ার পাট চুকল। মাঝখানে গোকুল গান শেখাতে চেয়েছিল, কাজের অজুহাতে কৃষ্ণা তা এড়াল। সারাক্ষণ শরীর তার জ্বলতে লাগল শুধু। মানুষের সঙ্গে কথা বললেই কি সতীত্ব যায়? আর এত অবিশ্বাস কেন? তার কি ন্যায়-অন্যায়-বোধ জন্মায়নি? সেই বোধ যদি তার কম থাকত, তাহলে হয়ত বিকাশ আজ জয়ী হয়ে দূরে বসে হাসতে পারত। কিন্তু সে কি আজ সেই গর্ব্ব করতে পারবে? তাছাড়া সুব্রতবাবু যে লোক খারাপ তার প্রমাণ কোথায়? মদ খাওয়াটাই তো চরিত্রহীনতার শেষ কথা নয়। বাবা আর গোকুলদা' কি করে বুঝলেন যে সুব্রতবাবু লোক খারাপ! এ সমস্তই গোকুলদা'র কারসাজি। ভারী বিশ্রী লোক

গোকুলদা', ছুনিয়া সুদ্ধু সবাইকে খারাপ ভাবাটাই তার স্বভাব। বাবার আস্কারা পেয়েই বেড়েছে লোকটা। কিন্তু তার পেছনে কেন? তার গার্জেনগিরি করার জন্ত তো তার বাবাই আছেন। তিনি তো একাই একশো। এখনো মনে পড়ে কেমনভাবে তিনি আড়ালে দাঁড়িয়ে বিকাশ আর তাকে লক্ষ্য করতেন। আশ্চর্য্য! একা রামে রক্ষে নেই, সুগ্রীব দোসর। আবার সাগরেদ জুটেছে গোকুলদা'। বিশ্রী লোক।

বিছানায় শুযেও চিন্তা দূর হল না কৃষ্ণার। ভাবতে ভাবতে সে নিজেকে বিশ্লেষণ করতে বসল। আচ্ছা, তার ব্যাপারটা কি? বাবা নিষেধ করছেন ওপরে যেতে, সুব্রতবাবুদের সঙ্গে কথা বলতে—তাতে তার উত্তেজনা হচ্ছে কেন? নিছক অন্যায় আদেশ বলেই কি? কিংবা আরো কিছু! জীবনে সবাই মনের মানুষ খোঁজে। কৃষ্ণাও খোঁজে। একবার বিকাশের মধ্যে খুঁজেছিল সে। সেটা মৃগতৃষ্ণিকা। এবার কি সে সুব্রতের মধ্যেই খুঁজতে চায় সেই মনের মানুষ? তাই কি?

ভাবতে ভাবতে কৃষ্ণার কান গরম হযে উঠল, বুকের স্পন্দন বেড়ে গেল। ছি ছি ছি, তা কেন? তা কেন? সে কি শুধুই একটা মাংসপিণ্ড যে বিচারবুদ্ধির বালাই থাকবে না তার? তা নয়, ইচ্ছে করলে সে এই মুহূর্ত্তেই নিজের গতিবিধিকে দমন করতে পারে। কিন্তু সে তা করবে না। গোকুলদা' কে যে তার হুকুম শুনতে হবে তাকে? আর বাবার কথাই বা সে শুনবে কেন? তাঁর মন এত সন্দিগ্ধ এবং নীচ কেন? তার জন্ত কতটুকু দরদ আছে বাবার? একটুও না। ম্যাট্রিক পাস করার পর তাকে আরো পড়ালে বাবার কি ক্ষতিটা হত? অভাব? বি, এ, পাশ করে সে ও তো চাকরী করে সংসারকে সাহায্য করতে পারত। মাষ্টারী করেও তো সে পড়তে পারত। মেয়েরা কি এতই অক্ষম যে তারা বিয়ের বৌ ছাড়া আর কিছুই হতে পারবে না?

তাছাড়া উঠতে বসতে, বিয়ে না হওয়ার দুর্ভাগ্যের জন্য জন্য দিনের পর দিন সে যে তিরস্কার অর্জ্জন করে তাতে তার বাবার কথা বর্ণে বর্ণে শোনার মত বিন্দুমাত্র পিতৃভক্তি নেই। না, ওঁরা যে যাই বলুক না কেন, কারো চোখরাঙানী সহ্য করার মত সহনশক্তি তার আর নেই। মানুষের সঙ্গে কথা বললেই যে তার নারীত্ব বিপন্ন হবে এমন কথা সে কিছুতেই বিশ্বাস করবে না। না, সে সুব্রতদা'র ওখানে ইচ্ছে হলেই যাবে, তাঁর সঙ্গে, তাঁর মায়ের সঙ্গে ইচ্ছে হলেই কথা বলবে। তাতে যা হবার হোক। সে কাউকে ভয় করে না।

চার

পরবর্ত্তী পনেরো দিনের ঘটনাবলী আমার জানা নেই। কারণ সুব্রতের সঙ্গে এর মধ্যে আমার দেখা হয়নি। আর দেখা হওয়ার সময়ও ছিল না। দিন পাঁচেক আমি বাইরে ছিলাম, আবার ফিরে এসে সুব্রতর ছবির একটা প্রদর্শনীর ব্যবস্থাকল্পে ঘোরাঘুরি করছিলাম। বন্ধুকৃত্য আর কি। সুব্রত সেকথা জানত না, তাতে বয়ে গেছে। মহৎ একটা প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ভাবলাম যে জীবনে যখন সংসারধর্ম্ম আর করা হল না তখন আর স্বার্থপর হব না, পরার্থেই যথাসাধ্য করার চেষ্টা করব। দিন দশেকের মধ্যেই ব্যাপারটা প্রায় ঠিক করে ফেললাম। পার্ক ষ্ট্রীটের একটা ক্লাবঘরে প্রদর্শনীর জায়গা ঠিক হল। তারিখও একটা নির্দ্ধারিত হল, শুধু কিছু টাকার দরকার। তা একটা ব্যবস্থা হবেই। মাঝখানে আরো দু'সপ্তাহ সময় আছে।

সেদিন দুপুর বেলায় হুড়মুড় করে সুব্রত এসে আফিসে ঢুকল, সজোরে একটা চেয়ার টেনে বসে সে বলল, "উঃ বাঁচলাম। ওহে কানাই, এক কাপ চা আনো তো ভাই"—

প্রশ্ন করলাম, "কি ব্যাপার? মনে হচ্ছে এখনো তোমার চান খাওয়া হয়নি?"

সে সহাস্যে মাথা নাড়ল, "তাই বটে এবং এখনো হবে কিনা সন্দেহজনক মনে হচ্ছে।"

"তার মানে?"

"বাড়ীতে আজ গোধূলি-লগ্নে কনে-দেখা-পর্ব্ব চলবে—আবহাওয়াটা

সহ্য হবে না বোধ হয়। তাই ভাবছি বাড়ী আর যাব না, এখানেই কাটিয়ে দেব।"

বুঝলুম না কথাটা, তাই আবার জিজ্ঞেস করলাম, "আহা কনেটি কে তাই শুনি?"

"আরে সেই মহাশয় ব্যক্তি, মানে ভোলানাথবাবুর মেয়ে কৃষ্ণা।"

"ওঃ"—মুখ টিপে হাসলাম আমি।

"হাসছ কেন বৃদ্ধ?" সুব্রত ভুরু কুঁচকাল।

উদার ভঙ্গীতে তার কথাকে অগ্রাহ্য করে বললাম, "আমাকে বার্দ্ধক্যের অপবাদ দিয়ে অপমান করলেই কি আমার হাসি বন্ধ হবে?"

"আচ্ছা বেশ, হে যুবক, তুমি ক্ষুণ্ণ হয়ো না, অনুগ্রহপূর্ব্বক তোমার হাসির কারণটি খুলে বল।"

মাথা নেড়ে বললাম, "কারণটি হাস্যজনক নয়। অন্য একজন ভাড়াটের মেয়েকে দেখতে আসবে লোকে তাতে তোমার কি অসুবিধে হবে তা বুঝতে না পেরে হাসছি।"

সন্দিগ্ধভাবে সুব্রত বলল, "বুঝতে না পেরে মানুষ হাসে নাকি?"

"হাসে। বোকারা।"

সুব্রত বিশ্বাস করল না কথাটা, সে আমাকে বুঝিয়ে বলার জন্য বলল, "ব্যাপার কি জানো? কনে-দেখা পর্ব্বটা আমার কাছে একটা বর্ব্বর প্রথা বলে মনে হয়। কথা নেই, বার্ত্তা নেই, আলাপ নেই পরিচয় নেই, ঝুপ্ করে একটা লোক এসে একটা মেয়ের দিকে হাঁ করে দেখতে লাগল আর কি খাও কি কর প্রশ্ন করতে লাগল—কথাটা ভাবলেই আমার গায়ে জ্বর আসে। তাই সরে পড়লাম বাড়ী থেকে। বাঃ, তবু হাসছ কেন বলত?"

"বলব?"

"বল—ডোণ্ট্ ট্রাই টুবি মিস্টিরিয়াস, ফর্ হেভেন্স্সেক্"—

"তাহলে শোন। তোমার বাড়ী না যাওয়ার পেছনে কোন বেদনা নেই তো? আমি ভাবলাম বুঝিবা হৃদয়ে একটা প্রচণ্ড জ্বালাবোধ হওয়াতেই তুমি এখানে থাকতে চাইছ।"

সুব্রত কটমট করে তাকাল, বাঘে যেমন লাফাবার আগেকার মুহূর্ত্তে একবার মাথা নীচু করে দেখতে দেখতে একটা মৃদু হুঙ্কার ছাড়ে তেমনি-ভাবে সে প্রশ্ন করল, "তার মানে? জ্বালাবোধ মানে?"

মিষ্টি করে বললাম, "বাইরের একটা বাজে লোক এসে কোনো পরিচিতা মেয়েকে দেখলে অনেক সময় যেমন জ্বালাবোধ হয় তেমনি আর কি।"

"অনিমেষ রায়।"

"কি হল?"

"তুমি হীনমনা, নীচাশয়।"

"ধন্যবাদ।"

"ভদ্রঘরের শান্ত ও নিরীহ একটি মেয়ে এবং নির্দ্দোষ একজন যুবককে নিয়ে তুমি প্রায়ই রহস্য করে থাক, আজো করলে—সেই রহস্য করার পাপে তুমি যেন চুরাশি জন্ম নরকে পচে মর।"

"হা হতোস্মি।"

ব্যাপারটা হয়ত আরো কিছুদূর চলত। কিন্তু বাঁচলাম। কানাই চা নিয়ে এল।

চা খেতে খেতে সুব্রত সহজভাবে বলল, "ঠাট্টা নয় সম্পাদক, মেয়েটিকে দেখে যা মনে হয়েছিল আসলে তা নয়। খুব ভদ্র এবং ভালো মেয়ে। কথাবার্ত্তা বলে বুঝিনি তা', অন্য একটা ব্যাপারে বুঝেছি।"

কৌতূহলান্বিত হয়ে প্রশ্ন করলাম, "কি ব্যাপার ;"

সুব্রত হাসল, "সেদিন যে মেয়েটি আমাকে ছবি বিক্রি করতে দেখেছিল তা কি তোমার মনে আছে ?"

"আছে।"

"সেকথা কিন্তু সে বাড়ীর কাউকে বলেনি !"

"বলেনি তা বুঝলে কি করে ?

"গোকুল ভট্টাচার্য্য সে বিষয়ে কিছু বলেনি দেখে।"

দেখে এবং শুনে গোকুলকে যতটা চিনেছিলাম তা দিয়ে বিচার করে দেখলাম যে কথাটা মিথ্যে নয়।

কথাটা ঘুরিয়ে দিয়ে সুব্রতকে খুশী করার জন্য আচম্‌কা বললাম, "একটা কথা আছে সুব্রত—"

"কি ?"

"তোমার ছবি নিয়ে একজিবিসন করার ব্যবস্থা হয়ে গেছে মায় জায়গা পর্য্যন্ত—"

বোকার মত ফ্যাল্‌ফ্যাল্‌ করে সুব্রত কয়েক সেকেণ্ড আমার দিকে তাকিয়ে রইল তারপর লাফিয়ে কাছে এসে তার বাঘের থাবার মত ভারী ভারী হাতগুলো দিয়ে আমার দু কাঁধে দুটো প্রচণ্ড ঝাঁকুনী দিয়ে সে সোল্লাসে প্রশ্ন করল, "কবে ? কোথায় ? কোথায় ?"

সব কথা খুলে বলে তাকে খুশী করে দিলাম। ছেলেমানুষী প্রসন্নতায় তার শুকনো মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠল, সে বলল, "সম্পাদক, তুমি একজন মহাপুরুষ।"

মাথা নেড়ে বললাম, "ঠিক, তুমি আমাকে যথার্থই চিনেছ। এবার ওঠ, বাড়ী গিয়ে স্নানাহারপর্ব্ব সারোগে—কনে-দেখা-পর্ব্বের কথা স্মরণ করে তোমার বিচলিত হওয়ার কোন অর্থ হয় না, কারণ বর্ব্বরতা লোপ

পেতে এখনো বহু দেরী। তাছাড়া তোমার মত দৈত্যের খিদে মেটাবার সামর্থ্য আমার নেই। নমস্কার।"

সুব্রত উঠে দাঁড়াল, অট্টহাসিতে ভেঙ্গে পড়ে বলল, "তোমার ইচ্ছেই পূর্ণ হোক গুরুদেব—আমি বাড়ী যাচ্ছি।"

আবার দু'দিন বাদে এল সুব্রত।

তাকে দেখে নির্দোষ কৌতূহল জন্মাল মনে, প্রশ্ন করলাম, "তোমাদের বাড়ীর কনেটির খবর কি সুব্রত?"

প্রশ্নটির জন্য তার মধ্যে কোন প্রস্তুতিই ছিল না, তাই সে চমকে উঠল, বলল, "কনে? তার মানে—ওঃ, তুমি কৃষ্ণার কথা বলছ।"

"হ্যাঁ"—

"দেখতে এসেছিল তাকে। বিচারকদের তাকে পছন্দ হয়নি।"

"সেদিনই জানিয়ে গেছে বুঝি?"

"হ্যাঁ।"

কৃষ্ণার কথা স্মরণ করে দুঃখ হল। সুব্রতের সঙ্গে ঠাট্টা পরিহাস করি বলে মেয়েটির দুঃখ না বোঝার মত পাষণ্ড আমি নই, তাই বললাম "বেচারী! সত্যি ভারী দুঃখের ব্যাপার।"

সুব্রত হাসল, "সত্যি। কিন্তু ব্যাপারটা বেশ গোলমেলে"—

"কি রকম?"

"কনে পছন্দ না হওয়ার মূলে কিন্তু কনে নয়।"

সবিস্ময়ে সপ্রশ্ন দৃষ্টি মেলে তাকালাম সুব্রতের দিকে।

সুব্রত মাথা নাড়ল, "হ্যাঁ, তার মূলে অন্য লোক"—

"কে ?"

"শোন—বল্‌ছি।"

সুব্রত খুলে বলল সব।

: গত পরশু দিনকার কথা। আমার এখান থেকে বাড়ী ফিরে গেল সুব্রত। চান খাওয়া সেরে সেদিন আর ছবি আঁকতে বসল না সে, শরীরটা অলস মনে হওয়ায় শুয়ে পড়ল। ঘুম ভাঙ্গতেই দেখল যে বেলা পড়ে এসেছে, পশ্চিমাকাশে সূর্য্য ঢলে পড়েছে। দিনান্তের সোনা-মাখানো পাণ্ডুর আলোর দিকে তাকিয়ে তার হঠাৎ মনে পড়ল যে আজ একদল লোক কৃষ্ণাকে দেখতে আসবে।

ঘুমের ঘোরটা কাটতেই সে বুঝল যে সেই সব লোকেরা নীচে এসে পৌছেছে, হয়তবা কনে দেখার পালাই এখন চলেছে।

"মা, মাগো"—

মায়ের কোন সাড়া না পেয়ে সুব্রত বুঝল যে কনে দেখার খেলা দেখতে তার মা-ও ছুটেছে। না যাওয়াটা অশোভন। পুরুষেরা এসব সামাজিকতা না মানলেও মেয়েরা মানে।

ঘুম থেকে উঠেই সুব্রতের চায়ের তেষ্টা পেল। মাকে ডাকাডাকি করে বিব্রত করতে আর ইচ্ছা হল না তার, তাই সে রাস্তার মোড়ে গিয়ে চা খাবার জন্য নিঃশব্দ পদে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল। নামবার সময় একটা চকিত দৃষ্টি বুলিয়ে সে দেখল যে বাইরের ঘরেই কনে দেখানোর বন্দোবস্ত হয়েছে। পুরো দমে চলেছে সেই পালা। কাচ্চা-বাচ্চারা সবাই ফর্সা জামা-কাপড় পরে দরজার সামনে ভীড় জমিয়েছে আর ভেতরে এক গাদা লোকের সামনে বসে কৃষ্ণা গান ধরেছে। সুব্রত তাকাল না সেদিকে। ভাবতে কেমন যেন কষ্ট হল তার।

বেচারী হয়ত তাকে দেখে লজ্জা পাবে। থাক বাবা। পা টিপে টিপে সে বাইরে বেরিয়ে গেল।

রাস্তা দিয়ে চলতে চলতে সে কৃষ্ণার গানের দু'একটা লাইন শুনতে পেল। চমৎকার একটি মীরার ভজন। শুনে কৃষ্ণাকে সে আরো একটু শ্রদ্ধা করতে শিখল। বাঃ, বেশ গায় তো মেয়েটি! সত্যি, গোকুল ভট্টাচার্য্যের বাহাদুরি আছে।

গলিটা গিয়ে যেখানে আর একটা বড় গলিতে পড়েছে সেখানে একটা ভদ্র চায়ের দোকান আছে। বেশী দূরে নয়, বাড়ী থেকে তিন চার মিনিটের ব্যাপার। সেই দোকানে গিয়েই দরজা ঘেঁষে বসল সুব্রত।

বসেই সে এপাশ-ওপাশ তাকাতে গিয়ে লক্ষ্য করল যে ঠিক তার পেছনে, তার পিঠে পিঠ লাগিয়ে বসে আছে গোকুল ভট্টাচার্য্য। চা খেতে খেতে নিম্নকণ্ঠে গল্প করছে একজন আধ-বয়সী ভদ্রলোকের সঙ্গে। ভদ্রলোকটির গোলগাল চেহারা, মাথায় কাঁচাপাকা চুল, বেশভূষা পরিচ্ছন্ন।

সুব্রতের কৌতূহল হল। কি বলছে গোকুল? কার সঙ্গে কোন্ ষড়যন্ত্র করছে? বয় এসে তার চাহিদার বিষয়ে প্রশ্ন করাতে সে শুধু ইঙ্গিতে চায়ের কথা জানাল। বয় চা আনতে গেল। কান খাড়া করে পেছনকার কথাবার্ত্তা শুনবার চেষ্টা করল সুব্রত।

প্রথমটা কিছু বুঝল না সে, গোকুল ভট্টাচার্য্য যেন ভদ্রলোকটির কানে কানে কথা বলছে। তারপরে সে হঠাৎ কয়েকটা কথা পরিষ্কার শুনতে পেল।

গোকুল বলল, "হ্যাঁ স্যার, আমি ঐ বাড়ীতেই থাকি। বিশ্বাস করুন, সব জানি, আমি যা বলছি তার একটি বর্ণও মিথ্যে নয়।"

ভদ্রলোকটিবলল, "তাএতোইত, সাংঘাতিক কথা।"

গোকুল সায় দিয়ে বলল, "ভদ্দরলোক, ভদ্দরলোকের ভাল চাই, তাই আপনাকে ডেকে এনে বললাম। আমরা সবাই যখন জানি যে মেয়েটার স্বভাব ভাল নয় তখন কেন আর ওখানে—বুঝেচেন না জেনে শুনে কুলে কালি লাগানো ভালো নয়।"

ভদ্রলোকটির কণ্ঠে কৃতজ্ঞতা ধ্বনিত হল, সে বলল, "যথার্থ বলেছেন। আচ্ছা, আমি তা'হ'লে উঠি, ওদের ডেকে বলিগে সব কথা তারপরে সরাসরি 'না' করে দিযে সরে পড়ি। উঃ, মা রক্ষা করেছেন আর আপনি একজন পরমাত্মীয়ের মত কাজ করেছেন। নমস্কার"—

"নমস্কার, কিন্তু একটি কথা"—

"বলুন"—

"মেয়ের বাপকে কিন্তু কোন কটু কথা বলবেন না। বুয়েচেন না, বাপের কি দোষ, হেঁ হেঁ"—

"তা তো নিশ্চয়ই। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন—আমি ভদ্রলোকের ছেলে।"

ভদ্রলোকটি চলে গেল। গোকুল উঠল না, নিঃশব্দে বসে বসে চা খেতে লাগল।

সুব্রত আর সহ্য করতে পারল না। গোকুল এবং ভদ্রলোকটির কথাবার্ত্তা থেকে সে পরিষ্কার বুঝল যে কৃষ্ণাকে যারা দেখতে এসেছে তারা আজ জেনে-যাবে যে সে দুশ্চরিত্রা এবং কনে পছন্দ হলেও তারা বলে যাবে যে পছন্দ হয়নি।

সে ঘুরে বলল, মৃদুকণ্ঠে ডাকল, "বলি ও গোকুলবাবু, শুনছেন"—

গোকুলের সারা শরীরে যেন একটা বৈদ্যুতিক তরঙ্গ প্রবাহিত হয়ে গেল, চমকে ত্বরিৎগতিতে সেও ঘুরে বসল, সুব্রতকে দেখে যেন একটু

আশ্বস্ত হবার উপক্রম করে বলল, "আপনি! সুব্রতবাবু! তা কখন এয়েছেন স্যার—ওরে বয়, এক কাপ চা এনে দেতো এই বাবুকে"—

বয় কিন্তু কয়েক সেকেণ্ড আগেই আমায় চা এনে দিয়েছিল, তাই কৃত্রিম বানিয়ের সুরে বললাম, "আমার আর চা লাগবে না গোকুলবাবু, ধন্যবাদ"—

আমার কাপের দিকে গোকুলের নজর পড়ল, সে অপ্রতিভের মত বলল, "ওঃ—তা, তা এই মাত্তর বুঝি এয়েচেন ?"

আমি ধীরে ধীরে মাথা নাড়লাম, "না। মিনিট কয়েক আগে এসেছি।

গোকুলের মুখ একটু বিবর্ণ হয়ে উঠল, "তাই নাকি ? তা বেশ—ছতা"—

সুব্রত প্রত্যেকটি কথার ওপর জোর দিয়ে পরিষ্কার করে বলল, "এবং আপনি যে কৃষ্ণার বিয়ে ভাঙ্‌চি দিয়ে ভেঙ্গে দিলেন তা আমি দেখতে পেলাম।"

গোকুলের মুখ এবার একেবারেই রক্তহীন হয়ে গেল, "ইয়ে, আপনার গিয়ে"—

"হ্যাঁ, ঐ ভদ্রলোককে যা যা বলেছেন তার প্রায় সমস্তটাই আমার কানে গেছে। কি করব, কানে তো আর দরজা থাকে না যে বন্ধ করে দেব, শুনতে পেলেও শুনব না !"

গোকুল প্রতিবাদ করার প্রাণপণ চেষ্টা করে বলল, "বাঃ, আপনার গে—আমি কোথায় কি বললাম"—

সুব্রত ক্ষেপে উঠল, "দেখুন গোকুলবাবু, একটা মেয়ের চরিত্র সম্বন্ধে অপবাদ দিয়ে তার বিয়ে ভাজিয়ে দেওয়ার পরও আপনি মিথ্যে কথা জোর করে বলবেন ? যদি বলেন তাহলে আমি একটি ঘুষিতে

আপনার মুখ থেঁৎলে দেব। ছি ছি ছি, এ আপনি কি করলেন বলুন তো? মেয়েটি তো আপনারই আত্মীয়া—"

গোকুল স্নুব্রতের দিকে তাকাল। সুব্রত দেখল যে তার দু'চোখ ছল ছল করছে।

গোকুল বলল, "আমার অন্যায় হয়ে গেছে—সত্যি বলছি—"

সুব্রত একটু ভাবল। এক্ষেত্রে তার কিকরা উচিত! সে নিজেকে এর মধ্যে বেশী জড়াবে কেন? যতটুকু সে গোকুলকে বলেছে তাই যথেষ্ট, ভবিষ্যতে তার আরো কিছু দুষ্ট-বুদ্ধির পরিচয় পেলেই না হয় তাকে শায়েস্তা করবে সে। আপাততঃ এই পর্যন্তই থাক।

সে বলল, "ভবিষ্যতে আর এমন অন্যায় কাজ করবেন না কিন্তু।"

গোকুল সবেগে মাথা নাড়ল, "আজ্ঞে না, মাইরি বলছি—মাইরি।"

সুব্রত উঠল।

"বসুন, আর এক কাপ চা খান—"

"না।"

সুব্রত পা বাড়াল, হঠাৎ গোকুল তার একটা হাত চেপে ধরল দু'হাত দিয়ে, মিনতিভরা কণ্ঠে বলল, "এসব কথা কাউকে বলবেন না সুব্রতবাবু, দোহাই আপনার পায়ে ধরছি—"

সুব্রত কুটিল হেসে বলল, "ওতে কোন ফল নেই গোকুলবাবু। মেয়েটির সর্বনাশ সাধনে আপনি যদি আর তৎপর না হন তাহলে আমিও আপনার কিছু ক্ষতি করব না।"

সুব্রত বাড়ী ফিরে গেল। গোকুল সেই চায়ের দোকানে শূন্য কাপটা সামনে নিয়ে পাথরের মত বসে রইল। অবশ্য পাথরের মত শুধু বাইরেই, ভেতরে তখন তার জ্বলন্ত অগ্নিস্রোত বয়ে যাচ্ছে।

বাড়ী ফিরতে ফিরতে সুব্রত কৃষ্ণার বিষয়ে আর না ভেবে পারলনা।

বেচারী। মেয়েটি ভারী দুঃখ ভোগ করেছে। কারো কোন ক্ষতি করেনি সে, দিনরাত সংসাবে মুখ বুজে খাটে, মাকে সাহায্য কার, ছোট ভাইবোনদের মানুষ করে—তবু তার কপালেই দুঃখ। গোকুলের, সে কোন ক্ষতি করেনি তবু তার লাভ হয় অপবাদ। চরিত্রে তার মালিন্যের ছায়াও দেখা যায় না তবু তার বিষয়ে কুৎসিত কাহিনী ছড়াল গোকুল। কেন? গোকুল অমন করে কেন?

দেখতে দেখতে বাকী দিন কেটে গেল। এদিক ওদিক ধাব করে টাকার ব্যবস্থাও করে ফেললাম কোনমতে। ভাবলাম যে সুব্রতেব দু'একটা ক্যানভাস বিক্রি হলে তা থেকেই ধারটা মিটিয়ে দেব।

চিত্র-প্রদর্শনীর দিনটি এল। বহু গণ্যমান্য লোককেই নেমন্তন্ন করা হয়েছিল। তাছাড়া কাগজে বিজ্ঞপ্তিও দেওযা হযেছিল। প্রবেশমূল্য ছিল না কোন। তাই নিমন্ত্রিত লোকেরা ছাড়াও বাইরের থেকে বহু লোক এল। সাত দিনের জন্য প্রদর্শনী খোলা থাকবে। প্রথম দিন দর্শকদের চোখে মুখে প্রশংসাই দেখতে পেলাম।

সুব্রত আড়ালে থাকত। সে যে একদিকে এত লাজুক তা আমাব ধারণাই ছিল না। প্রদর্শনীকক্ষটি বেশ বড় ছিল, একসঙ্গে একশো জন ধরে। তার পাশেই আর একটা ছোট কামরা ছিল, তাতেই বসে থাকত সুব্রত।

ছ'দিন কেটে গেল। এর মধ্যে দু'তিনটে কাগজে সুব্রতের ছবিব সমালোচনাও প্রকাশিত হল। একজন উদীয়মান ও শক্তিমান শিল্পী হিসেবে সে স্বীকৃতিও পেল। দর্শকেরা ছবি দেখতে দেখতে উচ্ছ্বসিত

প্রশংসা করতে লাগল। সেই সময় সুব্রতের মুখে যা রূপান্তর ঘটত তা দু' এক কথায় বর্ণনা করা যায় না। নিজের সৃষ্টির প্রশংসা শুনে যে মুখাকৃতি কেমন হয় তা একমাত্র অন্যান্য স্রষ্টারাই উপলব্ধি করতে পারে। দু' তিন দিন পর থেকে একটা দুটো ছবিও বিক্রি হতে লাগল। ছ'দিনের শেষে দেখা গেল যে সব মিলিয়ে গোটা তিনেক ক্যানভাস ও চার পাঁচটা স্কেচ্‌ বিক্রি হয়েছে, মোট আয় হয়েছে পাঁচশো পঁচিশ টাকা। প্রদর্শনীর খরচা বাবদ যে ধার করেছি তা শোধ করতে যাবে চারশো, বাকী টাকা সুব্রতের।

প্রদর্শনীর কথা যে এত বিস্তৃত করে বলছি তার একটা কারণ আছে। এই প্রদর্শনীতে একটা ছোট্ট ঘটনা ঘটেছিল, তাতে বুঝতে পেরেছিলাম যে সুব্রত যখন ভালবাসে তখন সে গভীরভাবেই ভালবাসে এবং যখন সে ঘৃণা করে তখন সে নির্ম্মমভাবেই ঘৃণা করে। প্রদর্শনীর শেষ দিনে সেই ঘটনাটি ঘটল।

ঘটনা আর কিছু নয়। শেষ দিনের সন্ধ্যে বেলায় প্রদর্শনীতে চার পাঁচজন ছাড়া আরো দর্শক ছিল। আমি ও সুব্রত একপাশে বসে চা খেতে খেতে গল্প করছিলাম।

হঠাৎ খিল্‌-খিল্‌ হাসির শব্দ শোনা গেল। দমকা হাওয়ার মত একদল অতি-আধুনিক ও অভিজাত যুবকযুবতী ভেতরে এল। তাদের দিকে তাকিয়ে মুগ্ধ হলাম। টাকা থাকলে মানুষ কত সুন্দর করেই-না সাজতে পারে! একটু ভালো করে তাকাতেই এবার অবাক্‌ হয়ে গেলাম। মৌমাছিদের মক্ষিরাণীর মত আগন্তুকদের মাঝখানে রয়েছে শিপ্রা।

কনুইয়ের গুঁতো দিয়ে সুব্রতকে বললাম, "দেখছ হে শিল্পীরাজ, তোমার পূর্ব্ব-জন্মের প্রেয়সী।"

সুব্রত আগেই দেখতে পেয়েছিল, সংক্ষিপ্তভাবে সে শুধু বলল, "হুঁ"—

তার দিকে তাকালাম। ইস্পাতের মত কঠিন হয়ে উঠেছে তার দেহ আর মুখ, দু'চোখের তারায় স্ফুলিঙ্গ-দীপ্তি দেখা দিয়েছে।

শিপ্রা কি সুব্রতকে দেখতে পেল? মনে হল না। কিন্তু আমি এটা স্পষ্ট বুঝতে পারলাম যে সুব্রতের দিকে না তাকিয়েও শিপ্রা তার উপস্থিতি টের পেয়েছে। তার অবজ্ঞাসূচক দৃষ্টিতে ছবি দেখা, হাসি, ইংরিজী কথা, বড় বড় বিদেশী শিল্পীদের নামোচ্চারণ থেকে পরিষ্কার বুঝতে পারলাম যে সে আজ জেনে শুনে, ইচ্ছে করেই এখানে এসেছে, ছবি দেখার ভান করে সুব্রতকে একটা নিঃশব্দ চ্যালেঞ্জ জানাতে এসেছে। উৎসুক হয়ে উঠলাম, ছোট্ট একটা নাটকীয় ঘটনা যে এখানে ঘটবেই তা নিশ্চিত জেনে গভীর আগ্রহের সঙ্গে অপেক্ষা করতে লাগলাম।

শিপ্রাবা ঘুরতে ঘুরতে একটা ল্যাণ্ডস্কেপের সামনে এসে থামল। বিরাট শালবনের প্রান্তে একটা ছোট্ট পুকুর, একটা দীর্ঘশৃঙ্গ হরিণ এসে সেই পুকুরের ধারে দাঁড়িয়ে আছে, জলের মধ্যে দৃশ্যমান তার প্রতিবিম্বকে দেখে তার গতি স্তব্ধ হয়ে গেছে, তার ডাগর ডাগর দুটো চোখের মাঝে দেখা দিয়েছে বিস্ময়। চমৎকার ছবিটা। তার নীচে লেখা ছিল—'ফর সেল', 'বিক্রয় করা হইবে—মূল্য দেড়শত টাকা।'

সকলের অস্ফুট গুঞ্জনধ্বনি শুনতে পেলাম।

হঠাৎ শিপ্রা বলল, "সত্যি, দিস্ ল্যাণ্ডস্কেপ সীম্‌স্ গুড। আমি—আমি এটা কিনব।"

সে ঘুরে দাঁড়িয়ে আমাদের দিকে তাকাল, নিঃশব্দে যেন আমাদের ডেকে ছবিটার দাম নিতে বলল।

সুব্রত এতক্ষণে উঠে দাঁড়াল, পকেট থেকে কলম বের করে এগিয়ে

গেল ছবিটার কাছে, 'ফর সেল'এর আগে লিখল 'নট' এবং বিক্রয় করা হইবে'র পরে লিখল 'না', তারপর 'মূল্য দেড়শত টাকা' একেবারে কেটে দিল।

ঘুরে দাঁড়িয়ে নিখুঁত ভদ্রতার সঙ্গে সে মৃদু হেসে বলল, "সরি, দি আর্টিস্ট্ হ্যাজ চেঞ্জড্ হিজ্ মাইণ্ড"—

শিপ্রার দু'চোখ জ্বলে উঠল, তার রঞ্জিত ঠোঁটের কোণে অপমানের পাল্টা জবাব দেবার জন্য একটা বাঁকা রেখা দেখা দিল, ঘাড় বেঁকিয়ে সে বলল, "কিন্তু হঠাৎ এ সিদ্ধান্ত হল কেন?"

সুব্রত বলল, "কারণ আছে বৈকি।

"কি কারণ?"

"আপনি কি তা শুনতে চান?"

"ইফ ইউ প্লীজ"—

সুব্রত হাসল, "তাহলে শুনুন। পৃথিবীতে এক জাতীয় লোক আছে যারা টাকার জন্যে সব কিছু পাবে। টাকার জন্য তারা হৃদয়কে ছেঁড়া কাগজের মত হাওয়ায় উড়িয়ে দেয়। আমি তাদের লোভ এবং গর্ব্বকে পছন্দ করি না, আমি তাদের বুঝিয়ে দিতে চাই যে টাকা দিয়ে পৃথিবীর অনেক কিছুই পাওয়া যায়, আবার পাওয়া যায়ও না।"

শিপ্রার সঙ্গীরা উত্তেজনায় চঞ্চল হয়ে উঠেছিল, তাদের মধ্যে একজন যুবক এবার সামনে এগিয়ে এল, চঞ্চলকণ্ঠে বলল, "আপনার কথাতে আমরা ঘোরতর আপত্তি জানাচ্ছি—আপনি আমাদের অপমান করছেন"—

সুব্রত আগের মতই হেসে বলল, "তাই মনে হচ্ছে বুঝি? আপনাদের যা ইচ্ছে তাই করতে পারেন, আমি তৈরী আছি"—

। মুহূর্ত্তে বহুরকমের উত্তেজিত মন্তব্যে ঘরটা ভরে উঠল

"আনকালচার্ড ব্রুট"—

"অসহ্য!"

"মাস্ট উই বিয়ার দিস্ ইন্‌সাল্ট?"

"আমরা দেখে নেব"—

"চল, বাড়ী চল শিপ্রা"—

"ওর শিক্ষার ব্যবস্থা আমরা করবই করব"—

শেষে ঝড়ের মত ওরা বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

সুব্রত পেছন পেছন গেল, গভীর ব্যঙ্গের সঙ্গে বলল, "গুড্ নাইট"-চার্মিং লেডিজ এ্যাণ্ড জেণ্টলমেন, গুড নাইট"—

কতকগুলো ইংরিজী গালিগালাজ শোনা গেল।

সুব্রত হেসে উঠল, আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "বুঝলে সম্পাদক—এতদিনে, এতদিনে তৃপ্ত হল প্রাণ" -

আমি বললাম, "ব্রাভো, ব্রাভো শিল্পীরাজ"—

প্রদর্শনী শেষ হয়ে গেল। তাতে সুব্রতের আথক লাভ না হলেও পারমার্থিক লাভ হল। সহরে নাম ছড়িয়ে গেল তার। যে সমস্ত কাগজের অফিস ও প্রকাশকদের আড্ডায় সে এতদিন ধরে যাতায়াত করছিল সেখানে সে এখন থেকে আরো বেশী খাতির পেতে লাগল। কিন্তু শ্রদ্ধা বা খাতিরে কাবু হবার ছেলে নয় সুব্রত। সে উত্তেজিত হয়ে উঠল প্রশংসা পেয়ে। সে যে ছবি আঁকছে, তার মধ্যে মানুষেরা যে দেখবার মত কিছু পাচ্ছে এই উপলব্ধি তাকে উদ্বুদ্ধ করে তুলল। আরো ভালো ছবি আঁকবার কামনায় সে এখন থেকে উঠে পড়ে লাগল।

প্রদর্শনী শেষ হবার পর দু'তিন দিন তার দেখা পেয়েছিলাম তারপর আবার প্রায় সাত আট দিন সে ডুব দিল। মাঝে একদিন তার বাড়ী গেলাম সন্ধ্যেবেলায়, শুনলাম যে সে নেই।

আমি যে খেয়ালী মানুষ তাতো গোড়াতেই সবিস্তারে বলেছি। আমার সেই খেয়ালীস্বভাব আমাকে একদিন রাস্তায় টেনে বের করল। তখন বিকেল। হাঁটতে হাঁটতে গড়ের মাঠের পাশ দিয়ে সোজা আউটরাম ঘাটে গিয়ে পৌছুলাম। একটা ভাসমান ডকের ওপর পায়চারী করতে করতে হঠাৎ সুব্রতকে আবিষ্কার করলাম। ঠিক সে, তার সেই পুরোনো খাকী ট্রাউজার, হাফসার্ট ও হ্যাভারস্যাক চিনতে আমার একটুও দেরী হল না। ডকের শেষপ্রান্তে বসে সে ছবি আঁকছিল।

নিঃশব্দে গিয়ে তার পাশে বসলাম।

সে আমাকে দেখে বলল, "সামনের দিকে তাকিয়ে দেখ সম্পাদক—"

দেখলাম। সন্ধ্যে হয়ে আসছে। কলকল শব্দ তুলে গঙ্গা প্রবাহিত হচ্ছে, তার ওপর নাচছে অসংখ্য ডিঙ্গি আর নৌকো, ভাসমান পাহাড়ের মত দুলছে জাহাজগুলো এবং তাদের পেছনে, নদীর পরপারে সূর্য অস্তে যাচ্ছে। রক্তবর্ণ আলোক-সমারোহে সব কিছু আলোকিত হয়ে উঠেছে, একটা জাহাজের মাস্তলের পেছনে দেখা যাচ্ছে ঘোর লাল মেঘস্তূপ—যেন মাস্তলটাতে আগুন লেগেছে। এবং এই ছবিকেই স্কেচ করার চেষ্টা করছে সুব্রত।

সুব্রত বলল, "গ্লোরিয়াস, তাই না?"

মাথা নেড়ে বললাম, "তুমি প্রকৃতির প্রেমে মশগুল দেখতে পাচ্ছি!"

সে গম্ভীরভাবে বলল, "তাতে ক্ষতি কি? প্রকৃতি তোমাদের

জগতের মেয়েদের চেয়ে ঢের ভালো। সে চায়ও না, দেবার ভাণও করে না, সুতরাং ফাঁকিও দেয় না। তার সঙ্গে প্রেমে পড়াই তো ভাল।”

আমিও সিরিয়াস হয়ে উঠলাম সুব্রতের কথায়, বললাম, “কিন্তু প্রকৃতির তো হৃদয় বলে বালাই নেই, তুমি কোন মেয়েকে ভালবাসো সুব্রত—তোমার শক্তি আরো বিকশিত হবে। তাছাড়া মেয়েরাও তো মূর্ত্তিমতী প্রকৃতি।”

সে মাথা নাড়ল, “না। তার দরকার নেই। আমি প্রকৃতির সঙ্গে প্রেমে পড়েছি বললে একটু ভুল হবে। আমি আমার জীবনের সঙ্গে প্রেমে পড়েছি—প্রকৃতি তাতে একটা ব্যাকগ্রাউণ্ড্‌।”—

হারলাম না, বললাম, “মাঝে মাঝে জীবন কিন্তু নারীর রূপ ধরেও আসে।”

সে হেসে বলল, “তখন কষ্টিপাথরে যাচাই করে দেখে নেব, অস্বীকার করব না।”

হেসে থেমে গেলাম। বুঝতে পারলাম যে কাজ চলছে, সমস্ত কিছুর অলক্ষ্যে, সুব্রতের নিজেরও অজ্ঞাতে, তার জীবন তাকে বদ্‌লাচ্ছে, তাকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। শিপ্রাকে নিয়ে তার মনে যে আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল তা শান্ত হয়ে গেছে, তাতে যে ক্ষত সৃষ্টি হয়েছিল তার মনে তা সেরে গেছে, তার মনের অস্থিরতা এখন কমে এসেছে। মনের মানসীকে সে আবার মর্ত্ত্যের মাটিতে খুঁজছে, আমার ভাববার কিছু নেই।

পাঁচ

তারপরে প্রায় মাসখানেক কাটল। শীত শেষ হয়ে বসন্ত এল!

সেদিন দুপুরে কাজ ছিল না, চুপচাপ বসে একটা ইংরিজী বই পড়ছিলাম। বাইরে বসন্তের উতলা বাতাসে ধূলো উড়ছে, খাঁ খাঁ রোদ্দুরে ঝলসাচ্ছে সব কিছু। মনটা উদাস হয়ে উঠছিল, বই পড়ছিলাম বটে কিন্তু বিশেষ ভাল লাগছিল না।

হঠাৎ সুব্রত এল।

নানা কথাবার্তার পর সে বলল, "একটা কথা আছে—"

বললাম, "নির্ভয়ে বলতে পার তা।"

সে বলল, "তোমার জানাশোনা কোন ব্রাহ্মণ পাত্র থাকলে একটু চেষ্টা করতে হবে।"

বিস্ময়ে হতবাক্ হলাম, "মানে? কার জন্যে চেষ্টা করতে হবে?"

"একটি পাত্রীর জন্য।"

"পাত্রীটি কে?"

"একটি মেয়ে।"

চটে গেলাম, "বললাম, ইয়ার্কি করোনা, পাত্রী বলতে যে ছেলে বোঝায় না তা আমার সবিশেষ জানা আছে। আসল কথাটি খুলে বল দেখি—মেয়েটি কে?"

সুব্রত হাসল, "মেয়েটিকে তুমি দেখেছ, আমাদের নীচের ভাড়াটে ভোলানাথ বাবুর মেয়ে কৃষ্ণা।"

"বটে!"

"হ্যাঁ, মেয়েটির যে বিয়ে হচ্ছে না তা তো জানোই, গোকুল মাষ্টার কিভাবে তার সম্বন্ধগুলো ভেস্তে দেয় সে কথাও বলেছি তোমাকে। অথচ মেয়েটি মন্দ নয়, বিয়ে না হওয়ার জন্য তার কোন দোষ নেই। তবু তাকে নিঃশব্দে নির্য্যাতন সহ্য করতে হয় ভাবলে সত্যি বড় দুঃখ হয়।"

মাথা নেড়ে বললাম, "সত্যি দুঃখের কথা। কিন্তু উপায় কি বল, সমাজ এবং রাষ্ট্রকে ভেঙ্গে না বদলালে এর কোন সমাধানের পথ নেই।"

সে আমার দিকে স্থিরভাবে তাকাল, "তুমি চেষ্টা করতে পারবে না?"

তার কণ্ঠস্বরে এমন একটা প্রচ্ছন্ন আবেগ ও আবেদন ছিল যে আমি সরাসরি 'না' বলতে পারলাম না, ধীরে ধীরে বললাম, "চেষ্টা করব।" পরমুহূর্ত্তেই একটা ঠাট্টা করার জন্য জিভটা নেচে উঠল, বললাম, "কিন্তু সুব্রত, তোমার লক্ষণ তো ভাল নয়।

সুব্রত চমকে উঠল, হঠাৎ যেন চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়ে গেছে এমনি একটা ভাবই ফুটে উঠল তার মুখে। সে প্রশ্ন করল, "কিসের লক্ষণ?"

"চিত্রাঙ্কণ থেকে শেষে ঘটকালিতে নামলে?"

সে উঠে দাঁড়াল, তার পুরোনো ভঙ্গীতে বলল, "সম্পাদক, তুমি একটি জঘন্য জন্তু"—

বলেই সে গটগট করে সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

সে বেরিয়ে গেল, আমার ভাবনা সুরু হল। ব্যাপার কি? সুব্রতের মত খেয়ালী শিল্পী হঠাৎ পরের মেয়ের জন্য এতটা চিন্তিত হয়ে উঠল কি করে? তার মানেটা কি? এই এক মাসে সুব্রত এত বদলাল কেন?

সেদিন ভেবে কোন কূল-কিনারা করতে পারিনি, পরে সব কিছু জানতে পেরেছিলাম। যা জানতে পেরেছিলাম তা ইচ্ছেমত ভেঙ্গে ভেঙ্গে এবার বলছি, বলছি কি কারণে সুব্রত এসে হঠাৎ আমাকে পাত্রান্বেষণের জন্য অনুরোধ করল।

দিন কাটছিল। সুখে দুঃখে।

বৌবাজার এলাকার এই সঙ্কীর্ণ গলির মধ্যবর্ত্তী বাড়ীটাতে জীবনের ধারা ঠিকই প্রবাহিত হচ্ছিল। বসন্তকালে কোকিলের ডাক মাঝে মাঝে এখানেও পৌছে সবাইকে অবাক আর আকুল করে তুলেছিল। ওপরে আর নীচে জীবনের দু'টি ধারা একই ভাবে বয়ে চলেছে। সেই নির্ব্বিকার, নিঃশব্দ গুরুপদ বাবু, তাঁর ছেলেমেয়েরা, সেই খিটখিটে সন্দিগ্ধমনা ভোলানাথ বাবু, সেই দুষ্টবুদ্ধি গোকুল—কেউ বদলায়নি।

কিন্তু ধীরে ধীরে প্রেমের কাহিনীটা জমে উঠছিল। কাহিনীর নায়ক-নায়িকারা কিন্তু তার জন্য একটুও তৈরী ছিল না, সে বিষয়ে তারা একটুও ভাবতে পারে নি। পদ্মার অদৃশ্য স্রোতের মত তাদের সাধারণ জীবনের তলা দিয়ে তা তখন সকল বাধাকেই কেটে ধুয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। প্রথমে তারা তা একটুও বুঝতে পারে নি।

ইতিমধ্যে কিন্তু ওপরের আর নীচের মেয়েদের মধ্যে একটা গভীর হৃদ্যতার সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। ভোলানাথ বাবু এবং গোকুলের সন্ধানী চোখ তো সর্ব্বসময়েই বাড়ীতে থাকে না, সেই ফাঁকে কৃষ্ণাও ওপরে যায়, গল্প-গুজব করে। এমনি ভাবেই চলছিল।

আর সুব্রতের দিনও হাল্কাভাবেই কাটছিল। কাজকর্ম্ম তার

বাড়বার উপক্রম করল প্রদর্শনীর পর থেকে, কিন্তু তার ভালো লাগত না। যতটা দরকার তার বেশী চাইত না তার মন। সে ভাবত যে টাকাকড়ি লুণ্ঠন করার দিন সে পরেও পাবে কিন্তু পথে ঘাটে, এদিকে ওদিকে অজস্র ছবির ঐশ্বর্য্য কুড়োবার মত লোভী মনটা বেশী দিন থাকবে না, টাকার লোভে সেই সব ছবিকে উপেক্ষা করলে তা মরে যাবে, ফলে শিল্পীরও অপমৃত্যু ঘটবে।

কাজ করা, ঘুরে বেড়ানো, খাওয়া আর ঘুমোন—এই হচ্ছে সুব্রতের বর্ত্তমান নিত্য-কর্ম্মসূচী। রাতের বেলা খুব আরাম করে কাজ করে সে, শক্তিশালী আলোর ব্যবস্থা করেছে, সেটা জ্বেলে সে ছবি আঁকে। একটু রাত হলেই বাড়ীটা নিঝুম হয়, সহরটা শান্ত হয়, মনের মধ্যে একটা আমেজ ঘনায়। নিশুতি রাতের পুকুরে মাঝে মাঝে মাছেরা যে শব্দ তোলে তাতে নিঃশব্দতা ব্যাহত হয় না, তেমনি মাঝে মাঝে গলির ভেতর থেকে দু'একটা মাতালের হল্লা শোনা যায়, তাতে সুব্রতের কোন ক্ষতিই হয় না। আর দক্ষিণের জানালা দিয়ে আসে দূর সমুদ্রের হাওয়া, নক্ষত্রাবৃত আকাশের টুকরো দেখা যায়, দেখা যায় বড় বড় অট্টালিকাশীর্ষ আর রাজপথের আলোক-সমারোহের একটা উর্দ্ধমুখী আভা। বেশ লাগে ছবি আঁকতে।

কিন্তু দিনের বেলাটা একটু বাধা পায় সে। মাঝে মাঝে ছায়া অমু, বিশু এবং গুরুপদবাবুর মেয়ে আন্না এসে আবোল-তাবোল কথা বলে, ছবি নেওয়ার জন্য আবদার করে, নিজেরা ছবি এঁকে নিয়ে আসে, ছবি দেখতে চায়। সুব্রত হাসিমুখে তাদের উপদ্রব সহ্য করে। তাদের সঙ্গে খেলতে মন্দ লাগে না তার। আর আসে কৃষ্ণা। সে উঁকি মারে না বা বাচ্চাদের মত হল্লা করে না, সুব্রতের একাগ্রতা নষ্ট হয় এমন কোন কিছুই সে করতে রাজী নয়। নিঃশব্দপদে সে

সরাসরি ভেতরে এসে দাঁড়ায়, অনেক সময় সুব্রত জানতেই পারে না।

সেদিন। বিকেলের দিকে।

অনেকক্ষণ কাজ করতে করতে সুব্রত হঠাৎ ঘুরে দাঁড়াল, দেখল যে পেছনের এক কোণে কৃষ্ণা চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। সুব্রত অবাক হয়ে গেল।

সে সহাস্যে বলল, "বাঃ, কখন এলে ?"

সলজ্জ হাসিতে কৃষ্ণার মুখ ভরে উঠল, সে জবাব দিল, "এই খানিকক্ষণ হলো।"

"জানতে পারিনি তো ? তুমি কি হাওয়ায় ভেসে এলে ?"

কৃষ্ণা মাথা নাড়ল, "তা কেন, আপনি যা ডুবে থাকেন ছবির মধ্যে, উঃ—শব্দ করতে ভয় লাগে"—

কৃষ্ণার কথা শুনে সুব্রত একটু অহঙ্কার বোধ করল। যাক্, তাহলে সে সত্যি মনপ্রাণ দিয়ে ছবি আঁকার চেষ্টা করে!

সে হাসল, "বেশ বেশ, এবার বোস"—

কৃষ্ণা বসল।

সুব্রত আবার ছবি আঁকতে সুরু করল। কৃষ্ণা নিঃশব্দে দেখতে লাগল তা।

হঠাৎ সে এক সময়ে বলল, "আচ্ছা সুব্রতদা"—

"হ্যাঁ ?"

"একটা কথা জিজ্ঞেস করব।"

"কর।"

"একদিন আপনি—ইয়ে—হেদোর ধারে দাঁড়িয়ে ছবি বিক্রী করছিলেন, তাই না ?"

সুব্রত হেসে উঠল, "বটে! তোমার তা এখনো মনে আছে?"

"আছে।"

"হ্যাঁ, বিক্রী করেছিলাম। তা মন্দ হয়নি, একদিনেই সাত-আট টাকা লাভ হয়েছিল। ক্যানভাসিং জানা থাকলে আরো বেশী বিক্রী হত।"

কৃষ্ণা হাসল, "আপনি বাহাদুর লোক।"

সুব্রত বলল, "এ আর এমন কি কৃষ্ণা? অভাবটা তেমনি থাকলে আরো অনেক বেশী বাহাদুরি দেখাতে পারতাম।"

"আচ্ছা, আপনি যে কোন জিনিষের ছবি আঁকতে পারেন সুব্রতদা?" অর্থহীন একটা প্রশ্ন করল কৃষ্ণা।

"জানিনা, তবে চেষ্টা করলে হয়ত পারব।"

"হুঁ"—

ঠিক সেই সময়েই নীচের তলা থেকে ডাক এল।

"কৃষ্ণা—কৃষ্ণা"—

গোকুলের গলা।

পাশের ঘর থেকে ইন্দুমতী ডেকে বললেন, "ওমা কৃষ্ণা, তোকে নীচে ডাকছে"—

"যাচ্ছি মাসীমা।" সুব্রতের দিকে তাকিয়ে কৃষ্ণা বলল, "যাই, গোকুলদা হাঁকডাক লাগিয়ে দিয়েছে।"

সুব্রত হাসল, "যাও, গোকুলদা' গুণী লোক, তাকে চটিও না।"

কৃষ্ণা বেরিয়ে যাচ্ছিল, চকিতে একবার মুখ ফিরিয়েই সে দ্রুতপদে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। দেখা গেল যে কৃষ্ণার মুখে লজ্জার আভাস। সুব্রত বুঝতে পারল না কেন।

নীচে নামতে নামতে কৃষ্ণাও ভেবে পেল না, যে সুব্রতের কথার মধ্যে কি অর্থ আছে। গোকুলদা গানের মাস্টারী করে, সেই বিষয়েই কি ইঙ্গিত দিল সুব্রত যে গোকুলদা চটলে তারই ক্ষতি? উহুঁ, তা নয়। আরো কিছু অর্থ আছে। গোকুলদা'র পাহারা দেওয়া, অনবরত তার খোঁজ করা, সে ছাড়া দুনিয়া শুদ্ধু সবাই যে খারাপ তা প্রমাণ করা এবং গান শেখাবার ঘটা দেখে প্রায়ই কৃষ্ণার যে সন্দেহ হয় সুব্রত বোধ হয় তারি আঁচ পেয়েছে।

গোকুল তাকে দেখেই গম্ভীর হ'য়ে গেল, কালো মুখটা তার ঘোরতর কালো হয়ে উঠল, সে বলল, "কোথায় ছিলে কৃষ্ণা?"

কৃষ্ণা জবাব দিল, "ওপরে।"

"ওপরে! ওঃ"—গোকুল কৃষ্ণার দিকে তাকাল, কেমন যেন অদ্ভুত তার চাউনীটা। পরমুহূর্ত্তেই সে শুকনো হাসি হেসে বলল, "তা বেশ, বেশ।"

"কি জন্যে ডাকছিলে গোকুলদা?" কৃষ্ণা বিরক্ত হয়ে উঠল। বাঃ, এলোপাথাড়ি এই সব কথা বলার জন্যেই বুঝি গোকুলদা ডেকেছে!

গোকুল বলল, "বাইরে থেকে এসে ভারী তেষ্টা পেয়ে গেল কৃষ্ণা, তাই এক গেলাস জল চাইছিলাম"—

মনে মনে কৃষ্ণা ক্ষেপে গেল, তবু সে শান্তকণ্ঠে বলল, "বাচ্চাদের কাউকে ডাকলেই তো পারতে।"

গোকুল অপরাধীর মত বলল, "যাকগে ডেকে ফেলেছি যখন"—

কৃষ্ণা বলল, "দাঁড়াও এনে দিচ্ছি।"

কৃষ্ণা জল আনতে গেল। গোকুল ওপরের দিকে একটা অগ্নিবর্ষী দৃষ্টি ফেলে মনে মনে বলল, ধীরে মন, ধীরে, ভোলানাথবাবু ফিরে আসা পর্য্যন্ত অপেক্ষা কর।

সেদিন সন্ধ্যেবেলায় গোকুল টিউশানী কামাই করল। ভোলানাথ-বাবু যখন চা জল-খাবার খেয়ে একটা বিড়ি ফুঁকতে ফুঁকতে জিরোতে বসেছেন তখন সে সুকৌশলে কৃষ্ণার কথা উত্থাপন করল। সে জানাল যে নিতান্ত কর্ত্তব্যবোধেই তাকে সব কথা জানাতে হচ্ছে। কৃষ্ণার বিষয়টা আর উপেক্ষণীয় নয়। তার বিয়ের সম্বন্ধ ভেঙ্গে যায়, অথচ তার বিবাহযোগ্য বয়স, বিয়ে না দিলেই নয়। পাড়ার লোকেরাও কটাক্ষপাত করে। এই রকম যখন অবস্থা তখন কি কৃষ্ণার একটু সতর্ক হওয়া উচিত নয়? মানে তখন কি তার পিতার আদেশ অমান্য করে ওপরের সুব্রতবাবু নামক ছোকরা'র কামরায় যাওয়া এবং গল্প-গুজব করা উচিত?

সব শুনে ভোলানাথবাবু বললেন, "হুঁ"—ঐ একটি শব্দ দিয়েই তিনি তাঁর মনের সমস্ত জটিল ভাবকে প্রকাশ করলেন।

গোকুল বুঝল যে এবার তার নির্ব্বাক হওয়ার পালা।

ভোলানাথবাবু কয়েক মিনিট চুপ করে রইলেন, তারপরে হুঙ্কার ছাড়লেন, "কৃষ্ণা"—

কৃষ্ণা এল। পরবর্ত্তী ইতিহাস পুরোণো। অশ্রান্ত তিরস্কারের পালা। নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বাপের সমস্ত গালিগালাজ শুনতে লাগল কৃষ্ণা। গোকুল মাঝে মাঝে ভালো মানুষের মত 'থাক্ কাকাবাবু,

থাক্ কাকাবাবু' করতে লাগল বটে কিন্তু তাতে যে কোন আন্তরিকতা ছিল না তা কৃষ্ণা বুঝতে পারল। কটু তিরস্কারের সঙ্গে যোগমায়া ছুটে এলেন, অন্যান্য ছেলেমেয়েরা এসে মায়ের পেছনে দাঁড়াল। ভোলানাথ-বাবু তখন যোগমায়াকেও রেহাই দিলেন না। কিন্তু তিরস্কৃতের দল একটিও কথা বলল না, শুধু রাগে, দুঃখে, লজ্জায় ও অপমানে তাদের জলে-ওঠা চোখের ওপর জলের আস্তরণ দেখা দিল। একটাও কথা বলল না তারা, শুধু বিদ্রোহের পতাকাটা তাদের হৃদয়াকাশে পৎ পৎ করে উড়তে লাগল।

সুব্রত তখন বাড়ী ছিল না। থাকলে যে তার মনের ভাব সেই মুহূর্তে কি হত তা আমার জানা নেই। কিন্তু ঘণ্টা তিনেক পর সে বাড়ী ফিরেছিল। তখন বাড়ীতে নিঃশব্দতা ফিরে এসেছে, খাওয়া-দাওয়ার পাট চুকে গেছে, বাচ্চারাও শুয়ে পড়েছে। ভেতরে ঢুকেই সে সিঁড়ির মুখে থমকে দাঁড়াল। হারমোনিয়াম সহযোগে গোকুল ভট্টাচার্য্য নিজের ঘরে গান গাইছে। সুরটা কি তা সে বুঝতে পারল না, কিন্তু গানের কথাগুলো সে ঠিকই বুঝতে পারল। গোকুল গাইছিল—

"জানি পাবোনা তোমারে পাবোনা,
তবু যে বুঝিনা, শুনিনা, মানিনা,
মিছে ভাবি তব ভাবনা।
আমার জীবন-মরুতে যে তুমি,
মরীচিকা মায়া-বনভূমি,
যত ছুটি হায় পিয়াস মিটাতে
মেটে না মনের বাসনা।"

সুব্রত আকৃষ্ট হল, মনে মনে সে প্রশংসা না করে পারল না

কুৎসিৎ গোকুল ভট্টাচার্য্যের কুৎসিৎ অন্তরকে সে জানে, তবু সে মুগ্ধ হল। লোকটা যেন কাউকে গভীর দরদের সঙ্গে গান শোনাচ্ছে। গলা ভালো গোকুলের, বেশ ভরাট ও ভারী গলা, আবেগে তা সেতারের তারের মত থরথর করে কাঁপছে। তার হৃদয়ের এক গভীর স্তর থেকে যেন গানের কথাগুলো বেরিয়ে আসছে, আকুল ও জ্বালাময় একটা বিলাপের মত। কান্নার মত।

তার ঘরে আসা এবং তার সঙ্গে কথা বলার জন্য যে কৃষ্ণা বাপের কাছে তিরস্কৃত হয় সে কথা সুব্রত তখনো জানতে পারেনি।

আর একটা ঘটনাও সে আগে জানতে পারল না।

ভোলানাথবাবু মেয়ের জন্য চিন্তিত ও মরিয়া হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর শত্রুরা অবশ্য বলবে যে তিনি তাঁর বোঝা পার করার জন্য ক্ষেপে উঠেছিলেন। আগের সম্বন্ধটি ভেঙে যাওয়ার পেছনে যে আসল ইতিহাস কি তা তো জানা ছিল না তাঁর। তিনি ভাবলেন যে মেয়ের দোষ। তাঁর মেয়ে দেখতে কুৎসিৎ, লোকের মনে ওঠে না। আবার যেখানে মনে ওঠে সেখানে টাকার দরকার হয়। এমনিভাবে দিনের পর দিন কাটলে তো আর দেখতে হয় না। না, এবার তিনি একটা হেস্ত-নেস্ত করে ফেলবেন।

একদিন অফিসে একটা খবর পেলেন তিনি। তাঁর সহকর্মী প্রসন্নবাবু একদিন জানালেন যে তাঁদের বড়বাবু ঘনশ্যাম চক্রবর্ত্তী শিগ্‌গীরই দার-পরিগ্রহ করবেন। এই বুড়ো বয়সে তাঁর গিন্নী কিছুদিন আগে মারা গেছেন। এক গাদা কাচ্চাবাচ্চা নিয়ে ঘনশ্যামবাবু

বিপদ-সমুদ্রে হাবুডুবু খাচ্ছেন। স্ত্রী-শোকে তিনি যে একটু বৈরাগ্যের দিকে ঝুঁকবেন তারও উপায় নেই, বাধ্য হয়ে তাঁকে আবার বিয়ে করতেই হবে এবং সেজন্য তিনি পাত্রী খুঁজছেন। বেশ ডাগর-ডোগর একটি মেয়ে চাই।

ভোলানাথবাবু কিছু বললেন না, শুধু চুপ করে শুনে গেলেন সব কথা। অফিস শেষ হলে সবাই চলে গেল কিন্তু তিনি গেলেন না, বড়বাবুর কাছে গিয়ে হাজির হলেন।

ঘনশ্যাম প্রশ্ন করলেন, "কি ব্যাপার ভোলানাথবাবু?"

"আজ্ঞে, একটি নিবেদন আছে।"

"বলুন।"

"খোলাখুলি বলব?"

"বাঃ, বলুন না"—

ভোলানাথবাবু যুক্তকরে বললেন, "আজ্ঞে অপরাধ নেবেন না—শুনলাম আপনি দ্বিতীয়বার দার-পরিগ্রহ করবেন?"

ঘনশ্যাম জিভ বের করলেন, পরম লজ্জাভরে বললেন, "ছি ছি ছি, কে এসব কথা বললে আপনাকে? না না, এই বুড়ো বয়সে আর—নাঃ, ভগবান যা করেন তা মঙ্গলের জন্যই করেন ভোলানাথবাবু।"

ভোলানাথবাবু একটু দমে গেলেন। কয়েক সেকেণ্ড নিঃশব্দে থেকে তিনি চলে যাবার উদ্যোগ করতে লাগলেন।

ঠিক সেই মুহূর্তে ঘনশ্যাম ডাকলেন, "ভোলানাথবাবু, শুনুন"—

"বলুন"—

"তা কি আর করি বলুন—একটি স্ত্রীলোক ছাড়া-তো সংসার চলে না। আপনাদের আশীর্ব্বাদে যা কামিয়েছি তা কে ভোগ করবে? ছেলেমেয়েদের কে মানুষ করবে?"

"আজ্ঞে তাই তো"—ভোলানাথ অকূলে কূল পেলেন।

"তা মেয়েটি কে?" ঘনশ্যাম স্বর নামালেন।

"আজ্ঞে আমার মেয়ে—কৃষ্ণা, বছর কুড়ি-একুশ বয়স"—

"কৃষ্ণা! বটে! তা কবে দেখতে যাব?"

"আজ্ঞে, সামনের রবিবারেই চলুন।"

"তা বেশ, তাই যাব'খন। কিন্তু বুঝলেন, কথাটা যেন"—

ভোলানাথবাবু সবেগে মাথা নাড়লেন, "আজ্ঞে না।"

অফিসের বড়বাবু। কেবল বয়সটা একটু বেশী এই যা। তাতে ক্ষতি কি? মেয়ের খাবার পরবার অভাব হবে না, তা ছাড়া বড়বাবুকে জামাই হিসেবে পেলে ভোলানাথবাবুরও ভবিষ্যৎটা খারাপ হবে না। ঠিক আছে, সর্ব্বনাশে সমুৎপন্নে অর্দ্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ, ঘনশ্যামের সঙ্গেই কৃষ্ণার বিয়ে দেবেন তিনি।

যোগমায়া আপত্তি তুললেন।

তিনি বললেন, "বুড়োর সঙ্গে বিয়ে দেবে—জেনে-শুনে সর্ব্বনাশ করবে মেয়েটার?"

ভোলানাথবাবু দাঁত খিঁচিয়ে উঠলেন, "বিয়ে হওয়াটা বুঝি সর্ব্বনাশ? বাঃ, বলিহারী যাই বাবা। যাও, যাও, নিজের চরকায় তেল দাও গে যাও"—

কৃষ্ণাও শুনল একথা। শুনে সে বারুদের মত জ্বলে উঠল।

মাকে সে বলল, "সময় থাকতে তোমাকে বলছি মা, এমনভাবে আমাকে বিকিয়ে দেবার চেষ্টা যেন বাবা না করেন।

যোগমায়া আবার গেলেন স্বামীর কাছে, বললেন, "কথাটা আবার ভেবে দেখ গো। মেয়েরও কিন্তু এসব বিষয়ে ভয়ঙ্কর আপত্তি।

ভোলানাথবাবু কুৎসিৎ মুখভঙ্গী করলেন, "মেয়ে আপত্তি করছে! বেশ, তাকে বাড়ী থেকে বেরিয়ে গিয়ে স্বাধীন জেনানা হতে বল। আমার এখানে থাকতে হলে কিন্তু আমার কথাটিই শুনতে হবে, বুঝলে? আর চারদিন বাদে রোববার, সেদিনই ওকে দেখতে আসবে কিন্তু— যা ঠিক করার তা যেন তার আগেই হয়ে যায়।"

যোগমায়া চুপ করে রইলেন। তাঁরই হলো সাংঘাতিক বিপদ। তিনি মেয়ের দুঃখ বোঝেন অথচ কিছুই তাঁর করবার নেই।

এই খবর শুনে গোকুল ভট্টাচার্য্য পর্য্যন্ত মুষড়ে পড়ল। আড়ালে সম্বন্ধ ভেঙ্গে দেওয়ার পথটা তার একটুখানি অসাবধানতার ফলে বন্ধ হয়ে গেছে। অথচ একটা কিছু তো করতে হবে।

গান শেখাবার সময় সে কথাটা পাড়ল।

"শোন কৃষ্ণা"—

"কি?"

"এ কাকাবাবুর ভীষণ অন্যায়।"

"কি অন্যায়?"

"একজন বুড়োর সঙ্গে – বাঃ" —

কৃষ্ণা বিচলিত হল না, মৃদু হেসে বলল, "তা আর কি হবে? একটা ছোকরা বর যখন পাওয়া যাচ্ছে না তখন বুড়োই সই"—

"না।"

"কেন?"

"তোমার সঙ্গে কি বুড়োকে মানায়?"

কৃষ্ণা হাসল। গোকুলদা হঠাৎ বড্ড বেশী দরদ দেখাচ্ছে!

সে মুচকী হেসে বললে, "কেন, মানায় না কেন?"

গোকুল ম্লান হেসে বললে, "তুমি যে সুন্দর"—

কৃষ্ণার ঠোঁটের কোণে নিঃশব্দ ব্যঙ্গ দেখা দিল। সে সুন্দর! গোকুলদা'টা একটা জানোয়ার।

গোকুল এবার মন্ত্রণা দিল, বলল, "এই বুড়োকে কিছুতেই বিয়ে করতে রাজী হয়োনা কৃষ্ণা, বুঝলে?" গোকুলের গলার মধ্যে যেন একটা আকুল প্রার্থনা ধ্বনিত হল, "বুড়ো শালাকে বিয়ে করবে কেন? ছি"—

সেখানেই সে থামল না, ভোলানাথবাবুকেও গিয়ে প্রকারান্তরে কথাটা জানিয়েছিল।

ভোলানাথবাবু এতদিনে গোকুলের ওপর ক্ষেপলেন, চিবিয়ে চিবিয়ে তিনি বললেন, "বলি গোকুলবাবুর কাছে কি আমি বুদ্ধি ধার চেয়েছি নাকি হে? এঁ্যা? বলি আমি কৃষ্ণার বাপ না তুমি?"

গোকুল সেখান থেকে বাইরে পালিয়ে গেল, এলোমেলো খানিকটা ঘোরাঘুরি করে একটা চায়ের দোকানে গিয়ে সে অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে রইল।

নীচের তলায় যে একটা দুর্যোগ আসন্ন তা সুব্রত জানত না। প্রতিদিনকার মত সে সেদিনও দুপুরে ছবি আঁকছিল।

হঠাৎ দরজার গোড়ায় এসে কৃষ্ণা দাঁড়াল। সুব্রত টের পেল না। কৃষ্ণা কিছুক্ষণ নিঃশব্দে অপেক্ষা করল। কিন্তু উহুঁ, সুব্রত গভীর মনোযোগের সঙ্গে ছবি আঁকছে, একঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকলেও হয়ত সে তাকে দেখতেই পাবে না।

সে ডাকল "সুব্রতদা—"

সুব্রত চমকে ঘুরে তাকাল, "এই যে কৃষ্ণা ! এসো। এতক্ষণে আমার ষ্টুডিও ঘরের ষোলকলা পূর্ণ হল।"

"মানে ?"

"মানে তুমি যেন আজকাল আমার ঘরেরই একটি অঙ্গ হয়ে গেছ।"

কৃষ্ণার মুখ চোখ লজ্জায় একেবারে কালো হয়ে উঠল। তার সেই লজ্জার অস্ফুট ছায়াকে দেখে সুব্রত একটু অবাক হয়ে ভাবতেই আবার নিজেও লজ্জা পেল।

লঘুকণ্ঠে সে বলল, "দূর ছাই, কি বলতে কি যে বলে ফেলি, দুর।"

কৃষ্ণা কথাটা ঘোরাবার জন্য তাড়াতাড়ি বলল, "আপনি ভারী স্বার্থপর সুব্রতদা"—

"কেন ?"

"ছবি আঁকার সময় আর আপনার খেয়ালই থাকে না যে ঘরের ভেতর একজন লোক এসে দাঁড়িয়েছে ছবি দেখতে"—

"বেশ তো, ছবি দেখ।"

"রাগ করলেন ?"

সুব্রত বিব্রত হল, "না, না, রাগ করব কেন কৃষ্ণা—এসো দেখ"—

মুচকী হেসে কৃষ্ণা বলল, "কিন্তু কই, বসতে তো বললেন না ?"

সুব্রত কপট গাম্ভীর্য্যের সঙ্গে নিজের চেয়ারটা ঠেলে দিয়ে বলল, "আসুন কৃষ্ণা দেবী, আসুন, বসতে আজ্ঞা হোক"—

কৃষ্ণা জিভ কাটল, "ছিঃ সুব্রতদা, এটা বাড়াবাড়ি করলেন, ওরকম করলে কিন্তু পালাব। কৈ, দেখি কি ছবি আঁকছেন ওটা ?"

"দেখ। এই ছবিটার নাম 'মৃগয়া'।"

ছোট একটি ছবি। চার পাঁচজন পুরুষের মাঝে একটি সুসজ্জিতা সুন্দরী যুবতী, আড়নয়নে সে একজন পুরুষের দিকে তাকিয়ে আছে, মৃদু মৃদু হাসছে। পুরুষটিও তার দিকে মুগ্ধ দৃষ্টি মেলে ফিরে তাকাচ্ছে।

কৃষ্ণা ছবিটা দেখে হাসল, "মেয়েরাই বুঝি আপনার মত খারাপ?"

সুব্রত হাসল, "ছবি থেকেই বুঝি মেয়েদের বিষয়ে আমার মতে পুরোপুরি জানা যায়?"

"তা যায় না, তবে আপনি মেয়েদের খুব খাতির করেন না।"

"তাই নাকি? তোমাকে বুঝি খাতির কম করলাম আজকে? বাঃ"—

কৃষ্ণা আর কথা বাড়াল না, বলল, "ছবিটা সুন্দর হয়েছে"—

সুব্রত মাথা নাড়ল, বলল, "খুব খুসী হলাম। কিন্তু এবার একটা কথা"—

"কি?"

"আমার ছবি দেখালাম—তার প্রতিদান চাই।"

"বাঃ—আমি"—

"হ্যাঁ তুমি—গান শোনাবে। গোকুলবাবুর কাছে যে তুমি গান শেখো তা তো আমার অজানা নয়।"

"ধ্যেৎ"

"তা হলে ভবিষ্যতে ছবি দেখা বন্ধ।"

কৃষ্ণা ঘামতে সুরু করল। কঠিন পরীক্ষা।

"কি গাইবে?" সুব্রত গম্ভীরভাবে প্রশ্ন করল।

গাইবার জন্য লোভ হল কৃষ্ণার অথচ লজ্জা হচ্ছে। একি বিপদ।

সে বলল, "গাইছি, কিন্তু আস্তে।"

"বেশ, তাই সই।"

"আপনার ভালো লাগবে না।"

"আমার কথা আমি বুঝব।"

কৃষ্ণা গুন্ গুন্ করে একটা গান ধরল। প্রথম দু'কলি সে ভালই গাইল, পরের কলিটা আটকে গেল, গলাটা আবেগে, পুলকে ধরে গেল। পালটে প্রথম থেকে সে গাইতে চেষ্টা করল, কিন্তু পারল না। ততক্ষণে সে ঘামে নেয়ে উঠেছে, বিন্দু বিন্দু ঘাম জড় হয়েছে তার নাসাগ্রে আর চিবুকে।

হঠাৎ সে ছুটে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে, বলে গেল, "আজ এই পর্য্যন্তই থাক সুব্রতদা"—

সুব্রত হাসল। বেশ মেয়েটি। গলাটিও ভারী মিষ্টি। বাঃ। তা ছাড়া মেয়েটির গুণ আছে, বুদ্ধি আছে। চিত্রশিল্প সে বোঝে। তার মধ্যে একটা সহজাত বৃত্তি আছে যার দ্বারা সে ছবির ভালো মন্দের বিষয়ে একটা সুস্পষ্ট মতামত দিতে পারে। অথচ মেয়েটি দুঃখী, ওর বিয়ে হচ্ছে না। বেচারী! শরৎচন্দ্রের 'অরক্ষণীয়া'র সঙ্গে ওর যেন খানিকটা মিল আছে।

ওদিকে সিঁড়িতে পা দিয়ে কৃষ্ণা ভাবতে লাগল। ছিঃ, ভালো করে গাইতে পারলাম না, কি ভাবলেন সুব্রতদা কে জানে। সে চলে এল কেন? আর একটু থাকলেই হত। সুব্রতদার ঘরে বসে ছবি দেখতে আর গল্প করতে বেশ লাগে। লোকটিও বেশ! অথচ কিছুদিন আগেও তো মনে হয়েছে লোকটা খারাপ, মদ খায়, আর আজ—মানুষ কি এক-দিনে চেনা যায়? না সুব্রতদা, চমৎকার লোক।

ভাবতে ভাবতে হঠাৎ কৃষ্ণার মুখটা বিবর্ণ হয়ে গেল। রবিবার দিন তাকে দেখতে আসবে, দেখতে আসবে একটা বুড়ো লোক।

দেখতে দেখতে সেই রবিবার এল।

সুব্রত জানত-না যে রবিবার কৃষ্ণাকে দেখতে আসবে একদল লোক। এবার খবরটা বাড়ীর মধ্যে ছড়ায়নি। যোগমায়া উল্লসিত হয়ে খবরটা ছড়াবার মত উৎসাহ পান নি। লোকে শুনলে হয়ত কত কি বলবে। কাউকে বলে কোন দরকার নেই। মেয়ের কপালে যদি সর্ব্বনাশই লেখা থাকে তা হলে সেটা নিঃশব্দেই ঘটুক।

সুব্রত সারাদিন আড্ডা দিয়ে দেরী করে বাড়ী ফিরেছিল। খেয়ে দেয়ে শরীর মহাশয়কে একটু বিশ্রাম দিয়ে, শয্যাসুখ স্পর্শ করিয়ে সে যখন ছবি আঁকতে বসল তখন বেশ বেলা হয়ে এসেছে। বোধহয় চারটে।

আঁকতে আঁকতে বেশ অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল সে। হঠাৎ দ্রুত পায়ের শব্দে পেছন ফিরে তাকাল। কৃষ্ণা।

সে সহাস্যে বলল, "কাজে বাধা দিতে এলে তো? কেন, বাড়ীতে কাজ নেই?"

কৃষ্ণা হাসল না, গম্ভীরমুখে বলল, "কাজ পালাবে না। দরকার আছে বলেই এসেছি। জানেন না বুঝি যে আপনার ঘরে আসতে আমার বাবা নিষেধ করেছেন। বাবা যখন বাড়ী থাকেন তখন কি আমি আসি? তবু যখন এসেছি তার মানেই দরকার আছে।"

সুব্রত অবাক হয়ে গেল। কৃষ্ণার বাবার কথার জন্যে নয়। এমন নিষেধাজ্ঞা তার কাছে অপ্রত্যাশিত নয়। তা নয়। কৃষ্ণার কিছু একটা হয়েছে। গুরুতর।

সে প্রশ্ন করল, "বসবে ?"

"বসতে বললে বসব।"

"নইলে ?"

"ছাদে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকব।"

সুব্রত কৃষ্ণার দিকে ভালো করে তাকাল। তার মুখ, চোখ ভয়ঙ্কর গম্ভীর, অন্ধকারে থমথম করছে তা, কালো রং আরো কালো হয়ে উঠেছে। আর কেমন যেন উত্তেজিত মনে হচ্ছে তাকে।

সুব্রত কিছুই না বোঝার ভান করে বলল, "ছবি আঁকা দেখতে হলে অত রাগতে নেই, বুঝলে ? নাও, বোস। কিন্তু ব্যাপার কি কৃষ্ণা ? কি হয়েছে বলত ?"

মুখ ফিরিয়ে নিয়ে সে সুব্রতের প্রশ্নটা এড়িয়ে গেল, বলল, "গল্প 'করলে আপনি ছবি আঁকবেন কখন সুব্রতদা' ?"

"ও ঠিক আঁকব, এখন তোমার ব্যাপারটা শুনি—মুখ চোখ অত বিশ্রী কেন ? মায়ের সঙ্গে ঝগড়া করেছ বুঝি ?"

কৃষ্ণা উদ্ধত ভঙ্গীতে বলল, "যাই করে থাকি, আপনি শুনে কি করবেন ?"

"কি আবার, এমনি"—

কৃষ্ণা জবাব দিল না। জানালা দিয়ে সে বাইরের দিকে তাকিয়ে রইল। সুব্রত বুঝল যে একটা কিছু অবশ্যই হয়েছে। এমন গম্ভীর হাবভাব, এমন কাটাকাটা কথা—সে যে কৃষ্ণাকে জানে সে তো এ নয়।

সে হেসে বলল, "ও:, বুঝেছি। ঝগড়া নয়, তবে নিশ্চয়ই তোমার জবরদস্ত বাবার কাছে খুব বকুনি খেয়েছ ?"

কৃষ্ণা মাথা নাড়ল, মুখ ফিরিয়ে এবার সুব্রতের দিকে স্থির দৃষ্টি মেলে বলল, "না পালিয়ে এসেছি।"

সুব্রতের কাছে কথাটা হেঁয়ালী বলে মনে হল, "পালিয়ে এসেছ! তার মানে?"

কৃষ্ণা মাথা নীচু করে বলল, "আমায় একদল লোক দেখতে এসেছে।"

সুব্রত হেসে উঠল। বেশ সহজেই ব্যাপারটা সে বুঝতে পারল।

"আপনি হাসছেন!" মর্ম্মাহত কৃষ্ণা উচ্চারণ করল।

"তা তুমি পালিয়ে এলে কেন? ওরা কি তোমায় মেরে ফেলবে?"

শুকনো ও মৃদু গলায় কৃষ্ণা বলল, "সে আপনি বুঝবেন না। গরীবের ঘরে কালো মেয়ে হওয়ার দুঃখ অনেক।"

সুব্রত থমকে গেল, তার মুখের হাসি মিলিয়ে গেল, বলার মত কোন কথাই সে আর খুঁজে পেল না।

কৃষ্ণা তার দিকে আবার তাকাল। তার দু'চোখে বিচিত্র একটা জ্বালাময়ী দৃষ্টি। আগের মতই মৃদু গলায় অথচ দৃঢ়তার সঙ্গে সে আবার বলল, "গরীবের ঘরে কালো মেয়ে হওয়ার জন্য অনেক দুঃখই যে মানতে হয় তা জানি সুব্রতদা,' কিন্তু তারও একটা সীমা আছে তো?"

কথার শেষে একটা প্রশ্ন। কি জবাব দেবে সুব্রত? সে ঘাবড়ে গেল। কৃষ্ণা তো নেহাৎ কচি নয়, তাকে যতটা নিরীহ ও বোকা মনে হয় আসলে তো তা সে নয়! তার শান্ত আবরণের নীচে একটা জ্বালাময় অন্তর আছে!

মৃদুকণ্ঠে সে বলল, "আসল কথা না শুনে, শুধু টীকা টিপ্পনী থেকে কি বুঝব বল তো, ব্যাপারটা খুলে বল"—

কৃষ্ণা ঠোঁট উল্টে বলল,—"ব্যাপার আর কি। আমাকে দেখতে এসেছে একজন পঞ্চাশ বছরের বুড়ো, বাবার অফিসের হেড-ক্লার্ক। ভদ্রলোকের বৌ মারা গেছে। সংসারে সাতটি কাচ্চা বাচ্চা মিলিয়ে জন বারো লোকের দেখা-শোনা করার জন্য একটি লোক দরকার"—

খানিকক্ষণ চুপ করে ভাবল সুব্রত। ভাবল কৃষ্ণার বিষয়ে, তার দিকে তাকিয়ে তাকিয়েই ভাবল। সে বুঝল যে মেয়েটি এখনো বেঁচে আছে, বিংশ শতাব্দীর বিদ্রোহ তার মধ্যে ধোঁয়া ছাড়ছে। কিন্তু সে কি করতে পারে, কতটুকু করতে পারে?

সে প্রশ্ন করল, "এবার কি করবে?"

কৃষ্ণা সহজ ও বেপরোয়াভাবে বলল, "কিছুই না, এখানে খানিকক্ষণ লুকিয়ে থাকব।"

"কিন্তু তারপর? তোমার বাবা আর মা?"

"মায়ের জন্য ভাবিনা। ভাবনা বাবার জন্যে, কিন্তু তাঁকে ভয় করি না"—

"ভয় কর না?"

"না। শুধু ভাবছি যে বেপরোয়া একরোখা বাপের সঙ্গে কি শত্রুতা করা যায়?"

সুব্রত হঠাৎ ভয়ঙ্কর খুশী হয়ে উঠল, "বেশ, তা হলে বসে থাকো, বসে বসে আমার ছবি আঁকা দেখো।"

ঠিক সেই সময়েই ডাক শোনা গেল, "কৃষ্ণা—কৃষ্ণা"—

"মা!" চাপা গলায় উচ্চারণ করল কৃষ্ণা, ছিটকে সুব্রতের ইজেলের পেছনে লুকিয়ে দ্রুতকণ্ঠে বলল, "বলে দিন যে আমি এখানে নেই; দোহাই সুব্রতদা"—

কিছু বলার আগেই দরজার গোড়ায় যোগমায়াকে দেখা গেল।

তিনি প্রশ্ন করলেন, "এখানে কৃষ্ণা এসেছিল সুব্রত? দেখেছ হতভাগীকে?"

মুহূর্তের জন্য দ্বিধা হল সুব্রতের, তারপর সে পরিষ্কার গলায় বলল, "দেখেছি। আমার ঘরে লুকিয়ে আছে সে। কৃষ্ণা বেরিয়ে এসো তো"—

কৃষ্ণা অন্তরাল থেকে নিঃশব্দে বেরিয়ে এল। মুখ চোখ তার কঠিন হয়ে উঠেছে। সুব্রতের দিকে একটা জলন্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করে সে যেন বলল, 'বিশ্বাসঘাতক'। তবু বিচলিত হল না সুব্রত।

যোগমায়ার দিকে তাকিয়ে সে বলল, "একটা কথা আছে মাসীমা।"

যোগমায়া বোধ হয় ব্যাপারটা আঁচ করতে পারলেন, বললেন, "বেশ তো বল, বাবা।"

"ভাল পাত্র জুটছে না বলে যে-কোন লোকের সঙ্গে কি আপনি মেয়ের বিয়ে দিতে চান?"

যোগমায়ার মুখে তিক্ত হাসি ছড়িয়ে পড়ল, ধীরে ধীরে তিনি জবাব দিলেন "আমি! না, আমি চাই না। যে বুড়ো দেখতে এসেছে তার সঙ্গে বিয়ে দিতে চান ওর বাবা—তাতে নাকি মেয়েরও ভাত জুটবে আর তার বাপেরও রোজগার বাড়বে"—

কিছুক্ষণের জন্য স্তব্ধ হয়ে রইল সুব্রত। কিন্তু একটা লাভ হল তার, যোগমায়াকে যেন সে নতুন চোখে দেখতে পেল। মুহূর্তের মধ্যেই তাঁর ওপর সুব্রতের শ্রদ্ধা বহুগুণ বেড়ে গেল।

সে প্রশ্ন করল, "ওঁরা কি চলে গেছেন?"

যোগমায়া মাথা নাড়লেন, "না এখনো যায়নি। উনি বসে বসে আগলাচ্ছেন"—

"তা হলে কৃষ্ণাকে এবার কি করতে বলেন?"

যোগমায়া মৃদু হাসলেন, কি আবার? এখানেই থাকুক কিছুক্ষণ—আমি গিয়ে বলছি যে ও বাড়ীতে নেই, হয়ত ঝোঁকের মাথায় বেরিয়ে কোন বন্ধুর বাড়ী গেছে। যারা দেখতে এসেছে তাদের বলা হোক যে মেয়ে মূর্চ্ছা গেছে। তা ছাড়া আর কি বলব? আর উপায়ই বা কি

আছে ? যা হবার হোক, আমি ভয় করি না। মেয়ে আমার কালো হলেই বা, সে আমার সন্তান তো।"

বলেই যোগমায়া ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

আবিষ্টের মত খানিকক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল সুব্রত, তারপর কৃষ্ণার দিকে ফিরে তাকাল। সে জানালার ধারে বসে আছে, তার দৃষ্টি বাইরের দিকে। হঠাৎ সুব্রত খুব খুশী হয়ে উঠল, ভারী আনন্দ হল তার। বাঃ, যেমন মা তাঁর তেমনি মেয়ে। মনে সৎসাহস আছে।

সুব্রত বলল, "যাক, বাঁচলাম।"

কৃষ্ণা মুখ না ফিরিয়েই বলল, "আপনি না থাকলে আজ বেশ মুস্কিল হত সুব্রতদা"—

সুব্রত উড়িয়ে দিল কথাটা, "মুস্কিল না ছাই। মুস্কিল হবে কেন ? আমি না থাকলে আর কোথাও চলে যেতে"—

কৃষ্ণা নিঃশব্দে একটু হাসল।

সুব্রত বলল, "তুমি বোস, আমি একটু বাইরে যাচ্ছি।

কৃষ্ণা ভুরু কুঁচকে বলল, "আমি আছি বলে যাচ্ছেন না তো ?"

সুব্রত মাথা নাড়ল, "ছিঃ, তা নয়, কাজ আছে।"

সুব্রত ঘর থেকে বেরিয়ে গেল বাইরে।

কৃষ্ণাকে কিন্তু সে মিথ্যে কথা বলে গেল। বাইরে কোন কাজই ছিল না তার। আসলে সে গেল একটি বিশ্রী দৃশ্যকে এড়াবার জন্য। সে অনুমান করল যে কনে-দর্শনাকাঙ্ক্ষীরা চলে গেলেই একটা বিপর্য্যয় ঘটবে নীচের তলায়। মনুসংহিতা থেকে ভোলানাথবাবু এক চোট আওড়াবেন, কৃষ্ণাকে কদর্য্য ভাষায় গালিগালাজ করবেন, হয়ত এক-আধটি চড়-চাপড়ও মারবেন। বাড়ীতে বসে বসে সেই সমস্ত তর্জ্জন-

গর্জ্জনের শ্রোতা হওবার কোন সাধ নেই তার। সে সময়টা বাইরে বাইরে কাটানোই বুদ্ধিমানের কাজ।

কিন্তু সুব্রতের ভাগ্য খারাপ। একটা বিশ্রী দৃশ্যের দর্শক বা শ্রোতা হওয়াটা এড়াবার জন্য সে বাইরে গিয়েও শেষ পর্য্যন্ত এড়াতে পারল না তা। নিয়তি যেন তাকে দু'ঘণ্টা বাদে জোর করে বাড়ী ফিরিয়ে এনে সেই অবাঞ্ছিত দৃশ্যকেই উদ্ঘাটিত করল।

বাড়ীতে ঢুকেই সে দোরগড়ায় গোকুলকে শুষ্কমুখে দণ্ডায়মান দেখতে পেল এবং ভেতরে ভোলানাথবাবুর অনর্গল বকবকানি শুনতে পেল। সে বুঝতে পারল যে তিনি কাউকে তিরস্কার করছেন।

গোকুল তাকে দেখে হাসল, বলল "বুয়েচেন সুব্রত বাবু মহা ফ্যাসাদ হয়েছে"—

সুব্রত কৌতূহলান্বিত হয়ে দাঁড়াল, প্রশ্ন করল, "কি হয়েছে?"

"কাকাবাবু আজ কৃষ্ণার ওপর ক্ষেপে গেছেন"—

"কেন?"

গোকুল নিম্নকণ্ঠে বলল,"জানেননা বুঝি—একজন বুড়ো লোক আজ কৃষ্ণাকে দেখতে এসেছিল—কৃষ্ণা তার সামনে না গিয়ে পালিয়ে গেসল।"

অজ্ঞতার ভান করে সুব্রত বলল, "ও:"—

"একেবারে থুথুরে বুড়ো—বেশ করেছে, কি বলেন?"

"হুঁ—তা বৈকি।" সুব্রত হাসল, একটু ব্যঙ্গভরা গলায় বলল, "যাক্, ভালই হল, আপনাকে আর প্রশ্ন করতে হল না।"

"মানে?"

"আপনাকে আর কৃষ্ণার অপবাদ দিয়ে"—

"ছি ছি ছি"—গোকুল যেন মরমে মরে গেল, "তা নয়, তা নয়। আর কেন যে তা করি তা যদি সত্যি জানতেন সুব্রতবাবু"—

"কেন করেন?"

গোকুল আবেগের সঙ্গে বলল, "মেয়েটি ভালো বলেই যার তার সঙ্গে বিয়ে হওয়াটা আমার পছন্দ নয় সুব্রতবাবু—মাইরি বলছি। কাকাবাবুকে বলে তো কোন ফল হত না—তাই—আর আজকে কিছুই করিনি, কৃষ্ণা নিজেই তা ভেঙে দিয়েছে"—

"কিন্তু তার আগেরগুলো তো সে ভেঙে দেয়নি।"

গোকুল ক্ষণকাল চুপ করে রইল, তারপর একটু হেসে আম্‌তা আম্‌তা করে বলল, "আপনাকে—আপনাকে আর একদিন সব কথা বলব"—

সুব্রত একটু হাসল। ওদিকে ভোলানাথ বাবুর গালিগালাজ তখন আরো চড়া হয়ে উঠেছে। বাড়ী থেকে আবার বেরিয়ে গেলে বেশ হত, কিন্তু আর যেন পা উঠল না। গোকুলের কথা শেষ হতেই সুব্রত একপা একপা করে ভেতরে গেল, সিঁড়ি দিয়ে উঠে ওপরের বাঁকে সবার অলক্ষ্যে দাঁড়াল।

ভোলানাথবাবু তখন চীৎকার করে শাসাচ্ছিলেন, "বড় বাড় বেড়েছে হারামজাদীর, বড় বুকের পাটা হয়েছে। অথচ ওর চিন্তায় আমার বুকের রক্ত শুকিয়ে আসে, অষ্টপ্রহর ওর চিন্তায় আমি মরতে চলেছি। অতি কষ্টে একটা সম্বন্ধ ঠিক করলাম, তা তাকে গোলমাল করে দিল। কালকে আমি কি করে মুখ দেখাব! আমার চাকরী নিয়ে এবার টানাটানি পড়লে কি তুই আমাকে খাওয়াবি রাক্ষুসী? না, অত সহজে আমি ছাড়ছি না। তোকে আমি শিক্ষা দেব, ঐ ঘনশ্যামবাবুর সঙ্গেই আমি তোর বিয়ে দেব তবে ছাড়ব"—

এতক্ষণ কৃষ্ণার একটুও সাড়াশব্দ পাওয়া যায়নি, হঠাৎ তার গলা শোনা গেল।

কৃষ্ণার দৃঢ়কণ্ঠের ডাক শোনা গেল, "বাবা, থামুন—

"থামব কিরে হারামজাদী, তোর বেলেল্লাপনা এবার আমি থামিয়ে দেব—এবার"—

"বাবা"—

"চোপ্"—

"না, চুপ করব না। শুনে রাখুন, আপনি যদি আমাকে যার তার সঙ্গে বিয়ে দেবার চেষ্টা করেন তাহলে আমি গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করব"—

"ওরে আমার সোহাগী রে—তোর চোখরাঙানীকে বুঝি আমি ভয় করি? দেখা যাবে কেমন আত্মহত্যা করিস তুই, ঐ ঘনশ্যামবাবুর সঙ্গেই আমি তোর বিয়ে দিয়ে ছাড়ব"—

কৃষ্ণা এবার চীৎকার করে উঠল, "তাহলে কাল সকালেই আমার মরা মুখ দেখবেন আপনি"—

"বটে! ইস্"—

"হ্যাঁ—আমার কথা মিথ্যে হলে আমি আপনার মেয়ে নই"—

যোগমায়ার কাতর কণ্ঠ শোনা গেল, "কৃষ্ণা"—

কৃষ্ণার জবাব শোনা গেল না। ভোলানাথবাবুও হঠাৎ চুপ হয়ে গেলেন। বোধ হয় মেয়ের উত্তেজিত ও উন্মাদিনীর মত হাবভাব দেখে তিনি মনে মনে ভয় পেলেন, তাঁর রাগ চাপা পড়ল। নিঃশব্দতা।

কিছুক্ষণ পরে আবার শোনা গেল ভোলানাথবাবুর গলা। এবার তিনি ঠিক উল্টো সুরে বললেন, "আত্মহত্যা করবে? বটে! আচ্ছা বাবা, কিছু বলব না, যা ইচ্ছে করগে তোরা মায়েঝিয়ে। তোদের ইচ্ছেই পূর্ণ

হোক, মনের মত পাত্তর খুঁজে বের করগে তোরা—দেখে নেগে কত ধানে কত চাল—হুঁঃ”—

আবার নিঃশব্দতা। ঝড় থামল।

সুব্রত ওপরে চলে গেল।

ইন্দুমতী ছেলেকে দেখে বললেন, “বাপ্, একটা পর্ব গেল। পাথরের মত মেয়েটা এতক্ষণ সহ্য করছিল, শেষে যা শোনাল বাপকে—ঠিক ৎ নিয়েছে। বাপ না চামার—উঃ”—

সুব্রত একটু ম্লান হেসে নিজের ঘরে গেল, অন্ধকারে জানালার ধারে সে একটা চেয়ার টেনে বসল। একটা বিচিত্র বেদনায় তার মনটা আচ্ছন্ন হয়ে উঠল। নিরীহ ও শান্ত মেয়েটির মুখ বারংবার তার দু'চোখের সামনে ভেসে উঠতে লাগল। বাংলা দেশের মেয়ে কৃষ্ণা। মধ্যবিত্তের মেয়ে। কালো মেয়ে। বিংশ শতাব্দীর শেকল-ছেঁড়ার যুগেও আজ বহু মেয়ে নিঃশব্দে নির্যাতন ভোগ করছে, তাদের দুঃখের ইতিহাস আজও বদ্‌লায়নি। সুব্রতের হাতের মুঠো হঠাৎ লোহার বলের মত শক্ত হয়ে উঠল। কেন এমন হয়? সমাজ? রাষ্ট্র? যেই দায়ী হোক, মানুষই এর জন্য দায়ী। ভাবতে ভাবতে সুব্রত উত্তেজিত হয়ে উঠল, তুলি আর রং ছেড়ে দিয়ে বেছে বেছে মানুষের মাথা ফাটাতে ইচ্ছে হল। মনে মনে সে ভাবল যে কৃষ্ণার বিয়ের ব্যাপারে সে সাহায্য করবে, তার জন্য একটি ভাল পাত্রের সন্ধান করবে। কিন্তু কি করে করবে সে? পাত্র কি নিজের ললাটে বিজ্ঞপ্তি এঁটে ঘুরে বেড়ায়? তবে?

তার দু'দিন বাদেই সুব্রত আমার কাছে এল, বলল যে কৃষ্ণার জন্য আমাকে একটি পাত্র দেখে দিতে হবে।

ছয়

সুব্রত এসে যেভাবে সেদিন কৃষ্ণার জন্য পাত্র দেখতে অনুরোধ করেছিল তাতে রীতিমত অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। সুব্রত যে ধরণের ছেলে তাতে এই সমস্ত ব্যাপারে সে মাথা ঘামাবে একথা কোনদিনই ভাবতে পারিনি। আজ অবশ্য সমস্ত ব্যাপারটাই আমার কাছে যুক্তিপূর্ণ ও স্বাভাবিক বলে মনে হচ্ছে। সেদিন কি আর ভেবেছিলাম যে প্রেমের প্রথম লক্ষণ—হয সহানুভূতি-নয় ঘৃণা। সত্যি, ভাবতে বেশ লাগে। যে সুব্রত শিপ্রার কাছে একটু ঘা খেয়েই নারী-বিদ্বেষী হয়ে উঠল, সে কেমন ধীরে ধীরে প্রেমে পড়ল! ধীরে ধীরে, নিঃশব্দপদে প্রেম এল তার জীবনে। নিঃশব্দে একটি ফুল ফুটল। একটি লাল ফুল। তার চেতন মন যখন বড় বড় দে'য়াল খাড়া করে আত্ম-প্রত্যয়ের হাসি হাসছিল এবং পৃথিবীর নারীজাতিকে নিতান্ত অনুকম্পাভরে বিচার করছিল তখন তার অবচেতন মন চক্রান্ত করছিল, সুড়ঙ্গ কেটে কেটে একটি নারী মূর্ত্তিকে হৃদয়ের নিভৃততম প্রদেশে নিয়ে প্রতিষ্ঠা করছিল। আশ্চর্য্য!

পাত্র দেখার জন্য আমাকে অনুরোধ করার পর প্রায় দিন কুড়ি কেটে গেল। এর মধ্যে আমি সুব্রতের কথাটা খুব গুরুতরভাবে না নিলেও উড়িয়ে দিই নি। আমার দু'তিনজন পরিচিত ভদ্রলোককে আমি কথাপ্রসঙ্গে কৃষ্ণার কথাটা বলেছিলাম। তারা আমাকে প্রীতির চোখে দেখে বলে মেয়েটির জন্য চেষ্টা করার প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিল। তারপরে ব্যাপারটা প্রায় ভুলবার উপক্রম করেছিলাম।

সেদিন হঠাৎ বিপিন এসে হাজির হল। তাকেও কৃষ্ণার কথাটা বলেছিলাম আমি।

সে বলল, "আপনি যে একটি মেয়ের কথা বলেছিলেন—তার জন্য একটি সম্বন্ধ ঠিক করেছি অনিমেষদা"—

খুব খুশী হয়ে গেলাম, বললাম, "তাই নাকি? বাঃ, বেশ। তা পাত্রটি কে শুনি?"

"পাত্রটি আমার পিস্‌তুতো ভাই, বেঙ্গল কেমিক্যালে চাক্‌রী করে, দেড়'শ টাকা মাইনে পায়।"

"চমৎকার—তা কবে দেখবে মেয়েকে?"

"সামনের রবিবারে হোক না।"

"তার মানে পাঁচ দিন বাদে, আচ্ছা, তাই হবে।"

তাই ঠিক হল। বিপিন বলে গেল। আমি ছুটলাম সুব্রতের বাড়ী খবরটা দিতে। বেলা তখন চারটে আন্দাজ হবে।

নীচে কাউকে দেখতে পেলাম না। সিঁড়ির সামনে বসে শুধু বাচ্চারা লুডো খেলছিল। সোজা ওপরে উঠে গেলাম। আজকাল আর ডাকাডাকি করে অপেক্ষা করি না, মোটামুটিভাবে আমি বাড়ীর মধ্যে পরিচিত হয়ে গেছি।

সুব্রত কাজ করছিল না, বই পড়ছিল। আমাকে দেখে একটা স্মিত হাসি ছড়িয়ে পড়ল তার মুখে, বলল, "এসো, এসো সম্পাদক মশাই"—

আমি বললাম, "বসবার সময় নেই বেশী, কথা আছে"—

"বল"—

"কৃষ্ণার জন্য একটি চাকুরে পাত্রের সন্ধান পেয়েছি—আসছে রবিবার তারা তাকে দেখতে আসবে।"

সংবাদটা শুনে সুব্রতের মুখে কোন ভাবান্তর দেখতে পেলাম না। অবাক হলাম।

সে শুধু সংক্ষিপ্তভাবে বলল, "ওঃ"—

"ওদের খবর দিও, সামনের রবিবার দিন তৈরী থাকতে বলো।"

"আচ্ছা।"

ভয়ঙ্কর রাগ হল। ব্যাপারটা কি? সুব্রত অমন হুঁ হাঁ করে জবাব দিচ্ছে কেন? আমার কথাগুলো কি তার কাছে অপ্রীতিকর মনে হচ্ছে? অথচ এ বিষয়ে আমাকে তো সে-ই খাটাচ্ছে। বিয়ে করিনি, সংসার করিনি, তবু আমার মত বে-রসিক লোকও শেষ পর্যন্ত ঘটকালীতে নেমেছে. একটি সুপাত্রের সন্ধান এনেছে। তবু খুশী নয় কেন সুব্রত? হতভাগা আমাকে ভেবেছে কি?

তিক্তকণ্ঠে বলে বসলাম, "তোমার গতিক তো সুবিধের মনে হচ্ছে না সুব্রত। পাত্রের সন্ধান নিয়ে এসে কি আমি কোন অপরাধ ক'রে ফেলেছি?"

সুব্রতের যেন চমক ভাঙ্গল, আমার কথা শেষ হতেই সে পরম লজ্জিত হয়ে বলল, "না, না, তা নয়। বেশ করেছ, খুব ভালো করেছ, আমি ওদের তৈরী থাকতে বলে দেব।"

আরো পাঁচ সাত মিনিট আমি সুব্রতের ওখানে বসলাম, তারপর চলে এলাম। জরুরী কাজ ছিল, বসার উপায় নেই। কিন্তু মনে খটকা জন্মাল। সুব্রতকে কেমন যেন উদাস ও চিন্তিত মনে হল! যেমন আগ্রহের সঙ্গে সে আমাকে পাত্রের সন্ধান করতে বলেছিল তেমন আগ্রহের সঙ্গে তো সে পাত্রের সংবাদটাকে গ্রহণ করল না! ব্যাপার কি? তার হাবভাবকে সহজভাবে গ্রহণ করতে আমার দ্বিধা হল। অথচ সুব্রতের মনের ভেতরটা দেখতে না পেয়ে মনটা অস্বস্তিতে ভরে উঠল। সারা রাস্তা শুধু ভাবতে ভাবতেই চললাম। সুব্রত কেন অমন নীরসভাবে কথা বলল? কি ব্যাপার? কি ব্যাপার? তার কি হয়েছে?

আমার সন্দেহ যে মিথ্যে নয় সে কথা পরে জানতে পেরেছিলাম। সুব্রতের সত্যি পরিবর্ত্তন হয়েছিল। কৃষ্ণার পাত্রের জন্ত আমাকে অনুরোধ করার পর থেকেই সুব্রতের হৃদয়ে একটা বিপ্লবের স্ফুলিঙ্গ ক্রমে সর্ব্বব্যাপী হয়ে উঠেছিল। পাত্রের সন্ধান নিয়ে আমি যেদিন তার কাছে গিয়েছিলাম এবং তার উদাসীন ভাব লক্ষ্য করে আহত হয়ে ছিলাম সেদিন তার জীবনের একটি অধ্যায় শেষ হয়ে গেছে। পশ্চিমের দুরন্ত বাতাস তখন তার জীবনে বসন্তের আশীর্বাদ বয়ে এনেছে। অসাধারণ না হলেও ভারি বিচিত্র সে কাহিনী—

—দিন কাটছিল। সুব্রতের জীবনের চক্রান্ত একইভাবে গড়িয়ে চলছিল। সে ছবি আঁকে, বাইরের কমার্শিয়াল কাজ করে কিছু কিছু, ঘুরে বেড়ায় দেখার লোভে, আড্ডা দেওয়ার জন্ত, কাজের জন্ত। যখন বাড়ী থাকে তখন আগের মতই তার সময় কাটে আর মাঝে মাঝে এখনো কৃষ্ণা আসে। সুব্রতের অজ্ঞাতে এসে লঘুপদক্ষেপে সে তার পেছনে দাঁড়ায়। কিন্তু একটু বাদেই সুব্রত টের পায়। কাঁচের চুড়ির টুংটাং শব্দ বিশ্বাসঘাতকতা করে, তাকে সচেতন করে তোলে যে কৃষ্ণা এসেছে। মনে মনে সে ভাবে যে চুড়ির ঐ টুংটাং শব্দটা কি ইচ্ছাকৃত না অনিচ্ছাকৃত? সঠিক কারণ কোন্‌টা তা না বুঝতে পারলেও শব্দটা তার খারাপ লাগে না, সেতারের তারের টুংটাং আওয়াজের মতই তা মিষ্টি লাগে তার কাছে।

সেদিনকার সেই বৃদ্ধ-বর-প্রত্যাখ্যান-পর্ব্ব চুকে যাবার পর থেকে কৃষ্ণা যেন একটু অতিমাত্রায় গম্ভীর হয়ে পড়েছিল। সুব্রত লক্ষ্য করেছিল

যে একটা ট্র্যাজিক ছায়া তার কালো মুখকে আরো কালো করে তুলেছে। নিয়তি-চক্রান্তকে ব্যর্থ করার জন্ম সে যেন একটা দুরূহ সাধনা আরম্ভ করেছে, তাই তার মুখেচোখে কালো লোহার কাঠিন্ম দেখা দিয়েছে। দেখে অস্বস্তিবোধ হত, ছবি আঁকা বন্ধ করে সে মাঝে মাঝে গল্প জুড়ে দিত তার সঙ্গে, বোঝাতে চাইত যে সে যেন মুষড়ে না পড়ে।

একদিন সে বলেছিল, "বুঝলে কৃষ্ণা, নিজেকে ছোট মনে করতে নেই।"

কৃষ্ণা জবাব দিয়েছিল, "কোথায়? নিজেকে তো আমি ছোট মনে করি না।"

"কর বৈকি।"

সে চুপ করে মুখটা ফিরিয়ে নিয়েছিল।

সুব্রতের ভেতরটা হঠাৎ যেন উদ্বেল হয়ে উঠেছিল, সে মৃদুকণ্ঠে বলেছিল, "তোমাকে সহানুভূতি করে এমন লোকের কিন্তু অভাব নেই।"

"সহানুভূতি!" কৃষ্ণা উচ্চারণ করেছিল।

সুব্রত সায় দিয়েছিল, "হ্যাঁ।"

কৃষ্ণা মুখ ফিরিয়েছিল, হঠাৎ যেন তার মধ্যে প্রাণের সঞ্চার দেখা গিয়েছিল, তার অস্বাভাবিক গাম্ভীর্য্যের মুখোসটা সরে গিয়ে তার আগেকার হাসি-খুশী চেহারাটা বেরিয়ে এসেছিল। সুব্রতের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে সে প্রশ্ন করেছিল, "আমাকে সহানুভূতি করে—কে?"

সুব্রত মৃদু হেসে বলেছিল, "তা বোঝা খুব কঠিন নয়।"

কৃষ্ণা আর জবাব দেয়নি, শুধু তার গম্ভীর কালো দু'চোখের তারায় দেখা দিয়েছিল একটা স্ফুলিঙ্গ-দীপ্তি।

এতদিন কৃষ্ণা আসত, একটু বসে গল্প-গুজব করেই আবার চলে যেত। আধ ঘণ্টা থেকে একঘণ্টা পর্য্যন্ত, এর বেশী কোনদিনই বসত না সে। কিন্তু সেই সময়ের গণ্ডী এবার থেকে বাড়তে লাগল। সুব্রত বা কৃষ্ণা তা প্রথমে একটুও বুঝতে পারেনি। জোয়ারের জলের মত তা একটু একটু করে বাড়ছিল, ছায়ার মত নিঃশব্দে তা দীর্ঘতর হচ্ছিল।

শুধু গল্প নয়, কৃষ্ণার কাছ থেকে টুকিটাকি সাহায্যও আদায় করত সুব্রত।

একদিন হঠাৎ চায়ের তেষ্টা পেল তার। বরাবরই সে চায়ের সরঞ্জাম নিজের ঘরে রাখে, দুপুর বেলাটা মাকে কষ্ট দেয় না, দরকার হলে নিজেই চা তৈরী করে নেয়। আজও তাই করতে গেল।

কৃষ্ণা তাড়াতাড়ি কাছে এগিয়ে এল, প্রশ্ন করল, "কি করছেন বলুন'ত ?"

সুব্রত তার দিকে তাকিয়ে হাসল, কৃষ্ণার কথার আড়ালে যে প্রতিবাদ প্রচ্ছন্ন ছিল তা টের পেয়ে সে বলল, "ভুল হয়েছে, তুমিই তো রয়েছ। দাও তো এক কাপ চা তৈরী করে"—

কৃষ্ণা ভয়ঙ্কর খুশী হয়ে উঠেছিল, চায়ের সরঞ্জাম নিয়ে সে এক কোণে সঙ্গে সঙ্গেই চা তৈরী করতে বসে গিয়েছিল।

সুব্রত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করতে লাগল। ঘরের কোণে একটি মেয়ে বসে চা করছে। ছবিটি ভারী ভালো লাগল তার। একটি আশ্রয়, আশ্বাস ও সৌন্দর্য্যের ছবি। মনটা অজ্ঞাতে কেমন যেন করে উঠল, বিচিত্র একটা শূন্যতার বেদনা যেন হঠাৎ অন্তরে পাক খেয়ে উঠল।

কিন্তু পরমুহূর্তেই সুব্রত সচেতন হয়ে উঠল। দূর, এসব কি ভাবছে সে? দূর—

তবু সুব্রত লক্ষ্য করতে লাগল। ষ্টোভ জ্বলছে, নিপুণ হাতে চা তৈরী করছে কৃষ্ণা, তার কাঁচের চুড়ির টুংটাং শব্দের সঙ্গে কাপ প্লেটের শব্দ মিশে যাচ্ছে। বড় ভালো লাগল দেখতে। সে ভাবতে লাগল! এই কালো মেয়েটির সুখ, দুঃখ, বেদনাবোধ কি একটি গৌরাঙ্গীর চেয়ে এক তিল কম? এর আশা আকাঙ্খা, কামনা বাসনার ভাণ্ডার কি কোন দিক থেকে হার মানবে কোন তিলোত্তমার কাছে?

সেদিন দুপুরেও সে অমনিভাবে লক্ষ্য করছিল কৃষ্ণাকে। ষ্টোভের একটানা আওয়াজটা শোনা যাচ্ছিল, জানালার সামনে এক জোড়া পায়রা অনেকক্ষণ ধরে ডাকছিল। তুলি হাতে টুলের ওপর বসে ছিল সুব্রত আর দেখছিল কৃষ্ণার ব্যস্ত-সমস্ত ভাবকে।

আচম্‌কা ফিরে তাকাল কৃষ্ণা, সুব্রতের দৃষ্টি দেখে দুই ভুরু তুলে কপট গাম্ভীর্য্যের সঙ্গে সে বলল, "এই বুঝি আপনার ছবি আঁকা হচ্ছে সুব্রতদা?"

সুব্রত হাসল। হঠাৎ যেন তার দৃষ্টিটা বদ্‌লে গেল, যেন সে নতুন করে আবিষ্কার করল কৃষ্ণাকে। কালো, নিরাভরণা একটি মেয়ে। কোনো অসামান্যতার ছাপ নেই তার মুখে চোখে। তবু তাকে নিয়ে যেন ছবি আঁকা যায়। তার ধৈর্য্য, স্থৈর্য্য, সাহস, কষ্ট-সহিষ্ণুতা, স্নেহ, মমতা, সেবাপরায়ণতা, তার উপেক্ষিত নারীত্ব যেন একটি মহৎ ছবির উপাদান ও উৎস হতে পারে।

"কি, জবাব নেই কেন? ছবি আঁকুন, নইলে চা বন্ধ।"

মনের চিন্তা হঠাৎ সবাক হল, ফস্ করে বলে ফেলল সুব্রত, "ছবি আঁকব, কিন্তু তুমি কি রাজী হবে?"

কৃষ্ণা অবাক হয়ে তাকাল, "মানে? কিসে রাজী হব?"

"আমার কথায়?"

ভীতকণ্ঠে সে জিজ্ঞেস করল, "কি কথা?"

সুব্রত বলল, "তোমার ছবি আঁকব আমি।"

খানিকক্ষণ সে সুব্রতের দিকে নিষ্পলক নেত্রে তাকিয়ে রইল, তারপর মৃদুকণ্ঠে বলল, "আমার ছবি!—আমার ছবি কি ভালো ছবি হবে?"

সুব্রত জবাব দিল, "ভালো মন্দের কথা পরে হবে, আগে ছবিটা আঁকি তো।"

আবার সে ভয়ে ভয়ে প্রশ্ন করল, "এখুনি?"

গলার জোর দিয়ে সুব্রত বলল, "নিশ্চয়, এখুনি—শুভস্য শীঘ্রম্, চায়ের কাপটি শেষ করেই সুরু করে দেবে।"

ক্যানভ্যাসটা বদলে নিল সুব্রত, চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে কিছুক্ষণ ছবিটা ভাবল। দর্পণের সামনে বসে একটি কালো মেয়ে বেণী বাঁধছে আর নিজের মুখ দেখছে। তার বেশবাস শিথিল, মুখে চোখে বেদনার ছায়া, কালো দীঘির রক্ত-পদ্মের মত তার কালো দেহের নবীন যৌবন। একটি বিয়োগান্ত ছবি হবে। ভেবে উত্তেজিত ও খুসী হয়ে উঠল সুব্রত। চা শেষ করেই সে বসে গেল।

"বোস এখানটায় কৃষ্ণা, আমি যেভাবে বলি, ঠিক তেমনিভাবে—কেমন?"

"আচ্ছা—"

ছবি আঁকা আরম্ভ হল।

ভয়ে লজ্জায় কেমন যেন জবুথবু হয়ে তাকাল কৃষ্ণা। দেখে মায়া হল সুব্রতের। ভারী অসহায় দেখাচ্ছে মেয়েটাকে।

"নিশ্চিন্ত হয়ে বোস কৃষ্ণা, ঘাবড়ে গেছ কেন?"

"না না, কোথায়—" কৃষ্ণা হাসবার চেষ্টা করল।

হৃদয়ের ভেতরে একটা আশ্চর্য্য কোমল অনুভূতি। সেই অনুভূতির সঙ্গে যেন সুর মেলাল তুলির আঁচড়গুলো। সুব্রত উত্তেজিত হয়ে উঠল। কোন গোলমাল হচ্ছে না, নির্ভুল ভাবে রেখাগুলো আসছে তার তুলির ডগায়, যেন দেহের ভেতর থেকে একটা বর্ণের তরঙ্গ এসে তুলির মুখে আত্মপ্রকাশ করছে। তার নানাবর্ণের অনুভূতির তরঙ্গ।

কিন্তু সেদিন আর বেশী এগোতে পারল না সুব্রত।

বিশু এসে ডাকল, "দিদি—এই—"

কৃষ্ণা চমকে উঠল, "কিরে?"

"মা ডাকছে, দরকার আছে।"

"চল্ যাই।"

যাবার আগে সে ক্যানভাসের সামনে এসে দাঁড়াল, বলল, "দেখি কতটা আঁকলেন?"

ক্যানভাসটা ঢাকা ছিল, তার সামনে দাঁড়িয়ে সুব্রত বলল, "উঁহু, দেখতে পাবে না।"

"কেন?" অবাক হয়ে গেল কৃষ্ণা, শুধু তাই নয়, তার কণ্ঠস্বরে যেন একটু অভিমানের আভাসও পাওয়া গেল।

সুব্রত গম্ভীরভাবে বলল, "পাবে, তবে এখন নয়, ছবি শেষ হলে। যদি কথা না মানো তাহলে কি হবে জানো?"

"কি?"

"জগন্নাথ ঠুঁটো হবে।"

খিলখিল করে হেসে উঠল কৃষ্ণা, তার হাসির শব্দে যেন ঝরণার উচ্ছলতা। সুব্রত বিস্মিত হল, এর আগে আর কোনদিন তাকে এমন মিষ্টি করে, প্রাণ খুলে হাসতে দেখেনি সুব্রত।

কিন্তু হঠাৎ থেমে গেল কৃষ্ণা, যেন মাঝপথে একটা অদৃশ্য হাত এসে তার কণ্ঠরোধ করে দিল। ব্যাপারটা বোধগম্য হল না।

সুব্রত প্রশ্ন করল, "কি হল, হঠাৎ থামলে যে?"

আগেই চলতে সুরু করে দিয়েছিল কৃষ্ণা, প্রশ্ন শুনে দরজার বাইরে দাঁড়াল সে, মৃদুকণ্ঠে বলল, "যাদের পোড়া কোপাল তাদের নাকি জোরে হাসতে নেই"—

"কেন? এখন তো তোমার বাবা বাড়ী নেই।"

কৃষ্ণা হাসল, "বাবা নেই তাতে হয়েছে কি? বাবার একজন সাগ্‌রেদ আছে"—

সুব্রত ঠাট্টা করার লোভ সামলাতে না পেরে বলল, "গোকুলবাবু বুঝেছি। ভদ্রলোকের কিন্তু তোমার ওপর খুব টান আছে।"

কৃষ্ণা চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, "জানি। শয়তানের টান।"

বলেই সে ক্ষিপ্রপদে চোখের আড়ালে চলে গেল। সুব্রত বুঝল যে কৃষ্ণা বুদ্ধিমতী। বাইরে যতই শান্ত এবং বোকাটে মনে হোক, ভেতরে ভেতরে সে তার প্রখর অনুভূতি দিয়ে বিচার করে গোকুলকে ঠিকই চিনেছে। এমন বুদ্ধিমতী মেয়ে, অথচ—

সুব্রতের মনটা ভারী হয়ে উঠল! সত্যি ভারী দুঃখ বোধ করল সে। গায়ের রং কালো, রূপসী নয়, শিক্ষাও বেশী নয়—অনেক কিছুই নেই কৃষ্ণার; কিন্তু তার তুলনায় আরো অনেক কিছু আছে যা নিক্তির কাঁটাকে সেদিকে টেনে আনবে। দুঃখ, অভাব, অবদমিত আশা আকাঙ্খা, নির্য্যাতন আর দুর্ভাগ্য। সুব্রতের কল্পনায় ছবির রং এবার

আরো সুক্ষ্ম, আরো বিচিত্র হয়ে উঠল। কালো মেয়েটি দর্পণে মুখ দেখছে, দেখছে নিজের দুঃখ, বেদনা, কুরূপ আর অন্ধকার ভবিষ্যৎকে।

দুঃখ বোধ করেও কিন্তু সে একটা বিচিত্র আনন্দ অনুভব করল। তার ছবি ভালো হবে।

ছবি আঁকা চলল। একদিন, দু'দিন, তিনদিন, এমনি করে আরো পাঁচদিন কাটল। কৃষ্ণার নাক, মুখ, চোখ, সারা দেহ লক্ষ্য করে করে নতুন নতুন তথ্য আবিষ্কার করল তার হৃদয়ের বিষয়ে, তাতে সুব্রতের তুলির আঁচড় যেন আরো উজ্জ্বল, সংক্ষিপ্ত ও বলিষ্ঠ হয়ে উঠল। ছবি আঁকতে আঁকতে রীতিমত উত্তেজিত হয়ে উঠল সে। কৃষ্ণা তো শুধু মডেল নয়, সে বিষয়বস্তুও বটে। সে সমস্ত কালো মেয়ে ও রূপহীনাদের প্রতীক।

ছবি আঁকার সময় যতই তাকে লক্ষ্য করতে লাগল ততই যেন তাকে আরো নতুন করে চিনতে লাগল সুব্রত। গভীর ও রহস্যময় তার চোখের চাউনি, চমৎকার সংযম আছে তার কথাবার্ত্তায় ও হাবভাবে, বড় লীলায়িত তার গতিভঙ্গী। মাথা নীচু করে সামনের দিকে তাকিয়ে আছে কৃষ্ণা, যেন দুরদৃষ্টের বোঝাটা সে আর সামলাতে পারছে না। সাধারণ সাড়ী তার পরণে, তবু কেমন মানানসই করে পরেছে সে! মনে মনে স্বীকার করতে বাধ্য হল সুব্রত যে কৃষ্ণার রুচি আছে, তার মনের মধ্যে এ কথাটা ছাপার হরফের মত ফুটে উঠল যে 'মেয়েটি বড় ভালো'। সাধারণ মানুষের দৃষ্টি দিয়ে প্রথমে যাকে নেহাৎই একটি সাধারণ কালো মেয়ে বলেই মনে হয়েছিল, আজ শিল্পীর দিব্যদৃষ্টি দিয়ে তার মধ্যে সে অসাধারণত্ব খুঁজে পেল।

পাঁচদিন পরে একটা কাণ্ড হয়েছিল।

কয়েকদিন ধরেই গোকুল ভট্টাচার্য্য বড় মনমরা অবস্থায় দিন কাটাচ্ছিল। কয়েকদিন ধরে প্রায়ই লক্ষ্য করছে যে কৃষ্ণা ওপরে নিয়মিত ভাবেই যাচ্ছে। তার সঙ্গেও কৃষ্ণা আজকাল ভালো ব্যবহার করেনা, প্রতিদিনই গান শেখে না, কোন কথা বললেই কাটা কাটা জবাব দিয়ে তাকে বোবা করে ফেলে। ভোলানাথবাবুকে এ নিয়ে কিছু বলতে আর আজকাল তার সাহসে কুলোয় না। ঘনশ্যামবাবুর সঙ্গে কৃষ্ণার বিয়ের কথায় প্রতিবাদ করার পর থেকেই ভোলানাথবাবু তার ওপর একটু অপ্রসন্ন হয়ে আছেন।

বড় মনমরা হয়ে পড়ল গোকুল। কালো কুৎসিত মুখটাকে সে অমাবস্যার রাত করে বসে ভাবতে লাগল। টিউশানীগুলোকে দায় সারা ভাবে সেরে এসে বাড়ীর মধ্যেই সে বসে থাকে। অনেক রাত পর্য্যন্ত সে নানা রকমের গম্ভীর ও বিষণ্ণ রাগ রাগিনীর আলাপ করে। কেউ প্রতিবাদ করে না, কারণ তাতে কারোরই ঘুমের ব্যাঘাত হয় না। তাছাড়া গোকুলের গান ভালো এবং সে গাইতেও জানে।

সেদিন সকালে তার কি খেয়াল হল, সোজা ওপরে উঠে গেল সে। সুব্রত ঘরেই ছিল, তাকে দেখতে পেয়ে অভ্যর্থনা জানাল।

"আসুন গোকুলবাবু, আসুন—"

গোকুল নিঃশব্দে ভেতরে ঢুকল। চারদিক নজর বুলিয়ে দেখল যে ঘরের মাঝখানে একটা ছবি ঢাকা অবস্থায় রয়েছে। তার কৌতুহল হল।

"ওটা কি ছবি আঁকছেন সুব্রতবাবু?"

সুব্রত যেন চমকে উঠল, গোকুল তা লক্ষ্য করল। "ওটা? একটা ছবি, শেষ না করে কাউকে দেখাব না বলে ঢেকে রেখেছি—

"ও:"—

সুব্রত দেখল যে গোকুল মাষ্টার একটু রোগা হয়ে গেছে। আগেকার মত আবোল তাবোল কথা বলে হেঁ হেঁ করে হাসছেও না সে। মনে মনে সে একটু হাসল। আশ্চর্য্য!

গোকুল উসখুস করে। কেন যে সে ঘরে এল তা সে নিজেই জানে না। তাছাড়া হাতে নাতে একদিন সুব্রতের কাছে ধরা পড়ার পর থেকেই সে যেন ছোট হয়ে গেছে।

সুব্রত হঠাৎ প্রশ্ন করল, "আচ্ছা গোকুলবাবু"—

"আজ্ঞে?"

"আপনি বিয়ে থা করবেন না, সংসার করবেন না?"

সুব্রতের দিকে তীব্র দৃষ্টি মেলে তাকল গোকুল, ক্ষণকাল স্তব্ধ থেকে সে বলল, "ইচ্ছে থাকলেই কি সব সময়ে সব কিছু হয় সুব্রতবাবু?"

কাণ্ডটা এইবার ঘটল।

দম্‌কা হাওয়ার ধাক্কায় হঠাৎ ছবির ঢাক্‌নাটা পড়ে গেল। গোকুল সেদিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে গেল। মুহূর্ত্তের জন্য সুব্রতের মুখটা বিবর্ণ হয়ে গেল কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই সে নিজেকে সাম্‌লে নিল। বয়ে গেছে, যা হবার হোক।

"কৃষ্ণার ছবি!" গোকুল উচ্চারণ করল।

"হ্যাঁ", সুব্রত মাথা নাড়ল, একটু শ্লেষতিক্ত কণ্ঠে প্রশ্ন করল, "ভোলানাথবাবুকে খবরটা দিতে হয়, কি বলেন?"

গোকুল তাকাল তার দিকে, মৃদু ও বিষণ্ণ হেসে বলল, "না। আর

ওসব বলাবলির মধ্যে আমি নেই। বুঝেছেন সুব্রতবাবু, পাষণ্ড লোকেরাও একজায়গায় গিয়ে থেমে যায়। আমি আসি—

উত্তরের জন্য অপেক্ষা না করেই গোকুল ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

নিজের ঘরে গিয়ে ভাবতে লাগল সে। আজ আর সে টিউশানীতে যাবে না।

ছ'দিন পরে ছবি আঁকা শেষ হল।

সেদিন সকাল থেকেই আকাশটা ঘোলাটে ছিল, বাতাস ছিল না। চৈত্রের খরতপ্ত আকাশ আর পৃথিবী মৌন প্রতীক্ষায় মুখোমুখী চেয়ে বসে ছিল। দুপুর না হ'তেই একটু হাওয়া দিতে লাগল, আকাশের একটা কোণ মেঘাচ্ছন্ন হয়ে উঠল। একটু বাদেই আকাশের মেঘ-সঞ্চয় হুড়মুড় করে ভেঙ্গে পড়ল, বাতাস উদ্দাম হয়ে উঠল। বৃষ্টি থামল। তখন আকাশটা যেন জলে-ধোওয়া মার্ব্বেলের মেঘের মত ঝকঝক করতে লাগল আর গরমটাও একটু কম মনে হল। কৃষ্ণা তখনও আসেনি, কিন্তু মূল ছবিটা হয়ে গিয়েছিল বলে বাকীটা শেষ করতে সুব্রতের, আর একটুও আটকাল না। কাজ শেষ করে, ছবিটা ভালোভাবে ঢাকা দিয়ে, চেয়ারে বসে বসে সে আরাম করে সিগারেট টানতে লাগল। ছবিটা ভালো হয়েছে বলে কৃতিত্বের গর্ব্বে তার মনটা ভরে উঠল।

ঠিক সেই সময়েই কৃষ্ণা এসে ঘরে ঢুকল।

সুব্রত বলল, "আজ এত দেরী হল যে?"

কৃষ্ণা সহাস্যে বলল, "খাওয়া-দাওয়া হতে অনেক বেলা হয়ে গেল।"

তার দিকে তাকাল সুব্রত। তার মুখে চোখে কেমন যেন একটা চাপা আনন্দ ও উত্তেজনার আভাস ফুটে উঠেছে—কারণটা সে বুঝতে পারল না।

কৃষ্ণা জিজ্ঞেস করল, "কি, আজ আর ছবি আঁকবেন না সুব্রতদা ?"

"না।"

"কেন ?"

"ছবিটা আঁকা হয়ে গেছে, আর দরকার নেই।"

কৃষ্ণাও তাকাল সেদিকে, বলল, "দেখাবেন না এবার ?"

সুব্রত অভিনয় করল, গম্ভীরভাবে সে বলল, "না।"

কৃষ্ণা হাসল, "কেন ? জগন্নাথ ঠুঁটো হয়ে যাবে ?"

"হুঁ"—

"উঁহু"—মাথা নাড়ল কৃষ্ণা, "আমি ছবি দেখবই।"

"যদি না দেখাই ?"

কৃষ্ণা গম্ভীর হয়ে উঠল, একটু থেমে ধীরে ধীরে বলল, "তাহলে আর আপনার সঙ্গে দেখাই করব না।"

সুব্রত হেসে উঠল, "বাপ্, অমন প্রতিজ্ঞা করে আর ভয় দেখিও না, কৃষ্ণা, দাঁড়াও, ছবি দেখাচ্ছি"—

এগিয়ে গেল সে ছবিটার দিকে। কৃষ্ণাও কাছে এসে দাঁড়াল। কৌতূহল উপ্‌চে পড়ছে তার দু'চোখ থেকে। তার ছবি! তুলি দিয়ে, রং দিয়ে আঁকা ছবি! আশ্চর্য্য! তার ঠোঁটের কোণে হাসি দেখা গেল। সুব্রত ভাবল যে বয়েস হলেই বা, একেবারে ছেলেমানুষ কৃষ্ণা।

সে বলল, "চোখ বোজ কৃষ্ণা, তবে দেখতে পাবে।"

কৃষ্ণা চোখ বড় করে বলল, "মাগো, আপনি একটি উদ্ভট লোক সুব্রতদা।"

মুখে বললেও কিন্তু চোখ বুজল সে।

তখন ছবির ঢাকনাটা ধীরে ধীরে সরিয়ে দিল সুব্রত, বলল, "এবার দেখতে পারো তুমি।"

চোখ খুলল কৃষ্ণা, ছবিটার দিকে স্থির দৃষ্টি মেলে তাকাল। অতি দ্রুত তার মুখে কতকগুলো রূপান্তর দেখা গেল। মেঘান্তরিত আকাশের আলো, মেঘের পুনরাবির্ভাব ও অন্ধকার। চোখের তারায় বিস্ময় ঘনাল তার, কেঁপে উঠ্‌ল দুটো ঘনপক্ষ্ম চোখের পাতা, ঠোঁট দুটো স্ফুরিত হ'য়ে নড়ে উঠল, বোঝা গেল যে ভয়ানকভাবে বিচলিত হয়ে পড়েছে সে।

আঁচলের একটা কোণকে হাতের মধ্যে নাড়াচাড়া করতে করতে কৃষ্ণা প্রশ্ন করল, "এটা—এটা কি আমার ছবি?"

সুব্রত অবাক হল, তার আত্মগর্বে ভয়ঙ্কর আঘাত লাগল। ছবিটা কি সে ঠিকভাবে আঁকতে পারেনি? তার হাত কি এতই কাঁচা যে ছবিটাকে দেখে নিজেকে চিনতে পারবে না কৃষ্ণা? অসম্ভব। সে জোর গলায় বলল, "হ্যাঁ, তোমারই ছবি। সন্দেহ হচ্ছে নাকি?"

বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিল কৃষ্ণার ললাটে, বিচিত্র ও দুর্বোধ্য একটা বাঁকা হাসি খেলল তার ওষ্ঠপ্রান্তে, সুব্রতের দিকে ঘাড় বাঁকিয়ে তাকাল সে, মৃদুকণ্ঠে বলল, "তা একটু সন্দেহ হচ্ছে বৈকি—আমি, আমি কি এতই সুন্দর?"

বলে কি মেয়েটা! সুব্রত তীক্ষ্ণদৃষ্টি মেলে ছবিটার দিকে তাকাল, ভালো করে দেখল। না, সে ভুল আঁকেনি। কৃষ্ণাকে ঠিকই চেনা যাচ্ছে। মেঝের উপর একটা আয়না রাখা আছে, তারি সামনে বসে আছে কৃষ্ণা, বসে বসে চুল বাঁধছে। বড় ক্লান্ত তার ভঙ্গীটা, বড় বিষণ্ণ ও গভীর তার হরিণ-কালো চোখের দৃষ্টি। তার গায়ের রং কালো কিন্তু দেহের গড়নটি ভারী সুগঠিত, যেন কষ্টিপাথর থেকে খোদাই করা একটি মূর্তি। আর

কালো হলেই বা, ভরা নদীর ভরা যৌবন তার সর্বাঙ্গে, কোমলতা ও কাঠিন্যের তবকে মোড়া। দীর্ঘ কেশপাশ, লম্বা লম্বা আঙুলগুলো, রসাল দুটি পুরু ঠোঁটে অনেক কামনা। ঠিক এঁকেছে সুব্রত। বর্ণের স্থূল ও সূক্ষ্ম কারিকুরিতে ছবির কৃষ্ণাও যেন জীবন্ত হয়ে ফুটে উঠেছে। ঐ ছবি স্পর্শ করলেই যেন তার দেহের উষ্ণতা ও কোমলতাকে অনুভব করা যাবে, তার দেহের স্পন্দন ধ্বনিত হবে স্পর্শকারীর শিরায় শিরায়। ছবির কৃষ্ণার পেছনে আলো-আঁধারের একটা কোমল ও করুণ পরিবেশ, চমৎকার ফুটেছে তা, কৃষ্ণার মুখে চোখে যে নির্যাতিত জীবনের ছাপ আছে তাকে তা যেন আশ্চর্যভাবে পরিস্ফুট করে তুলেছে। দর্পণে মুখ দেখছে কৃষ্ণা, দেখছে একটি কালো মেয়ের মসীকৃষ্ণ ভবিষ্যৎকে।

না সুব্রতের ভুল হয়নি। চমৎকার এঁকেছে সে। একটি বিয়োগান্ত কাব্যের মতই মহৎ ও করুণ তার ছবি। তার ছবি মানে কৃষ্ণা। তার দিকে ফিরে তাকাল সে, নিজের সৃষ্টি দেখে জানল যে সে সত্যি সুন্দরী! তা নইলে তার ছবি কেন সুন্দর হল? কতদিন সে কৃষ্ণাকে দেখেছে কিন্তু কোনদিনই তো তাকে পুরোপুরি দেখেনি। হাত পা, নাক চোখ, গায়ের রং, দেহের গড়ন আর দেহান্তরালের মন—সব কিছু মিলিয়ে তো কোনদিন দেখেনি তাকে।

ছবি আঁকার সময় কৃষ্ণাকে দেখেছে সুব্রত, দেখেছে আর এঁকেছে, সব কিছুই বিচ্ছিন্নভাবে অনুভব করেছে সে। কিন্তু এখন যেন একটা ইন্দ্রজাল ঘটল। চেতনা-সমুদ্রে ভাসমান সুব্রত যেন হঠাৎ কৃষ্ণার মধ্যে একটা মহাদেশকে আবিষ্কার করল। সৌন্দর্যের মহাদেশ। আশ্চর্য সুন্দর কৃষ্ণা, সে রূপসী। রূপ তো শুধু নাক ভালো, চোখ ভালো, গড়ন ভালো, আর রং ভালো নয়। রূপ হচ্ছে একটা বিচিত্র কিছু যার কোন সঠিক সংজ্ঞা নেই, অথচ যা মানুষের অনুভূতিকে চঞ্চল করে তোলে

বলে একান্ত সত্য। সেই রূপ, সেই সৌন্দর্য্য তো শুধু চোখ দিয়ে দেখা যায় না। বাইরের দৃষ্টির সঙ্গে অন্তরের দৃষ্টি মিলিত হলেই সেই সৌন্দর্য্য দেখা যায়।

কি যেন হল। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই মনের মধ্যে একটা বিপ্লব ঘটে গেল। তার পায়ের নীচে যেন হঠাৎ সব কিছু দুলে উঠল, অতি-পুরাতন পদ্ধতিতেই মনের মধ্যে একটা ঝড় উঠল, হাজারটা বিদ্যুতের বাতি জ্বলল মনের কোঠায়। সুব্রত দেখল যে রক্ত-পদ্মের অর্ঘ্য-শোভিত তার এই নতুন ছবিটিই সেই আলোকিত মনের মণি-কোঠায় প্রতিষ্ঠালাভ করেছে আর তার নীচে, রক্ত দিয়ে লিখিত হয়েছে একটিমাত্র কথা—'ভালবাসি'। তিলে তিলে, পলে পলে, সুব্রতের অন্তররাজ্যকে কৃষ্ণা জয় করেছে। এতদিন টেরও পায়নি সে, আজ পেয়ে অবাক হল। এ কি হল? একি হল?

কিন্তু না, প্রশ্ন করে সব কিছুই উত্তর পাওয়া যায় না।

সুব্রত মাথা নাড়ল, ধীরে ধীরে বলল, "হ্যাঁ, সত্যি তুমি সুন্দর কৃষ্ণা"—

কৃষ্ণা মাথা নীচু করল, ধরা গলায় বলল, "আমায় ঠাট্টা করছেন?"

দু'পা এগিয়ে গিয়ে কৃষ্ণার সামনে দাঁড়াল সুব্রত, একবার তার বিব্রত, লজ্জিত, সংশয়াকুল ও শঙ্কিত মুখের দিকে তাকাল, তারপর দু'হাত বাড়িয়ে তার দুটো হাত টেনে নিল সে।

কৃষ্ণা থরথর করে কেঁপে উঠল, তার দু'চোখ বুজে এল।

সুব্রত বলল, "ঠাট্টা নয়, কৃষ্ণা, সত্যি কথাই বলছি। আমি তো পরের চোখ দিয়ে দেখিনা, যা দেখি আমার নিজের চোখ দিয়েই তো দেখি। তুমি সুন্দর। শুধুই কি তাই? আজ তোমার চেয়ে আর কেউই আমার কাছে সুন্দর নয়।"

কৃষ্ণা চোখ মেলল, তার চোখের পাতা ভিজে। জলভরা ছ'চোখ মেলে সে তাকাল সুব্রতের দিকে; অদ্ভুত ও মর্ম্মস্পর্শী সে চাহনি। ঠোঁটের কোণে তার বিচিত্র লজ্জার হাসি ফুটে উঠল, মাথাটা আবার নীচু করে সে নিজের হাত দুটোকে ছাড়িয়ে নিয়ে বলল, "আমি যাই"—

"না"—

"না। মাসীমা জেগে উঠেছেন"—

ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল কৃষ্ণা। দরজার গোড়ায় গিয়ে গ্রীবা বাঁকিয়ে একবার আড়নয়নে সুব্রতের দিকে তাকিয়েই সে অদৃশ্য হয়ে গেল।

আর ছবিটার সামনে বসে বসে সুব্রত ভাবতে লাগল। সমস্ত হৃদয় আর পৃথিবী যে রঙে রঙে একাকার হয়ে গেল! ফুলের মত সুকোমল অনুভূতিতে যে চেতনা প্রখর হয়ে উঠল! এবার? এরপর?

ঠিক তার পরের দিনই আমি পাত্রের সন্ধান নিয়ে সুব্রতের কাছে গিয়েছিলাম, তার উদাসীন ও নিরাসক্ত ভাব লক্ষ্য করে অবাক হয়েছিলাম, ক্ষুণ্ণ হয়েছিলাম। তখন কি আর জানতাম যে শ্রীমান এতদুর পর্য্যন্ত এগিয়ে গেছে? স্বপ্নেও কি তখন ভেবেছিলাম যে সুব্রত মুখোপাধ্যায় ইতিমধ্যে পৃথিবীর সবচেয়ে দুর্গম রাজ্যকে জয় করেছে?

সাত

পরবর্ত্তী ঘটনাগুলো যে অতিদ্রুত একটার পর একটা ঘটেছিল তা আমি পরে জানতে পেরেছিলাম।

এখন বেশ অনুমান করতে পারছি যে সেদিন পাত্রের খবর দিয়ে আসার পর সুব্রতের মানসিক অবস্থাটা কি হয়েছিল। অবস্থাটা আর যাই হোক, ভাল নয় মোটেই—বলছি।

সুব্রত ঘরের মধ্যে পায়চারী করতে লাগল। মাথাটা তার গরম হয়ে উঠেছে।

ভালোবাসা! সে কি কৃষ্ণাকে ভালোবেসেছে? তাই কি? সে তো শিপ্রাকেও ভালোবেসেছিল—কৃষ্ণার প্রতি তার অনুরাগ খানিকটা সেই জাতের নয় তো? দেহলালসা নয় তো?

খুব ভাবল সুব্রত। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ভাবল। না, দেহলালসা নয় তার প্রেম। তার চেয়েও গভীর একটা অনুভূতি। খুব গভীর। কিন্তু কেন ভালোবেসেছে সে কৃষ্ণাকে? কি আছে তার? সুব্রত ভাবল, মনে মনে চুল চিরে বিচার করল কৃষ্ণাকে। মন বলল যে কৃষ্ণাকেই ভালোবাসো। শান্ত ধীর, নিরভিমান, বুদ্ধিমতী মেয়ে কৃষ্ণা, বাইরে সে রূপসী নয় বলেই অন্তর তার ঐশ্বর্য্যে ভরপুর। এই মেয়েটিই ভালো, নিঃশব্দে থাকবে তোমার পাশে, কাজ করবে, সংসার চালাবে, তোমার কাছে প্রেরণা হয়ে দাঁড়াবে, তোমাকে দেহ আর মন দিয়ে সঞ্জীবিত

করবে। কৃষ্ণাকেই ভালোবাসো, নিজের জীবনে টেনে নাও। মনের মত সঙ্গিনী তো একেবারে তৈরী অবস্থায় পাওয়া যায় না, একজনকে বেছে নিয়ে তাকে তৈরী করে নাও।

কিন্তু অনিমেষ রায় যে সম্বন্ধ নিয়ে এসেছে তার কি হবে? সে কি এই মুহূর্ত্তে বিয়ে করতে পারবে কৃষ্ণাকে? তা কি সম্ভব?

সুব্রত একটু দমে গেল। বিয়ে করে সংসার করা'র ছবিটা তাকে দুর্ব্বল করে ফেলল। এই স্বচ্ছন্দ, সমস্যাহীন জীবনের মোড় ফিরিয়ে দিয়ে কি হবে কে জানে! হয়ত অভাব আসবে, দারিদ্র্য আসবে, তার সঙ্গে আসবে শিশু, শিশুর কান্না। সেই সমস্ত সমস্যাকে দূর করার মত ক্ষমতা কি তার হয়েছে? কি দরকার? মাঝখান থেকে কৃষ্ণা বেচারীর জীবনটা নষ্ট হয়ে যাবে। না, তা হতে পারে না। অন্যের জীবনকে নষ্ট করার অধিকার তার নেই। তা ছাড়া সে কৃষ্ণাকে ভালবেসেছে বলেই তা সম্ভব নয়।

তাহলে? রবিবার দিন যে কৃষ্ণাকে দেখতে আসবে, সে বিষয়ে কি হবে? কি হবে?

কৃষ্ণার অবস্থাও তখন কম নয়।

কাজ করতে করতে সে অন্যমনস্ক হয়ে যায়, নিজের হৃদয়ের দিকে তাকিয়ে তার কাজ করা বন্ধ হয়ে যায়। কি আশ্চর্য্য, পুরুষজাতকে অবিশ্বাস করা সত্ত্বেও সে আবার বিশ্বাস করেছে একজনকে, ভালোবেসে ফেলেছে! কি করে হল তা? সে তো একটুও বুঝতে পারেনি। সুব্রত বলার আগে পর্য্যন্ত সে কল্পনাও করতে পারেনি যে সুব্রত তাকে

ভালোবাসে। তাকে সুন্দর বলে স্বীকার করা মানেই তো তাকে ভালোবাসা। খুলে না বললেও বোঝা যায় অনেক কথা। কিন্তু সুব্রত কেন ভালোবাসল তাকে? কি আছে তার মধ্যে? আচ্ছা, সুব্রত বিকাশের মত কাণ্ড করবে না তো? তাছাড়া শিল্পীরা তো সৌন্দর্য্য ভালোবাসে, তাকে এখন সুন্দর বলে মনে হলেও একদিন যদি তা আর না মনে হয়? না, ওসব কথা ভাববে না সে, ওতে ভয় লাগে, কষ্ট হয়। বয়ে গেছে, যা হবার হোক। জীবনে তো সে দুঃখ ছাড়া আর কিছু পায়নি: এবারেও না হয় দুঃখই পাবে। আর কিছু করার উপায় নেই সে মরেছে, ডুবেছে, তার হৃদয়ের সবখানি জায়গা জুড়ে বসেছে সুব্রত। সেই সুব্রত যদি আজ তাকে আবার আঘাত দেয়, ভালো না বাসে, তাহলেও তার হৃদয় থেকে আর সুব্রত যাবে না। যা হবার হোক্‌গে, বয়ে গেছে। এতদিনে সে একজনকে ভালোবাসার মত পেয়েছে, সেইটেই তার চরম লাভ, পরম সৌভাগ্য, ভালোবেসেই সে আনন্দ পাবে। কি আশ্চর্য্য সুন্দর তার পুরুষটি! গুণবান, হৃদয়বান, প্রাণ-প্রাচুর্য্যে উজ্জ্বল—

"ওকি, চুপ করে কি ভাবছিস মা—ওরে—"

মায়ের ডাকে চমক ভাঙ্গে কৃষ্ণার, হঠাৎ কর্ম্মব্যস্ততার ভান করে বলে ওঠে, "কৈ? কিছু না তো মা—এমনি—"

ভালোবাসলে যে এত সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে তা সুব্রত আগে ভাবতেও পারেনি। ঘড়ির দোকানের মত তার মন শুধু দুলতেই লাগল, স্থির হয়ে একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারল না। শেষে সে ঠিক করল যে

আপাততঃ সে পাত্রের খবরটি যোগমায়াকে জানাবে, তার কর্ত্তব্য সারবে, তারপর অন্য চিন্তা। হৃদয়কে আরো যাচাই করবে সে। কে জানে, হয়ত এই অনুরাগ-পর্ব্বটা তার সাময়িক উত্তেজনা।

ভোলানাথবাবু অফিসে চলে গেলে পর সে নীচে গিয়ে যোগমায়াকে ডাকল।

যোগমায়া ভেতরে ছিলেন, বেরিয়ে এসে বললেন, "কি খবর বাবা ?"

কৃষ্ণাও ঘরের ভেতর ছিল, সে দরজার আড়ালে গিয়ে দাঁড়াল একটা কাজের অছিলায়। সুব্রতের সামনে এসে দাঁড়াতে সে পারল না, অদ্ভুত একটা লজ্জা এসে তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলল। ভেতরেই রইল সে কিন্তু তার কান রইল বাইরের প্রতিটি কথার দিকে।

সুব্রত শুষ্ককণ্ঠে বলল, "একটা খবর দিতে এসেছি মাসীমা—"

"বল।"

"আসছে রবিবার একটি পাত্র কৃষ্ণাকে দেখতে আসবে, আপনারা তৈরী থাকবেন।"

যোগমায়া খুসী হয়ে উঠলেন, "তাই নাকি ? পাত্রটি কেমন ছেলে বাবা ?"

"ভাল ছেলে, দেড়শ' টাকা মাইনের চাকরী করে"—কথাগুলো বলতে যেন জ্বালাবোধ করল সুব্রত।

যোগমায়া উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন, "আচ্ছা বাবা, তৈরী থাকব আমরা। ভগবান যেন কৃষ্ণার একটা গতি করেন এবার—"

সুব্রত মৃদু হেসে ফিরে এল। হঠাৎ কেমন যেন শূন্যবোধ হতে লাগল তার, কানের পাশে একটা ঝিল্লীরব সুরু হল। কি করল, এটা কি করল সে ?

আর কৃষ্ণা তখন টলছে, তার চোখের সামনেকার সব কিছু তখন

জ্বলছে, অন্ধকারে ডুবে যাচ্ছে। একি বলল সুব্রত? সুব্রত কি তাকে ভালোবাসে না? ভালোবাসলে কেউ কি তার ভালোবাসার বস্তুকে অন্যের হাতে ছেড়ে দিতে চায়? তাহলে? সুব্রত কি দ্বিতীয় বিকাশ?

টলতে টলতে কৃষ্ণা গিয়ে বিছানার ওপর বসল। জানা কথা, তার পোড়া অদৃষ্টে দুঃখ ছাড়া অন্য কিছু নেই। কিন্তু একি হল তার? সে তো সুব্রতকে ঘৃণা করতে পারছে না, তার ওপর রাগ করতে পারছে না, হৃদয় থেকে তাকে মিটিয়ে ফেলতে পারছে না!

উত্তেজিত মস্তিকের প্রথম পর্ব্ব শেষ হয়ে গেল।

সুব্রত ভেবেছিল যে হয়ত তার ভালোবাসাটা সাময়িক একটা উত্তেজনা। উদারতাবশতঃ সে কৃষ্ণার জন্য পাত্রের খবরটাও যোগমায়াকে দিয়ে এল। যাকে ভালোবাসে তাকে মানুষ মাঝে মাঝে পীড়ন করেও আনন্দ পায়। কৃষ্ণাকে ভালোবেসেও অন্য পাত্রের সন্ধান দিয়ে সুব্রত যেন পরোক্ষে একটু আঘাতই করল কৃষ্ণাকে, তাকে আঘাত করে দুঃখ-মিশ্রিত একপ্রকার আনন্দবোধ করল, যেন তার অবচেতন মনটা আরো একটু পরীক্ষা করতে চাইল মেয়েটিকে। কিন্তু ব্যাপারটা যতটা সহজ মনে হয়, আসলে ততটা সহজ নয়। পীড়ন করে আনন্দ পাওয়াতেই কিন্তু ব্যাপারটা থামে না। তখন থেকে আর একটা পর্ব্ব সুরু হয়। অনুতাপ-পর্ব্ব। সুব্রতেরও তাই সুরু হল।

একি করল সে? ইচ্ছে করে কৃষ্ণাকে সরিয়ে দিচ্ছে জীবন থেকে! কেন? কৃষ্ণার কি দোষ?

তার সংসার পাতবার ক্ষমতা নেই? কথাটা কি সত্যি! ছকে-কাটা আরামের জীবন ক'টা মানুষের ভাগ্যে জোটে? দুঃখ, দারিদ্র্য

অনিশ্চিত জীবন-সংগ্রাম - তা তো চিরকালই আছে, তার মাঝেই তো পথ করে নিতে হবে, জীবনকে চালু রাখতে হবে, পূর্ণাঙ্গ করতে হবে, জীবনের দাবীকে মেটাতে হবে। যে সরে দাঁড়ায় সে তো কাপুরুষ। না, সে আর যাই হোক, কাপুরুষ নয়। তাছাড়া জীবনে স্থান দেবার ইচ্ছে না থাকলে সে ভালোবাসল কেন? কারো জীবন নিয়ে খেলা করার অধিকার তো তার নেই।

এসব যুক্তি তর্কের চেয়েও জোরালো আর একটা যুক্তি—তার হৃদয়ের উক্তি। সেখানে যে এখন হাহাকার ধ্বনিত হচ্ছে। বারংবার নিজেকে ছোট মনে হচ্ছে, মনে হচ্ছে যেন সে নিজের পায়ে কুড়ুল মেরেছে। না, অসম্ভব, কৃষ্ণাকে ছাড়া তার চলবে না।

কি যেন হয়েছে তার। প্রতি মুহূর্ত্তে কৃষ্ণাকে দেখতে ইচ্ছে করছে, নিবিড় করে তাকে পেতে ইচ্ছে করছে। এই ভালোবাসা।

ছবি আঁকতে গিয়ে ছবি আঁকা আর হয় না। আঁকতে গেলেও ছবি খারাপ হয়ে যায়। চৈত্রের খরতপ্ত পৃথিবীর বুক থেকে দমকা হাওয়া এসে কাগজপত্তর উলটেপালটে দেয়, সেদিকে ভ্রূক্ষেপও করে না সুব্রত। মনটা উদাস, ভার ভার মনে হয়। মনে হয় কৃষ্ণা থাকলে বেশ হত এখন। সে চা তৈরী করত, সুব্রত গল্প করত আর ছবি আঁকত। অসংলগ্ন কথা আর ছবি আসে সুব্রতের মাথায়। কৃষ্ণা থাকলে বেশ হত। হয় এখানে, নয়তো দূরে, বহুদূরে তারা কোথাও বেড়াতে যেত। শাল তাল তমালের দেশে—সূর্য্যোদয় আর সূর্য্যাস্তের আলোতে—ফুল-ফোটা নানা দিনে ও রাতে—ব-হু দূ-রে—

কিছুই ভালো লাগে না সুব্রতের। সেদিনের পর থেকে কৃষ্ণাও আর আসেনি। হয়ত লজ্জা। কিংবা সে যোগমায়াকে পাত্রের কথা বলার পর হয়ত রাগ করেছে কৃষ্ণা।

দিন আর কাটে না। বিকেল হলেই বাইরে বেরিয়ে পড়ে সুব্রত। কিন্তু বাইরে গিয়েও সে শান্তি পায় না, কৃষ্ণাকে দেখতে ইচ্ছে করে। তখন এখানে ওখানে গিয়ে এক আধ পেগ মদ খায় সে। ভাবে যে নেশার ঘোরে হয়ত একটু ভালো লাগবে। কিন্তু কিছুই হয় না। বাড়ী ফেরে সে। নিজের ঘরে বসে কান পেতে থাকে প্রত্যেকটি শব্দের দিকে। যদি কৃষ্ণার গলা শোনা যায়। কিন্তু কিছুই শুনতে পায় না সে। কৃষ্ণা যেন আজকাল একেবারে বোবা হযে গেছে। দিনের বেলা ওপর থেকে মাঝে মাঝে সে উঁকি মারে, যদি একবার কৃষ্ণাকে দেখা যায়। কিন্তু দেখতে পায় না সে। এমনিভাবে জীবন তার কাছে দুঃসহ হয়ে উঠল। প্রতিটি মুহূর্ত্ত যেন একটা যুগ, প্রতিটি মিনিট যেন অনন্ত কাল-সমুদ্র। বুক হাল্‌কা মনে হতে লাগল, চোখের সামনে সব কিছু নিষ্প্রভ হয়ে আসতে লাগল, রাতে চোখে ঘুম এল না। সমস্ত অস্তিত্ব দিয়ে সুব্রত অনুভব করল যে কৃষ্ণাকে না হলে তার চলবে না।

একদিন, দু'দিন, তিনদিন কাটল। শেষে তার সহ্য হ'ল না।

তখন বেলা এগারোটা হবে।

দৃঢ়পদে নীচে নেমে গেল সুব্রত।

যোগমায়া কলতলায় ছিলেন বলে সুব্রত মণ্টুকে ডাকল।

"মণ্টু"—

"কি বলছেন?"

"তোর দিদিকে একবার ডেকে দে তো, বল দরকার আছে।"

বলেই সে ওপরের বারান্দায় গিয়ে দাঁড়িয়ে রইল, রুদ্ধশ্বাসে প্রতীক্ষা করতে লাগল।

একটু পরেই মৃদু পদশব্দ ধ্বনিত হল। কৃষ্ণাকে দেখা গেল।

সুব্রত এগিয়ে গেল, কৃষ্ণার ডান হাতটা ধরল।

কৃষ্ণা মাথা নীচু করে রইল। সুব্রত দেখল যে তার মুখ শুকনো, চিন্তাক্লিষ্ট।

সে বলল, "ভেতরে এসো।"

"কেন?

"দরকার আছে।"

কৃষ্ণাকে সে ভেতরে নিয়ে গেল। তার হাতের মুঠোয় থর থর করে কাঁপছে কৃষ্ণার হাত।

"কৃষ্ণা"—

"উঁ?"

এক নিঃশ্বাসে সুব্রত বলল, "সেদিন তোমাকে বলেছিলাম যে তুমি সুন্দর, কিন্তু আসল কথাটাই সেদিন আমি বলিনি তোমাকে—আজ বলব?"

অস্ফুটকণ্ঠে কৃষ্ণা বলল, "বল"—

"আমি তোমাকে ভালবাসি—তোমাকে ছাড়া আমার চলবে না।"
কৃষ্ণা চোখ বুজল। সুব্রত দু'হাত বাড়িয়ে তাকে নিজের দিকে আকর্ষণ করল। দুর্ব্বলভাবে একবার বাধা দিল কৃষ্ণা, কিন্তু পারল না, নিঃশব্দে সে সুব্রতের দিকেই এগিয়ে এল, তার বুকে মাথা রাখল।

তারপর সে মৃদুকণ্ঠে বলল, "তা'হলে—তা'হলে তুমি পাত্রের খবর নিয়ে দিলে কেন?"

সুব্রত হাসল, "তখনো বুঝতে পারিনি যে তোমাকে এতটা চাই। আজ বুঝতে পেরেছি—আজ সমস্ত পরিষ্কার হয়ে গেছে আমার কাছে।"

নিঃশব্দতা। গভীর নিঃশব্দতা।

"কৃষ্ণা"—

"উঁ?"

"কিছু বললে না যে?"

"বলেছি তো।"

সুব্রত হাসল। সত্যিই তো, কৃষ্ণার বুকের স্পন্দন কি তাকে কিছু বলছে না?

"চল কৃষ্ণা"—

"কোথায়?"

"আমার মায়ের কাছে আশীর্ব্বাদ চাইগে"—

ইন্দুমতী রান্না করছিলেন। সেখানে গিয়ে দাঁড়াল দু'জনে।

"কি খবর রে তোদের?" ইন্দুমতী তাদের দেখে একটু অবাক হলেন।

"একটা কথা আছে মা।" সুব্রত বলল।

"কি?"

"তোমার ছেলের বৌ তোমাকে প্রণাম করতে এসেছে।"

কৃষ্ণা গিয়ে ইন্দুমতীকে প্রণাম করল।

ইন্দুমতী মুহূর্ত্তের জন্য স্তব্ধ হয়ে রইলেন, তারপর হেসে উঠলেন "ওঃ, তোদের এই খেলা চলছিল চুপি চুপি! সুব্রত, তোর যে বুদ্ধি আছে তা এ্যাদ্দিনে টের পেলাম—তুই সোনা কুড়োতে শিখেছিস্। আয় মা, আমার বুকে আয়"—

কৃষ্ণা কেঁদে ফেলল। হঠাৎ যেন ইন্দ্রজাল ঘটছে তার জীবনে।

সুব্রত বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

"কোথায় যাচ্ছিস্ তুই"—

"নীচে—এখুনি আসছি"—

নীচে গিয়ে যোগমায়াকে ডাক দিল সুব্রত। যোগমায়া কলতলা থেকে এলেন।

"কি বাবা! কাপড় কাচ্‌ছি, খুব দরকার বুঝি?"

"হ্যাঁ মাসীমা।"

"কি ব্যাপার?"

সুব্রত একটু আম্‌তা আম্‌তা করে বলল, "কাল, কাল রবিবার"—

যোগমায়া মাথা নাড়লেন, "হ্যাঁ, মনে আছে। আজ ওঁকে বলে সব ঠিক করব আমি"—

সুব্রত মুখটা ঘুরিয়ে নিয়ে বলল, "সেই কথাই বলতে এসেছি—কাল ওরা আর দেখতে আসবে না" -

যোগমায়ার মুখ ম্লান হয়ে গেল, ক্ষণকাল স্তব্ধ থেকে তিনি প্রশ্ন করলেন, "কেন বাবা, কি হলো?"

সুব্রত বলল, "তার'আর দরকার নেই।"

"কেন?"

"আমিই বিয়ে করব কৃষ্ণাকে—আপনার আপত্তি আছে?"

যোগমায়া যেন হাতে স্বর্গ পেলেন, কথা বলতে আবেগে তার গলা ধরে এল, তিনি বললেন, "আপত্তি! তোমাকে পেলে আমি জানব যে আমার কৃষ্ণা শিবের মত বর পেল। মনে প্রাণে আমি আশীর্ব্বাদ করছি বাবা, তোমরা যেন শত্তুরের মুখে ছাই দিয়ে সুখী হও"—হঠাৎ থেমে গেলেন যোগমায়া, তাঁর মুখটা মলিন হয়ে গেল, বিষণ্ণ হেসে তিনি আবার বললেন, "কিন্তু আমি কে বাবা? তুমি ওঁর বাপকে বলো কথাটা, তাঁকে নিয়েই ত সব গণ্ডগোল"—

সুব্রত মৃদু হেসে বলল, "আপনি ভাববেন না, ওসমস্ত চিন্তা আমার।"

এই পর্য্যন্ত ঘটবার পর সুব্রত আমার সঙ্গে দেখা করেছিল।

দুপুরবেলা বসে বসে কয়েকজন নবীন লেখকের লেখা পড়ছিলাম। হঠাৎ সুব্রত এসে হাজির হল।

"কি খবর সুব্রত?"

সুব্রতের দিকে তাকালাম। না, সেদিনকার মত সে আজ গম্ভীর বা অন্যমনস্ক নয়। বহু-পরিচিত হাস্যমুখ সুব্রতকেই আজ দেখতে পাচ্ছি।

সুব্রত বসল, সেই দিনের একটা খবরের কাগজ টেনে নিয়ে সহাস্যে বলল, "তোমাকে একটা খবর দিতে এলাম সম্পাদক।"

"দাও"—

"কৃষ্ণাকে দেখতে যাঁরা কাল যাবেন তাঁদের তুমি নিষেধ করে দিও আজকে"—

বিমূঢ় চোখে প্রথমে একবার তাকালাম সুব্রতের দিকে, দেখলাম সে মিটি মিটি হাসছে, পরে প্রায় লাফিয়ে উঠে বললাম, "তার মানে? তুমি কি বলছ সুব্রত"

"বলছি যে ওঁরা যেন কৃষ্ণাকে দেখতে না যান।"

"কেন তাই শুনি?"

"দরকার নেই আর।"

"বাট্ হোয়াই, কেন?" সত্যি খুব রাগ হল আমার, বললাম, "তোমার বুঝি তাহলে একটু রসিকতার ইচ্ছে ছিল আমার সঙ্গে—তাই"—

সুব্রত আমাকে বাধা দিল, হেসে বলল, "একটু শান্ত হও সম্পাদক, আমাকে দুর্ম্মতি ভেবো না। আসলে ব্যাপার অন্য"—

"কি ব্যাপার ?"

"আমার জীবনে হঠাৎ বিপ্লব এসেছে।"

সুব্রতের কথাবার্তার ধাঁচ বুঝতে না পেরে আরো রেগে উঠলাম। বিপিনকে নিষেধ করতে হবে, এই কথাতেই তো আমার অহং টং হয়ে গেছেন, তদুপরি হেঁয়ালী—অসহ্য। বললাম, "দেখ সুব্রত, হেঁয়ালী উপভোগ করার মত মানসিক অবস্থা আর আমার এখন নেই, আসল কথাটি স্পষ্ট করে বল।"

সুব্রত আবার আগের মতই হাসল, বলল, "তোমার কথাই ঠিক সম্পাদক, জীবন মাঝে মাঝে নারীর ছদ্মবেশেই আসে"—

রাগটা একটু কমল, কৌতূহলান্বিত হয়ে প্রশ্ন করলাম, "তার অর্থ ? কেউ এসেছে নাকি ?"

সে মাথা নেড়ে বলল, "হ্যাঁ—তাকে যাচাইও করে নিয়েছি—দেখেছি যে সে খাঁটি সোনা।"

একটু ব্যঙ্গের খোঁচা দিয়ে বললাম, "কিন্তু তার আগে তুমি নিজেকে যাচাই করেছ তো ? তোমার প্রেম 'প্রেম' না অন্য কিছু ? অল্প বয়সে কিন্তু সব মেয়েমানুষকেই ভালবাসতে ইচ্ছে করে।"

"সম্পাদক, তুমি একটি শয়তান।"

"তুমি বৃহত্তর শয়তান—কিন্তু আসল কথা চাপা দিওনা, বল দেখি মেয়েটি—" কিন্তু প্রশ্ন করতে গিয়েই আমি থেমে গেলাম। মুহূর্তে মেয়েটি কে তা আমি বুঝতে পারলাম, বললাম, "দাঁড়াও, বলো না। আমি তোমার প্রণয়িনীকে চিনি"—

সুব্রত অবাক হল, "তুমি চেন ? কে বল দেখি ?"

একটু হেসে বললাম, "কৃষ্ণা—ভোলানাথবাবুর মেয়ে।"

"কি করে বুঝতে পারলে তুমি ?"

"অন্তর্দৃষ্টি, বন্ধু গভীর অন্তর্দৃষ্টি। যাক্ সে কথা, এবার সব খুলে বল দেখি। ভো দুরাশয় দুইন, ডুবে ডুবে তুমি যে এত জল খেয়েছ তা তো একটুও বলনি, এখন তার প্রায়শ্চিত্ত কর—"

সুব্রত বলল, "তথাস্তু—"

পুরো একঘণ্টা ধরে সে সমস্ত কাহিনীটাকে শুনিয়ে গেল। এতক্ষণ সময় লাগার কথা নয়, দশ মিনিটেই সমস্ত কথা বলা যেত। কিন্তু করি আর কি, শুনে গেলাম। প্রেমে পড়লে মানুষেরা একটু বেশী বক্ বক্ করে, তখন তাদের মাত্রাজ্ঞান লোপ পায় আর কেমন যেন একটু বোকাটে হয়ে ওঠে তাদের হাবভাব।

সব শুনে বললাম, "ব্রাভো, চমৎকার শিল্পীরাজ। তুমি এবার ছোট ক্যানভাস্ ছেড়ে জীবনের মস্ত বড় ক্যানভাসে রং বুলোতে বসলে—তোমার জয় হোক। কিন্তু প্রণয়-রজ্জুর বন্ধনে এবার ঝুলবে কি করে?"

সুব্রত একটু চিন্তিতমুখে বলল্ "সেইটেই ভাবিয়ে তুলেছে। ভোলানাথবাবুর ইভিল জিনিয়াসের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে গোকুল ভট্টাচার্য্য—তারা আমাকে হয়ত বাধা দেবে—"

"কেন? তুমি পাত্রটি তো সোনার টুক্‌রো হে—"

"সোনার টুক্‌রো কিনা তা জানিনা—তবে এটা জানি যে নিতান্ত পাথরের টুক্‌রোও নই। আসল ব্যাপার তো তা নয়, আমাকে ওরা দু'চোখে দেখতে পারে না। তাছাড়া বিয়ের আগে 'প্রেম' জিনিষটা যে ওদের কাছে পাপ—"

"ভোলানাথবাবু'র ব্যাপারটা বুঝি, কিন্তু গোকুলের এত আক্রোশ হবে কেন?"

সুব্রত হাসল, "গোকুলও কৃষ্ণাকে ভালবাসে।"

কথাটা অপ্রত্যাশিত নয়। অনেকদিন আগেই কথাটা আঁচ করেছিলাম আজ পরিষ্কার হয়ে গেল। গোকুল কৃষ্ণাকে ভালবাস, তাকে সে কামনা করে, কিন্তু তার কামনা কোনদিনই সার্থক হবে না। সীমাবদ্ধ উপার্জ্জন-ক্ষমতা, আত্মীয়তা এবং অযোগ্যতা'র দরুন সে শুধু জ্বলে জ্বলেই মরবে। এবং সে তা জানে। জানে বলেই সে আক্রোশে বাধা সৃষ্টি করে যাবে, যে কৃষ্ণাকে পেতে চাইবে তারই সামনে সে দেওয়াল হয়ে দাঁড়াবে। নিজে যা সে পাবে না, অপরকেও সে তা পেতে দেবে না।

প্রশ্ন করলাম, "কৃষ্ণা'র বয়েস কত হবে?"

সুব্রত জবাব দিল, "কুড়ির কম নয়।"

একটু ভেবে নিয়ে বললাম, "মাভৈ শিল্পীশ্রেষ্ঠ, চিন্তা কোর না। চুলোয় যাক গোকুল ভট্টাচার্য্য এবং ভোলানাথবাবুকেও তোয়াক্কা কোর না। সব ঠিক হয়ে যাবে। এবার আমি যা বলি মন দিয়ে শোন—"

"বল—"

"তোমাকে বাসা বদ্‌লাতে হবে- যত শীগ গির সম্ভব"—

"বাঃ, বাড়ী পেলে তো?"

"সে চেষ্টা আমি করব। সাহিত্য-যশাকাঙ্খী কোন ধনীপুত্রকে মিষ্টি কথায় কাৎ করে আমি কাজ হাসিল করে নেব। ইতিমধ্যে তুমি ভোলানাথবাবুর কাছে প্রস্তাব কর। যদি সহজেই মিটমাট হয় তাহলে তো বহুৎ আচ্ছা, নইলে বাড়ী বদল করে রেজিষ্ট্রী বিবাহ। পাত্রী সাবালিকা, আইন বাধা দেবে না। তাছাড়া জানোই ত, যুদ্ধে বা প্রণয়ে জয়লাভ করতে হলে কোন পন্থাই অন্যায় নয়।"

সুব্রত একগাল হেসে বলল, "অনিমেষ রায়, তোমার বুদ্ধি আছে।"

আত্মগর্ব্বে স্ফীত হয়ে বললাম, "তা নইলে কি আর কাগজ চালিয়ে খেতে পারতাম ভায়া।"

"তুমি অতুলনীয় সম্পাদক।"

"আমাকে যথার্থই চিনতে পেরেছ। কানাই, আমার গুণমুগ্ধ এই পাষণ্ডকে এক কাপ চা এনে দাও"—

সুব্রতের অট্টহাসিতে আমার ছোট্ট ঘরটি কেঁপে উঠল।

আট

সুব্রতকে আমি যা নির্দ্দেশ দিয়েছিলাম সেই অনুযায়ী সে কি করেছিল এবার তা বলার পালা সুরু হল। কিন্তু তার আগে গোকুল ভট্টাচার্য্যের বিষয়ে একটু বলতে হয়।

গোকুল কৃষ্ণাকে ভালোবেসেছে। পুরুষ নারীকে ভালোবাসবে এতে অস্বাভাবিকতা কিছু নেই, তবু গোকুলের কথা শুনে মনটা সায় দিতে পারেনি। প্রত্যেকেই ভালোবাসতে চায়, গোকুল যে ভালোবাসতে চাইবে তাতেও আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই। কিন্তু কথা হচ্ছে, যাকে তাকে ভালোবাসলেই তো হয় না, নিজের যোগ্যতা সম্বন্ধে সজ্ঞান হয়ে ভালোবাসা উচিত। আমি সুব্রতের বন্ধু বলে বোধ হয় কথাগুলো গোকুলের বিপক্ষে যাচ্ছে, অতএব থাক্, কোন মন্তব্য না করে আমি গোকুলের কথা বলে যাই।

যেদিন সুব্রত আমার কাছে এসে সব কথা জানাল ঠিক সেদিন সন্ধ্যে বেলাকার কথা।

ভোলানাথবাবু নিজের ঘরে বসে খবরের কাগজ পড়তে পডতে বিড়ি টানছিলেন। যোগমায়া আর কৃষ্ণা তখন রান্নাঘরে, বাকী সবাই পাশের ঘরে পড়াশোনা করছিল। ঠিক এমনি সময় গোকুল এসে দাঁড়াল সেখানে।

ভোলানাথবাবু গোকুলকে দেখে একটু অবাক হলেন, "কি হল গোকুল, আজ গান শেখাতে যাওনি?"

গোকুল বসতে বসতে মাথা নাড়ল, "আজ্ঞে না।"

"কেন? কি হয়েছে?"

গোকুল একটু মুখবিকৃত করে বলল, "আজ্ঞে ডান পা'টা একটু মচকে গেছে বেকায়দায় পড়ে—তাই আর গেলাম না। রিকসায় করে অবিশ্যি যাওয়া যেত, কিন্তু যা ভাড়া—হেঁ হেঁ"—

ভোলানাথবাবু নীচের ঠোঁট উলটে মাথা দোলালেন দু'তিনবার, বললেন, "ঠিক করেছ, বাজে খরচ কি আমাদের পোষায়? যা দিনকাল পড়েছে"—

গোকুল উৎসাহিত হয়ে উঠল, "তা ত নিশ্চয় কাকাবাবু—চড়া স্বরে কথা কইছে সব কিছু। ভাত কাপড় তেল নুন কেরাসিন—কোন জিনিষটা সস্তা—যে বাগে পাচ্ছে সেই লুটে নিচ্ছে"—

ভোলানাথবাবু একটু অন্যমনস্কভাবে বললেন, "যা বলেছ"—

গোকুল তার জ্বল জ্বলে চোখ মেলে একবার ভোলানাথবাবুকে দেখে নিল, পরে আবার সুরু করল, "তবে এতে বড়লোকদেব তো আর কোন চিন্তা নেই, বুয়েচেন না, একের জায়গায় দশ খরচা করবে তারা। যত মরণ হয়েছে তো আমাদের—এই দেখুন না, যথেষ্ট টাকা থাকলে কি আর আমাদের কৃষ্ণার বিয়ে আটকে থাকত? টাকায় পাত্তর কেনা যায়—"

ভোলানাথবাবু একটু নড়ে বসলেন, গোকুলের কথাগুলো তার মনে ধরল, আফ্‌শোষের ভঙ্গী করে তিনি বললেন, "যা বলেছ, টাকা থাকলে কি আর চিন্তা ছিল"—

গোকুল সুর নামিয়ে বলল, "একটি পাত্রের সন্ধান আছে কাকাবাবু"।

"তাই নাকি? কি রকম পাত্তর?"

আম্‌তা আম্‌তা করে, অবনত মস্তকে বলল গোকুল, "আজ্ঞে আমার চেনা লোক, সেও গানের মাষ্টারী করে, রোজগার মন্দ না"—

ভোলানাথবাবু মুখ বিকৃত করলেন, "দূর গানের মাষ্টারীতে কি এমন রোজগার হবে? তুমি তো মাষ্টারী কর—তুমিই বল না—"

একবার ঢোঁক গিলে গোকুল বলল, "তা—তা মন্দ কি—মাসে আশি টাকা পর্য্যন্ত হয়, পরে আরো বাড়বে।"

"ছাই বাড়বে। এমাসে হয়ত আশি হচ্ছে, পরের মাসেই হয়ত দশটাকায় দাঁড়াবে। না, ওসব আমার পছন্দ নয়। তা ছাড়া পাত্তর তো আমি ঠিক করেই রেখেছি"—

শুষ্ককণ্ঠে গোকুল প্রশ্ন করল, "আছে—কে?"

"আমাদের বড়বাবু। সে দিন তাঁকে বুঝিয়ে বলেছিলাম সব কথা। তিনি বলেছেন, বেশ তো, আরো দিনকতক না হয় সবুর করা যাক্ ভোলানাথবাবু। যৌবনকালের তেজ, ও দুদিনেই ঠিক হয়ে যাবে, আর আপনার মেয়ের কথা শুনে আমার আগ্রহ বেড়ে গেছে ভোলানাথবাবু— এমন তেজী মেয়েই আমার দরকার। বুঝলে গোকুল, আমি তক্কে তক্কে আছি, একদিন আচমকা ঘনশ্যামবাবুকে এনে কৃষ্ণাকে দেখিয়ে দেব দূর থেকে, তারপরে শুভদিন দেখে লাগিয়ে দেব। হুঃ, মেয়ের জিদকে যেন আমি ভয় করি—এই যে চুপচাপ আছি এটা স্রেফ চাল"—

"আজ্ঞে"—

"আর ঘনশ্যামবাবু পাত্তরটি কি যে সে? বড়বাবু, আমাদের হেড ক্লার্ক, শ্যামবাজারে একটি বাড়ী আছে, দেশে জমিজায়গা আছে, ব্যাঙ্কে টাকা আছে, ইনসিওর আছে, ছোট্ট একটা কাপড়ের দোকান আছে হ্যারিসন রোডে—অভাবটা কোথায়? হতভাগী তো ওখানে আরামে থাকবে। না না, আর কোন পাত্তরের দরকার নেই গোকুল"—

"আজ্ঞে আচ্ছা"—

গোকুল চুপ করে রইল, খানিকক্ষণ বাদে সে মৃদুকণ্ঠে আবার বলল, "যা করবার তা কিন্তু তাড়াতাড়ি করে ফেলবেন কাকাবাবু—"

"কেন বল ত?"

"এমনি—মানে বাড়ীতে নানারকমের লোক আছে তো, বুয়েচেন না, কোথেকে কি হয়ে যাবে, পাঁচজনে শেষে টিট্‌কিরী দেবে"—

ভোলানাথবাবু মাথা নাড়লেন, "তা কি আর বুঝিনি? খুব বুঝেচি, এইবার দেখ না, শিগ্‌গীরই লাগিয়ে দিচ্ছি, যত শিগ্‌গীর পারি বুকের পাষাণ আমি এবার নামিয়ে ফেলব, মুক্তির নিঃশ্বেস ফেলব।"

"আজ্ঞে"—

গোকুল চুপ করে রইল! ভোলানাথবাবু আবার কাগজে মনোনিবেশ করলেন, বিড়িটা নিবে গিয়েছিল। সেটাকে আবার ধরিয়ে নিলেন তিনি, জোরে জোরে টানতে লাগলেন। তাঁর দিকে তাকিয়ে মিনিট কয়েক ঠায় চুপ করে কি যেন ভাবতে লাগল গোকুল। জানালা দিয়ে হাওয়া আসছিল, তবু ঘেমে উঠল সে, বিন্দু বিন্দু ঘাম জমা হল তার কালো চামড়ার ওপর। তারপর সে দাঁড়াল, অত্যন্ত ক্লান্ত ভঙ্গীতে সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

সেদিন মাঝরাতে বাড়ীর লোকদের অনেকের ঘুম ভেঙ্গে গিয়েছিল। অর্দ্ধ-জাগ্রত অর্দ্ধ তন্দ্রাঘোরে তারা গোকুলের গান শুনতে পেয়েছিল। অন্ধকারে বসে গোকুল ভৈরবী গাইছিল। সহর শান্ত, গলির মধ্যেও তখন তেমন শব্দ ছিল না! সেই নিঃশব্দ পরিবেশের মধ্যে, গোকুলের ভরাট ও ভারী গলা শুনতে শুনতে বিচিত্র বেদনা অনুভব করেছিল সবাই। রাতের পৃথিবীর অন্ধকার বুক থেকে যেন বহুদিনের সঞ্চিত বেদনা একটি রাগকে আশ্রয় করে বেরিয়ে আসছিল। গোকুল গাইছিল, বহু প্রাচীন একটি হিন্দীগান—

'সুখকে দিন বিত্ গই
আশ্ নিরাশ্ ভই।
দিনকা সুরয রাত্কা চাঁন্দ্নী,
আঁখে অওর দিল্কা রোশ্নী,
ঘোর অন্ধের মে সমাঁই॥

সুখের দিন অতীত হয়ে গেছে, আশা নিরাশায় পর্য্যবসিত হয়েছে। দিনের সূর্য্য, রাতের চাঁদ, নয়ন ও হৃদয়ের আলো -সব কিছুই এখন ঘোর অন্ধকারে ডুবে গেছে। হায়, আমার সুখের দিন অস্তমিত হয়েছে"—

পরদিন সকালে সবাই দেখল যে গোকুলের ভাঙ্গা গাল যেন আরো ভেঙ্গে গেছে, চোখের নীচে অনিদ্রার কালো ছায়া যেন দাগ কেটে বসেছে। শরীর খারাপ বলে সে আর বেরোল না তখন, ঘরেই বসে রইল আর ভাবতে লাগল।

বেলা বাড়তে লাগল। ভোলানাথবাবু অফিসে গেলেন। তখন গোকুল ঘর থেকে বেরোল, অন্দরের দিকে গিয়ে কৃষ্ণাকে ডাকল।

"কৃষ্ণা, সেদিন তোমাকে যে গানের স্বর-লিপিটা করে দিয়েছি তা একবার নিয়ে এসো তো, একটু ভুল আছে তাতে"—

এমন অসময়ে গোকুল স্বর-লিপির তাগিদ কেন করল তা ভেবে পেলো না কৃষ্ণা, তার তখন অনেক কাজ বাকী। ভাইবোনদের ময়লা জামা কাপড় ক্ষারে দিয়ে ধোবে, চান করবে, সুব্রতের জন্য একটা রুমাল তৈরী করছে, সেটা শেষ করবে, ভবিষ্যৎ জীবনের সোনালী স্বপ্ন দেখবে।

সে বলল, "এখন থাক গোকুলদা, বিকেলে দেখবেন।"

গোকুল মাথা নাড়ল, "উঁহু, বিকেলে সময় হবে না। তাছাড়া এখন না ঠিক করে দিলে পরে ভুলে যাব"—

অগত্যা খাতাটা নিয়ে এল কৃষ্ণা।

খাতা খুলে শেষ স্বর-লিপিটার জায়গায় জায়গায় পেনসিল দিয়ে কাটতে সুরু করল গোকুল।

কৃষ্ণা বলল, "আমি যাই গোকুলদা, আপনি ঠিক করুন।"

"না, দাঁড়াও। দুটো কথা আছে।"

"কি কথা আবার ?" কৃষ্ণা মনে মনে বিরক্ত হয়ে উঠল। হয়ত এবার খানিকক্ষণ সুব্রতের নিন্দে করে উপদেশামৃত বর্ষণ করবে গোকুলদা।

গোকুল বলল, "কাল কাকবাবুর সঙ্গে কথা হয়েছে—তিনি সেই বুড়োর সঙ্গেই তোমার বিয়ে দেবেন।"

কৃষ্ণা হাসল, "আমার সঙ্গে! উঁহু, বিয়ের সময় তো আমাকে জ্যান্ত পাবে না বাবা।"

গোকুল তাকাল কৃষ্ণার দিকে, দুর্ব্বোধ্য একটা দৃষ্টি মেলে সে বলল, "কাকাবাবুকে আমি চিনি, তাঁর জেদ তিনি ছাড়বেন না, তোমাকেও কষ্ট দেবেন। তার চেয়ে এক কাজ কর না কেন ?"

"কি কাজ ?"

"কোথাও চলে যাই চল"—

কৃষ্ণা সোজা হয়ে দাঁড়াল, "কি বলছেন আপনি গোকুলদা !"

"কেন, দোষ কি ? মানুষ শান্তি চায়, যে ভাবেই হোক"—

"গোকুলদা !" তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলে উঠল কৃষ্ণা।

গোকুল থেমে গেল, নির্ব্বোধ জন্তুর মত তাকাল কৃষ্ণার দিকে।

গভীর ঘৃণার সঙ্গে কৃষ্ণা বলল, "ফের এসব কথা বললে কিন্তু বাবাকে বলে দেব আমি, বুঝলেন ? ছি, ছি, ছি, আপনার মাথা খারাপ হয়ে গেছে।"

গোকুল ম্লান হাসল, বলল, "বুঝেছি। এ বিষয়ে আর কিছু বলব না আমি। শুধু আর একটা সাধারণ কথা আছে"—

কঠিন দৃষ্টি মেলে সন্দিগ্ধভাবে কৃষ্ণা প্রশ্ন করল, "কি ?"

"সেদিন সুব্রতবাবুর ঘরে তোমার ছবি দেখেছি আমি"—

"বেশ করেছেন। তারপর ?"

"তুমি কি সুব্রতবাবুকে ভালবাস ?"

গর্ব্বোদ্ধতা রাজ কন্যার মত কৃষ্ণা চিবুক তুলে অন্যদিকে তাকাল, বলল, "হ্যাঁ, তাঁকে আমি ভালোবাসি। কেন বলুন তো ? বাবাকে এ খবরটা দিতে হবে বুঝি ?"

গোকুলের মোটা নাকটা তখন ফুলে আরো মোটা হয়ে উঠেছে, তার রাত-জাগা রক্তিম চোখের তারাগুলো চক চক করছে। সে মৃদু কণ্ঠে বলল, "না, কাউকে দেব না এ খবর --চিন্তা কোরনা। খবরটা শুধু আমারই দরকার ছিল।"

খাতাটা নামিয়ে রেখে গোকুল ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। বজ্রাহত মুমূর্ষ মানুষের মত।

সেদিনই সন্ধ্যের পর সুব্রত হানা দিল ভোলানাথবাবুর কাছে। গোকুল তখন বাড়ী ছিল না সেই যে দুপুরে সে বেরিয়ে গেছে, তারপর আর ফেরেনি।

ভোলানাথবাবুর কাছে গিয়ে বিয়ের প্রস্তাব করাটাই সুব্রতের কাছে সব চেয়ে বিপজ্জনক ব্যাপার হয়ে উঠল। বোধ হয় জীবনেও সে এত বিপদে পড়েনি। স্বার্থপর, অর্থলোভী মানুষদের সঙ্গে তার কোনদিনই খাপ খায় না। তা'ছাড়া তাকে তো ভদ্রলোক মোটেই পছন্দ করেন না। একসঙ্গে এতদিন থাকার ফলে অবশ্য দু'একটা মামুলি কথা হয়েছে দু'জনের মধ্যে, কিন্তু তা নেহাৎই সামান্য।

কি করা যায়? ভেবে কিছুই স্থির করতে পারে না সুব্রত যে কি ভাবে সে কথাটা পাড়বে। অনেক ভাবতে ভাবতে শেষ পর্য্যন্ত একটা উপায় স্থির করল সে।

চুপি চুপি অমুকে ওপরে ডেকে নিয়ে গেল সুব্রত; তারপর দশ মিনিটে তার একটা স্কেচ করে ফেলল। অমুকে ছেড়ে দিয়ে সে পদ-শব্দের দ্বারা আত্ম-ঘোষণা করতে করতে ভোলানাথবাবুর ঘরের দোর গোড়ায় গিয়ে দাঁড়াল।

দরজার গোড়ায় জুতোর শব্দ শুনে ভোলানাথবাবু তাকালেন সেদিকে।

সুব্রত বিনীতকণ্ঠে বলল, "একটু দরকার আছে। আসব?"

ভোলানাথবাবু তখন চা পান করছিলেন, সুব্রতের এই আকস্মিক আবির্ভাবের হেতু না বুঝতে পেরে তিনি বললেন, "এসো"—

সুব্রত ভেতরে গেল।

তার গলার আওয়াজ পেয়ে তখন ভেতরের দিকের দরজার আড়ালে দুটি নারী এসে দাঁড়িয়েছে।

ভোলানাথবাবু প্রশ্ন করলেন, "কি দরকার?"

সুব্রত অমু'র স্কেচটা বাড়িয়ে দিয়ে বলল, "অমু'র একটা ছবি এঁকেছি—দেখাতে এলাম।"

সন্দিগ্ধভাবে ছবিটা হাতে নিলেন ভোলানাথবাবু, দেখলেন, তার মুখের কঠিন ভাবটা যেন একটু কেটে গেছে। তিনি বললেন, "হুঁ, মন্দ হয়নি।"

সুব্রত বলল, "আপনারও একটা স্কেচ আঁকতে চাই আমি।"

"আমার!" ভোলানাথবাবু হঠাৎ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে তাকালেন সুব্রতের দিকে, ভুরু কুচকে প্রশ্ন করলেন, "তুমি কি এই কথা বলার জন্যই এসেছ নাকি, না অন্য কথা আছে আরো?

মৃদু হাসি খেলে গেল সুব্রতের মুখে, সে বলল, "ঠিকই ধরেছেন, এসব কথা ছাড়াও আর একটা কথা বলার আছে।"

"কি কথা—বল।"

সুব্রত বলল, "আপনার মেয়ে বিবাহযোগ্যা"—

"হুঁ"—

"তার বিয়ে দেবেন নিশ্চয়ই?"

"দেব।"

সুব্রত থামল, তারপর চোখ-কান বুজে বলে ফেলল, "আমি কৃষ্ণাকে বিয়ে করতে চাই।"

ভোলানাথবাবু যেন বিষম খেলেন, "কি বললে? কৃষ্ণাকে"—

"আজ্ঞে হ্যাঁ, বিবাহ করব।" শুদ্ধ শব্দ প্রয়োগ করে মাথা নাড়ল সুব্রত।

ভোলানাথবাবুর মুখ-চোখ কুটিল হ'য়ে উঠল। এক মুহূর্ত্ত স্তব্ধ থেকে তিনি হঠাৎ ফেটে পড়লেন, "তোমার তো স্পর্দ্ধা কম নয়"—

সুব্রত হাসল, "কেন, আমি পাত্র হিসেবে খারাপ কোথায়? বয়স বেশী নয়, অবিবাহিত, সাচ্চা কুলীনের ছেলে আর ভালো ছবি এঁকে মাসে দু'শো আড়াইশো পর্য্যন্ত উপার্জ্জন করি—তবে?"

ভোলানাথবাবু ক্ষেপে গেলেন, উত্তেজনায় দণ্ডায়মান হয়ে তিনি বললেন, "রসিকতা করতে এসেছ আমার সঙ্গে, এঁ্যা ?"

সুব্রত মাথা নাড়ল, "রসিকতা কোথায়, আপনার মেয়েকে বিয়ে করতে চাইছি। চটছেন কেন? আপনার মেয়ের বিয়ে হচ্ছে না, আমি বিয়ে করব—ব্যস্, আর কি চাই ?"

ভোলানাথবাবু চীৎকার করে উঠলেন, "তোমার আছে কি হে ছোকরা যে তোমার সঙ্গে আমার মেয়ের বিয়ে দেব ? তুমি কি আমায় পাগল ঠাউরেছ ? আমার মেয়ের বিয়ে হচ্ছে না কে বলেছে তোমায় ? তার জন্য অর্থবান্ সুপাত্র ঠিক হয়েই আছে"—

সুব্রত উত্তেজিত হয়ে উঠল এবার, বলল, "সে তো বুড়ো বর"—

"বুড়ো। এখনও পেনসন পেতে তাঁর পাঁচ বছর বাকী, বুড়ো হতে যাবে কেন ?"

"পাঁচ বছর বাদে তো বুড়ো হবে।"

"তোমার সঙ্গে আমি আর তর্ক করব না ছোকরা—তুমি যাও।"

সুব্রত গেল না, প্রশ্ন করল, "তা' হলে আমার সঙ্গে আপনি কৃষ্ণার বিয়ে দেবেন না ?"

ভোলানাথবাবু দৃঢ়কণ্ঠে বললেন, "না।"

"কিন্তু সে যে আমাকে ছাড়া কাউকে বিয়ে করবে না।"

ভোলানাথবাবু শ্বাপদের মত হাসলেন, "আমার মেয়েকে আমি চিনি না ?"

"না, চেনেন না। জিজ্ঞেস করে দেখুন"—

"বটে! আচ্ছা। কৃষ্ণা, ওরে কৃষ্ণা"—কর্কশকণ্ঠে ডাক দিলেন ভোলানাথবাবু।

ভেতরের দরজার আড়াল থেকে পাংশুমুখে এগিয়ে এল কৃষ্ণা, ভেতরে এসে দাঁড়াল।

ভোলানাথবাবু অগ্নিনেত্রে তাকালেন মেয়ের দিকে, প্রশ্ন করলেন, "আমাকে অমান্য করেই কি তুই এই লোকটাকে বিয়ে করবি, এ্যাঁ?"

মাথা নীচু করে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল কৃষ্ণা, জবাব দিল না।

সুব্রত বলল, "বল"—

কৃষ্ণার ঠোঁট নড়ল না।

"বল"—

কৃষ্ণা নিঃশব্দেই দাঁড়িয়ে রইল।

নিঃশব্দতা।

অবাক হয়ে কৃষ্ণার দিকে তাকাল সুব্রত। একি হল কৃষ্ণার? একি হল?

"কৃষ্ণা"—

ভোলানাথবাবু দরজার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করে বললেন, "মানুষ চুপ করেও অনেক সময় জবাব দেয়, তা বুঝি জানো না? নাও এবার তুমি বেরিয়ে যাও এখান থেকে।"

সুব্রত একবার কৃষ্ণার দিকে জল আর আগুন ভরা চাহনি নিক্ষেপ করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। আর ফিরে তাকাল না সে। সোজা ওপরে উঠে সে নিজের ঘরে গেল। তারপরে দরজা বন্ধ করে, বহুদিন বাদে আজ জানালা দিয়ে সে দড়ি, বোতল আর পয়সা ঝুলিয়ে দিল। তিন চার মিনিট বাদেই একটা দেশী মদের বোতল ওপরে উঠে এল। তারপর ধীরে ধীরে সব কুয়াসার মত অস্পষ্ট হয়ে এল—

আবার গোকুলের কথা বলছি।

সেদিন অনেক রাতে ফিরে এল সে। তার খাবার ঢাকা দেওয়া ছিল, তা স্পর্শ করল না সে, চুপচাপ কিছুক্ষণ শুয়ে রইল। তারপর কি ভেবে সে উঠল, বাক্স বিছানা, কাপড়, জামা সব গুছোতে আরম্ভ করল। সেদিন রাতে কেউ তার গানও শুনতে পেল না।

ভোর হতেই গোকুল একটা রিক্‌সা ডেকে নিয়ে এল। নিঃশব্দে সব জিনিষপত্র সে তাতে চাপিয়ে দিল। বাক্স, বিছানা আর একটা হারমোনিয়ম।

ভেতরে এসে ভোলানাথবাবু আর যোগমায়াকে ডেকে ডেকে সে বলল, "আমাকে এখুনি একটা গানের জলসায় যোগ দেবার জন্ম বর্দ্ধমান যেতে হচ্ছে কাকাবাবু—আমি আসি"—

যোগমায়া প্রশ্ন করলেন, "কবে ফিরবে ?

গোকুল হাসল, "ক'দিন আবার—দু'তিন দিন পরে। এই যে চাবিটা"—

ভোলানাথবাবু বললেন, "একেবারে হঠাৎ যাচ্ছ যে? কালও তো কিছু বলনি ?"

গোকুল মাথা নাড়ল, "না, বলিনি—নেমন্তন্নটা কাল রাতে পেতাম।"

"ওঃ—আচ্ছা, তা'হলে এসো।"

গোকুল ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। একটু বাদেই ঠন্ ঠন্ শব্দ করতে করতে রিক্‌সাটা চলে গেল তাকে নিয়ে।

ব্যাপারটা খুব অস্বাভাবিক মনে হয়নি তখন।

অফিস যাবার সময় ভোলানাথবাবু টের পেলেন ব্যাপারটা। তিনি দেখলেন যে ঘরটা খোলা। তার ভেতরে উঁকি মারতে গিয়ে তিনি বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে গেলেন। ঘরে তক্তাপোষটা ছাড়া গোর কুলে আর

কোন জিনিষই নেই! গানের আসরে যেতে হলে কি মানুষ সব কিছু ঝেঁটিয়ে নিয়ে যায়? তবে? কি ব্যাপার? গোকুলের এমন ভাবে চলে যাওয়ার অর্থটা কি?

এরপর গোকুলের আর কোন সংবাদই ভোলানাথবাবু পান নি।

সেদিন বিকেলের দিকে সুব্রত এল আমার কাছে। তাকে দেখে একটু ঘাবড়ে গেলাম। তার মুখ-চোখ রুক্ষ, কঠোর হয়ে উঠেছে।

জিজ্ঞেস করলাম, "কি ব্যাপার, শরীর খারাপ নাকি তোমার?"

আমার কথার উত্তর না দিয়ে সে বলল, "তুমি বাসা বদলের কথা বলেছিলে, দু'একদিনের মধ্যেই আমাকে তা বদলাতে হবে, নইলে চলবে না।"

"কেন, কি হল? ভোলানাথবাবু প্রত্যাখ্যান করেছেন?"

"শুধু তিনি নন, তাঁর মেয়েও"—

"দূর"—

সুব্রত উৎসাহিত হল না, নির্ম্মম দার্শনিকের মত সে বলল, "না, আমি তার প্রমাণ পেয়েছি। তুমি যাই বল না কেন, আমার আগের সিদ্ধান্তই ঠিক। মেয়েরা অত্যন্ত নিকৃষ্ট জীব।"

আমি চেপে ধরলাম তাকে, "অমন সিনিকের মত ফতোয়া দিলেই তো হবে না—সব খুলে বল।"

সুব্রত বলল সব কথা।

আমি শুনে হাসলাম, "এই কথা, এতেই এতটা বিচলিত হবার কি আছে? কৃষ্ণা কি তোমাকে মুখে কিছু বলেছে?"

"না।"

"তাহলে তোমার সিদ্ধান্তে পৌছোনো উচিত হবে না। মেয়েদের বিষয়ে এত সহজে কোন কথা বলা যায় না।"

সুব্রত কথা বলল না, বুঝলাম যে আমার কথায় সে বিশ্বাস করল না।

বললাম, "আমার কথা শোন, যা বলছি তাই কর।"

"কি ?"

"কালই কোর্টে গিয়ে বিয়ের দরখাস্ত করে দেবে চল—বাড়ীও ছু'একদিনের মধ্যে ব্যবস্থা করছি। কোথাও জায়গা না হয়, আমার ওখানেই না হয় উঠবে। বাসা বদল করেই বিয়েটি করে ফেলবে।"

"দেখি।"

"দেখা-দেখির কিছু নেই। স্ত্রীচরিত্র সম্বন্ধে সুব্রত মুখুয্যেই যে শেষ কথা জানতে পেরেছে একথা আমি বিশ্বাস করিনা।"

সুব্রত হেসে চুপ করে রইল।

খানিক বাদে সে হঠাৎ বলল, "একটা খবর আছে।"

"কি ?"

"আজ সকাল থেকে গোকুল উধাও হয়ে গেছে। বলে গেছে বর্দ্ধমান যাচ্ছে কিন্তু ঘরে তার একটিও জিনিষপত্র নেই"—

শুনে কেমন যেন ছুঃখ হল, বললাম, "তাই নাকি ? বেচারী! ভালোবাসার জন্য শেষে নিরুদ্দেশ হয়ে গেল!"

সুব্রত তিক্তকণ্ঠে বলল, "খুবই স্বাভাবিক কিন্তু—আমার নিজেরই মনে হচ্ছে যে কোথাও চলে গেলে বেশ হত"—

"তুমি কাপুরুষ সুব্রত"—

"হয়ত"—

"হয়ত নয়, নিশ্চয়ই। শোন, মাথা খারাপ করো না, বি ওয়াইজ এ্যাণ্ড প্র্যাক্টিকাল—প্রেমে এবং রণক্ষেত্রে নির্ব্বোধ হলে মারা পড়বে।"

সুব্রত হাসল।

আমার ওখান থেকে বেরিয়ে সুব্রত যে ছন্নছাড়ার মত এখানে ওখানে ঘুরে বেড়িয়েছিল তা আমি জানি। আমার কথায় তার প্রত্যয় জন্মায়নি, পুরোনো দিনের মতই সে যত্র তত্র ঘুরে বেড়িয়ে, মদ খেয়ে, অনেক রাতে বাড়ী ফিরল। কিন্তু কিছুতেই সে চিন্তার হাত থেকে রেহাই পেল না। প্রতি মুহূর্ত্তে তার স্তিমিত নেশাচ্ছন্ন চোখের সামনেও কৃষ্ণার মুখ ভেসে উঠতে লাগল। আশ্চর্য্য, একটা কথাও বলল না মেয়েটা? ভালোবাসা উগ্র হলে কি চুপ করে থাকতে পারে কেউ? যে মেয়ে বাপকে সতেজে বলে যে বুড়ো বরের সঙ্গে তার বিয়ে হলে সে গলায় দড়ি দেবে সে কি বলতে পারল না যে সে সুব্রত ছাড়া আর কাউকে বিয়ে করবে না? নিঃশব্দে থাকার কি কারণ থাকতে পারে? কিছু না। বাঙালী মেয়েদের ভালোবাসার দৌড় ঐ পর্যন্ত, তাদের বিদ্রোহ বাপের রক্তচক্ষুর সামনে গিয়েই মাথা নীচু করে। ছি ছি ছি! সুব্রত রাগে, দুঃখে, অভিমানে, আক্রোশে জ্বলতে লাগল শুধু।

রাতের বেলা ঘুম এল না তার। সহরের গুঞ্জন ক্ষান্ত হল। শুধু বাড়ীর পার্শ্ববর্ত্তী গলিতে দু'একটা মাতালের জড়িতকণ্ঠ আর চায়ের দোকানের পুরোনো গ্রামফোনে চড়ানো ভাঙ্গা রেকর্ডের শব্দ মাঝে মাঝে ভেসে আসতে লাগল। তারপরে সে শব্দও থেমে গেল, কেবল দু'একটা হঠাৎ-জেগে-ওঠা বদমেজাজী কুকুরের ডাক শোনা যেতে লাগল। বিনিদ্রচোখে

বসে রইল সুব্রত। ক্রমশঃ তার নেশা স্তিমিত হয়ে এল, অন্তরের উত্তেজনা আরো বাড়ল, সে ঠিক করল যে পরের দিন সে কৃষ্ণার সঙ্গে একটা বোঝাপাড়া করবে। কাল সে জানবে যে কৃষ্ণা শিপ্রার মতই মেয়ে না অন্য কিছু। তার ভালোবাসা কি নেহাৎই একটা এড ভেঞ্চার না তার চেয়েও গভীরতর কিছু? সব সমস্যার সমাধান করবে সে কাল। হৃদয় নিয়ে খেলা বেশীদিন ভালো নয়।

আমার কথা মিথ্যে নয়। দু'দিন আগে কয়েকজন যুবককে বিশেষ অনুরোধ করেছিলাম। তাদের মধ্যে একজন পরদিনই সকালে এসে আমাকে বলল যে তাদের বাড়ীর দোতলার দুটো ঘর ছেড়ে দিতে তারা রাজী আছে। কোন অসুবিধে হবে না তাদের, কারণ বাড়ীটার দু'দিক থেকে সিঁড়ি আছে। একতলা ভাড়া দেওয়া আছে, এবং দোতলা তেতলায় তারা নিজেরা থাকে। সুব্রতের জন্য দোতলার অর্দ্ধেকটা তারা ছেড়ে দেবে, মাঝখানে একটা টিনের পার্টিশান করে দেবে। ঘর দুটো খালি করে ফেলা হয়েছে, সুব্রত যে কোনদিন গিয়ে উঠতে পারে সেখানে।

সুব্রতের বরাত দেখে ঈর্ষা হল। ছোকরার সময় ভালো যাচ্ছে। শিল্পী হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে সে, প্রেমে পড়েছে, ভালো বাড়ীও পাচ্ছে। এবং সে বাড়ী আমার চেয়েও ভালো। বিডন ষ্ট্রীটে বাড়ীটা, আমি দু'একবার গেছি সেখানে। দিব্যি আলো বাতাস খেলে ভেতরে, দরজা জানালা, দেয়াল মেঝে সব আধুনিক ডিজাইনের। চিত্রশিল্পী সুব্রতের আভিজাত্য এতে বহুল পরিমাণে বর্দ্ধিত হবে।

বিকেলের দিকে ছুটলাম সুব্রতের ওখানে। কিন্তু তাকে পেলাম না। ইন্দুমতী বললেন যে প্রায় দুঘণ্টা আগে সে বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেছে। অগত্যা একটা চিঠি লিখে সব জানিয়ে এলাম।

অফিসে ফিরে এসে অবাক হয়ে গেলাম। নায়কপ্রবর আমার প্রতীক্ষায় বসে আছে। আজ তার চেহারা আবার পাল্টে গেছে। প্রশান্তবদন, হাস্যমুখ, সুসজ্জিত সে। সত্যি, এই সব প্রেমিকদের বোঝা মুস্কিল। তাদের হৃদয়ের আবহাওয়া আগে থেকে ঘোষণা করা যায় না। মুহূর্তে মুহূর্তে তাদের রূপান্তর ঘটে। এই মুহূর্তে যে হাসছে, পরমুহূর্তেই হয়ত তাকে মেরু-শীতল দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করতে দেখা যাবে। নাঃ, লাভারস্ আর লুনেটিক্স্—তারা সবাই চন্দ্রাক্রান্ত রোগী, উন্মাদ।

বললাম, "বলিহারী মশাই। তোমার ওখানে ধন্না দিতে গেছি আমি আর তুমি এখানে বসে আছ?"

সে এক গাল হেসে প্রশ্ন করল, "কি ব্যাপার?"

"কি আবার, বাড়ী পাওয়া গেছে"—

"পাওয়া গেছে?" উল্লাসে উঠে দাঁড়াল সুব্রত।

বললাম, "উত্তেজিত হয়োনা। শোন, বাড়ী পাওয়া গেছে, যে কোনদিন তুমি ওখানে গিয়ে উঠতে পারো।"

সে বলল, "তোমায় যে কি করে আমি কৃতজ্ঞতা জানাব সম্পাদক"—

বাধা দিয়ে বললাম, "সেটা কঠিন নয়। নিঃশব্দে জানাও। কিন্তু তোমার খবর কি? আহ্লাদে আটখানা মনে হচ্ছে যে?"

সে হাসল, বলল, "তাই"—

"তাই মানে?"

"আজ বিয়ের জন্য দরখাস্ত করে দিয়ে এলাম।"

"বটে।"

"আর কৃষ্ণার সঙ্গেও আজ বোঝা পড়া হয়ে গেছে।"

"তাই নাকি? তা কি বুঝলে? স্ত্রী জাতি বিশ্বাসঘাতিনী?"

"দূর"—

"তবে?"

"শোন বলছি"—

সে বলতে সুরু করল। ঠিক তিন ঘণ্টা আগেকার কথা—তখন সে—

একবার ঘরে আর; একবার বারান্দায় এসে দাঁড়াচ্ছিল সুব্রত। রাতে ঘুম হয়নি, চোখ জ্বালা করছে, মাথাটা গরম হয়ে উঠেছে, তবু দু'চোখের পাতা মুদ্রিত হতে চাইছে না। কৃষ্ণার সঙ্গে আজ একটা বোঝাপাড়া করে- নিতেই হবে। অনেকক্ষণ ধরে সে ভাবছিল যে কি করবে, কি ভাবে কৃষ্ণাকে ডেকে আনবে।

দ্বিধা এবং সংশয়ের দোলায় কিছুক্ষণ দুলল সে। কি করবে সে? কি করা যায়? যেচে যাবে সে? যাওয়া উচিত? যাবে কি যাবে না সে?

ভাবতে ভাবতে হঠাৎ একসময়ে সে উঠে দাঁড়াল, নীচের দিকে পা বাড়াল।

বাড়ীর ভেতরটা তখন নিঃশব্দ হয়ে উঠেছে। ওপরে ইন্দুমতী ঘুমিয়ে পড়েছেন, নীচেও যোগমায়াদের কোন সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছে না।

সিঁড়ির বাঁকটা ফিরতেই সে থমকে দাঁড়াল। সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে আসছিল কৃষ্ণা। তাকে দেখে সেও থামল। মাথা নীচু করে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে রইল। খুব শান্ত এবং বিনীত তার ভঙ্গী।

তাকে দেখে সুব্রতের দু'চোখ জলে উঠল, তার হৃদপিণ্ডটা জোরে জোরে লাফাতে সুরু করল।

বিশ্রী একটা নিস্তব্ধতা ঘনিয়ে এল দুজনের মধ্যে। শুধু বাইরের গুঞ্জনধ্বনি আর পায়রার ডাক শোনা যেতে লাগল।

কয়েকটা সেকেণ্ড।

তারপরেই সুব্রত নীচে নেমে এল, একেবারে কৃষ্ণার পাশে দাঁড়াল। মুহূর্তকাল দ্বিধা করল সে, পরমুহূর্তেই কৃষ্ণাকে দু'হাতে পাঁজাকোলা করে তুলে ধরে ওপরে নিয়ে চলল।

কৃষ্ণা এর জন্য তৈরী ছিল না একটুও, অস্ফুট একটা শব্দ বেরোল তার মুখ থেকে। সুব্রতের কাঁধকে দুহাত দিয়ে ঠেলতে ঠেলতে সে ক্ষীণকণ্ঠে বলল, "ছিঃ, কেউ দেখবে"—

সুব্রত বলল, "চুপ করো বোবা মেয়ে"—

কৃষ্ণা চোখ বুজল।

সোজা ওপরে উঠে গেল সুব্রত, নিজের ঘরে গিয়ে কৃষ্ণাকে দাঁড় করিয়ে দিল, তার দু'কাঁধে কঠিন ঝাঁকুনী দিয়ে সে প্রশ্ন করল, "কি তোমার মতলবটা কি ?"

কৃষ্ণা জবাব দিল না।

সুব্রত বলল, "সেদিন তুমি আমাকে ভয় পাইয়ে দিয়েছ, কি ব্যাপার ? তুমি কি নিজেও ভয় পাচ্ছ ?"

হঠাৎ কৃষ্ণা তার কাছে ঘেঁষে দাঁড়াল, তার গলা জড়িয়ে ধরে তার বুকে মাথা রাখল। বুকের ওপর কৃষ্ণার নিঃশ্বাস পড়ছিল, সুব্রত তার প্রচণ্ড উষ্ণতায় রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল।

সব কথা, সব রাগ গুলিয়ে গেল তার। মুহূর্তে তার সমস্ত চেতনা, সমস্ত অনুভূতি একটি উন্মত্ত অধীরতায় আচ্ছন্ন হয়ে গেল। কৃষ্ণার

মুখটাকে দু'হাতে তুলে ধরে সে তৃষ্ণার্তের মত একটি চুমু খেল তার ঠোঁটে।

শিউরে, আরো নিবিড়ভাবে সুব্রতকে জড়িয়ে ধরল কৃষ্ণা তারপর আস্তে আস্তে শিথিল হয়ে গেল তার দুটো হাত, ধীরে ধীরে সে সুব্রতের পায়ের কাছে বসে পড়ল, মাথা নীচু করে বলল, "তুমি আমাকে ভুল বুঝোনা।"

সুব্রত তাকে সযত্নে ওঠাল, আবেগকম্পিত কণ্ঠে প্রশ্ন করল, "কিন্তু কেন, সেদিন তুমি কিছু বললে না কেন?"

প্রায় অস্ফুট গলায় কৃষ্ণা বলল, "মাঝে মাঝে মেয়েদের অমন হয়"—

"কি হয়?"

"লজ্জা। এবার কিন্তু তুমি আর আমাকে কথা বলতে বলোনা, আমাকে বিশ্বাস করোনা। এবার—এবার তুমি আমার হাত ধরে টেনে নিয়ে এসো।"

কাহিনী শেষ হয়ে এল। পরবর্তী ঘটনা খুব দ্রুত এবং সংক্ষিপ্ত।

পরের দিনই সুব্রত বৌবাজারের বাড়ী ছেড়ে বিডন ষ্ট্রীটে উঠে গেল, যাবার আগে ইন্দুমতী ও সুব্রত যোগমায়া ও কৃষ্ণার সঙ্গে একটা ষড়যন্ত্র করে গেল। সেই অনুযায়ী কাজ চলতে লাগল।

ভোলানাথবাবু সুব্রতের বাসাবদলে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন, যোগমায়াকে ডেকে বললেন, "উঃ, বাঁচলাম। চরিত্রহীন হতভাগা, ও যদি আর কিছুদিন এখানে থাকত তাহলে আমিই উঠে যেতাম, এবার শোন"—

যোগমায়া নিস্পৃহ গলায় বললেন, "কি ?"

"পনেরো কুড়ি দিন বাদে কৃষ্ণাকে আবার দেখে যাবেন ঘনশ্যামবাবু চুপি চুপি! পছন্দ হলে তার দু'দিন বাদেই বিয়ে হবে। বুঝলে, তিন চারশো টাকার বেশী খরচ করতে হবেনা আমাকে—ঘনশ্যামবাবু বলেছেন আমাকে।"

যোগমায়া মাথা নেড়ে বললেন, "বেশ তো"—

ভোলানাথবাবু বেশ খুশী হয়ে উঠলেন মনে মনে।

পনেরো দিন পরে কাহিনীর শেষ নাটকীয় ঘটনাটি ঘটল।

ভোলানাথবাবু অফিস থেকে ফিরে এসে জলযোগপর্ব্ব সমাধা করলেন। যোগমায়া বড় যত্ন করে তাঁকে খাওয়ালেন, কৃষ্ণা চা তৈরী করে আনল। ভোলানাথবাবু লক্ষ্য করলেন যে কৃষ্ণা আজ খুব পরিপাটি করে সেজেছে।

পাশের ঘরে বাচ্চারা পড়াশুনা আরম্ভ করেছে তখন।

চা পানান্তে সংবাদপত্র নিয়ে বসলেন ভোলানাথবাবু। তার পুরোনো অভ্যেস।

হঠাৎ জুতোর শব্দে মুখ তুলে তিনি থমকে গেলেন। যেন ভূত দেখলেন তিনি। গট্ গট্ করে তার সামনে এসে দাঁড়াল সুব্রত।

"তুমি!" তাঁর মুখ দিয়ে কথাটি ছিটকে বেরোল।

সুব্রত সহাস্যে নমস্কার জানাল, "আজ্ঞে হ্যাঁ আমি।"

খবরের কাগজটা একপাশে সরিয়ে রেখে ভোলানাথবাবু সোজা হয়ে বসলেন, কঠিন কণ্ঠে বললেন, "সেদিন আমি তোমাকে যে ভাবে অপমান করেছিলাম তার পরও আজ তুমি আসতে সাহস পেলে?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনার অপমান আমার গায়ে লাগেনি"—

"কেন?"

"আপনি গুরুজন।"

ভোলানাথবাবু উত্তেজিত কণ্ঠে বললেন, "নিজের বাড়ীতে বসে তোমার রসিকতা বরদাস্ত করার মত আমার সময় নেই, বুঝলে ?"

সুব্রত সবিনয়ে বলল, "বুঝেছি। তাহলে আসল কথাই বলি"—

"বল"—

"আপনি সেদিন আমাকে অনুমতি দেন নি আপনার মেয়েকে বিয়ে করতে"—

"হ্যাঁ, দিইনি।"

"আজ আবার অনুমতি প্রার্থনা করছি।"

ভোলানাথবাবু মাথা ঝাঁকালেন, রুক্ষকণ্ঠে বললেন, "না। তার পাত্র ঠিক আছে। হয়েছে ? এবার তুমি বেরোও"—

সুব্রত হাসল, বলল, "বেরোচ্ছি, তবে একা নয়।"

"মানে ?"

"দেখুনই না"—এই বলে সুব্রত ডাক দিল, "সেদিন আপনি ডেকে-ছিলেন, আজ আমি ডাকছি—কৃষ্ণা—কৃষ্ণা"—

ধীরপদে কৃষ্ণা এসে ভেতরে দাঁড়াল। বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে ভোলানাথবাবু সব দেখতে লাগলেন। কি ঘটছে তাঁর চোখের সামনে ! অসম্ভব—

সুব্রত কৃষ্ণার দিকে তাকাল, বলল, "তোমার বাবা আজো মত দিলেন না—সুতরাং তাঁর অমতেই আমাদের বিয়ে হবে—এসো"—

ভোলানাথবাবু লাফিয়ে উঠলেন, সগর্জ্জনে বললেন, "সাবধান কৃষ্ণা, এই বখাটে ছোকরার কথায় কান দিস্‌না। যা, ভেতরে যা তুই"—

সুব্রত ডাকল, "এসো কৃষ্ণা"—

কৃষ্ণা দুলে উঠল, পা বাড়াল।

ভোলানাথবাবু অক্ষম আক্রোশে আবার গর্জ্জালেন, "কৃষ্ণা, কথা শুনছিস্ না? ভেতরে যা বলছি"—

সুব্রত দরজার দিকে এগিয়ে গেল, বলল, "ভয় করো না কৃষ্ণা। বার্দ্ধক্য চিরকালই আমাদের শত্রুতা করবে, যাদের জীবনে ভালোবাসা নেই তারা চিরকাল ভালোবাসার শত্রুতা করবে—তবু আমরাই জিতব। এগিয়ে এসো"—

মেয়ের ওপর লাফিয়ে পড়তে ইচ্ছে করল ভোলানাথবাবুর, কিন্তু তিনি পারলেন না। মেয়ের মুখের চেহারা বদলে গেছে, সে যেন তাঁর একান্ত অপরিচিতা।

শেষবারের মত তিনি ডাকলেন, "কৃষ্ণা"—

কিন্তু কৃষ্ণা কথা শুনল না। নির্ব্বাক, কালো পাথরের মূর্ত্তির মত সে দৃঢ় পদক্ষেপে সুব্রতের পাশে গিয়ে দাঁড়াল। সুব্রত তার একটা হাত ধরল। পাশাপাশি দুজনকে মুহূর্ত্তের জন্য দেখা গেল, তারপরেই তারা অদৃশ্য হয়ে গেল, তাদের পায়ের শব্দ রাস্তায় গিয়ে মিলিয়ে গেল।

ভোলানাথবাবুর কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে গেল। অপমানে, লজ্জায়, ক্রোধে তিনি পঙ্গু হয়ে বসে রইলেন। পাশের ঘর থেকে বাচ্চারা এসে তখন দরজার পাশে জড় হয়েছে।

যোগমায়া ভেতরে এসে দাঁড়ালেন, তাঁর ওপর এতক্ষণে নজর পড়ল ভোলানাথবাবুর।

হঠাৎ তিনি স্ত্রীর ওপর আক্রোশটাকে ঢালতে চাইলেন, কুৎসিত ভঙ্গী করে বললেন, "বলি এতক্ষণ কোন চুলোয় ছিলে? মেয়ে যে বাজারের মেয়েদের মত বাড়ী ছেড়ে চলে গেল তা জানো?"

যোগমায়া বিচলিত হলেন না, শান্তকণ্ঠে বললেন, "জানি।"

"জানো মানে? তুমি আগেই জানতে তাহলে?"

"হ্যাঁ।"

ভোলানাথবাবু পাগলের মত চেঁচিয়ে উঠলেন, "তুমি তাহলে জেনে শুনে"—

যোগমায়া শান্তকণ্ঠে বললেন, "হ্যাঁ। কি করব, তুমি তো মেয়ের দুঃখ বুঝলে না।"

"আমি কি মেয়ের দুঃখ কম বুঝি?

"আমার চেয়েও কম বোঝ বৈকি—তুমি তো মেয়েমানুষ নও।"

ভোলানাথবাবু ক্ষিপ্তের মত কি একটা বলতে গিয়ে হঠাৎ থেমে গেলেন। না, কিছু বলবেন না তিনি। আজ দিনটা ভালো নয়। যে যোগমায়া আজ এতকাল নিঃশব্দে মাথা নীচু করে থাকত সে আজ নির্ভয়ে জ্বলন্ত দৃষ্টি মেলে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। কে জানে কি হবে। হয়ত যোগমায়াও মেয়ের ওখানে গিয়ে উঠবে। কিছু বলা যায় না, মেয়েরা রাক্ষসীর জাত, ওরা সব পারে। আজ থাক, কাল তিনি সুব্রতকে একবার দেখে নেবেন। কাল—

অগ্নিবক্ষ আগ্নেয়গিরির মত ভোলানাথবাবু শুধু জ্বলতে সুরু করলেন।

এবার শেষ কথা

পরদিনই দুপুরে কোর্টে গিয়ে বিয়ে হয়ে গেল। সুব্রত ও কৃষ্ণা'র বিয়েতে প্রধান সাক্ষী হলাম আমি। হাসি পেল মনে মনে। নিজে বিয়েথা করলাম না, অথচ আমাকেই সব চেয়ে বেশী মাথা ঘামাতে হল এই বিয়ের ব্যাপারে। বিধাতার রসিকতা বোধ হয় একেই বলে।

কোর্ট থেকে সুব্রতের নতুন বাড়ীতে সবাই ফিরলাম।

ইন্দুমতী অপেক্ষা করছিলেন, পুত্র ও পুত্রবধূকে আশীর্ব্বাদ করতে গিয়ে বুড়ী আনন্দে কেঁদেই ফেললেন।

লোক বেশী ছিলাম না, মাত্র ছ'সাত জন লোক আমরা। সুব্রত খুব খাওয়াল। আজ হঠাৎ তার নজরটা আমার ওপর বেশী মাত্রায় পড়ল।

সে কৃষ্ণাকে বলল, "কৃষ্ণা, সম্পাদককে খাওয়াও পেটভরে খাওয়াও"—

আমি সাতঙ্কে বললাম, "দোহাই কৃষ্ণা, আমার পেটে আর জায়গা নেই"—

কৃষ্ণা শুনল না, সুব্রতের সঙ্গগুণে সেও একদিনে বদলে গেছে। তার দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে গেলাম। বাড়ী ফেরার পর ইন্দুমতী তাঁকে চন্দন দিয়ে সাজিয়েছেন। কালো মুখে চন্দনের ফোঁটা বড় অপরূপ সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করেছে। এই কি সেই কৃষ্ণা যাকে একদিন সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে দেখেছিলাম! অনেক পরিবর্ত্তন হয়েছে তার। সত্যি সে সুন্দরী। সুব্রতের দৃষ্টি আছে বটে। কৃষ্ণা যেন একটি লিরিক কবিতা।

কৃষ্ণা আর সুব্রতকে পাশাপাশি দেখলাম। মুখচোখ দুজনের উত্তেজিত, লাজরক্ত। দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলাম। মনে হল যেন ওরা দুজনে দুটি ফুল। সদ্য প্রস্ফুটিত।

মুগ্ধ হলাম, আবার হাসলামও। যে সুব্রত এতদিন কারণে অকারণে যখন তখন, দিনরাত আমার ওখানে হানা দিত তাকে কি আর আগের মত দেখতে পাওয়া যাবে? অসম্ভব। দিন কাটবে, সুব্রত ক্রমেই দুষ্প্রাপ্য হয়ে উঠবে, নিজের জীবনের মধুচক্রে বসে সে আমাদের প্রায় ভুলেই যাবে।

এই হয়।

সুব্রত একটা ছবি আঁকছিল, তাকে এক ফাঁকে প্রশ্ন করলাম, "এবার ?"

সে হাসল, বলল, "এবার ? এবার পৃথিবীর সমস্ত রূপ রস, গন্ধ, বর্ণকে আমি তুলি দিয়ে বন্দী করব"—

আমি হাসলাম, কৃষ্ণার দিকে তাকিয়ে বললাম, "খুব ভালো কথা কিন্তু একটা বিষয়ে তুমি সাবধান থেকো কৃষ্ণা—"

কৃষ্ণা হাসল সুব্রতের দিকে শাণিত কটাক্ষ হেনে বলল. "আপনার কথা আমি বুঝেছি দাদা, আপনার বন্ধুর রস-প্রীতিটা একটু বেশী, এইতো ?"

"ঠিক ধরেছ ভাই।"

কৃষ্ণা মুখ টিপে হাসল, বলল, "এবার থেকে আমি সেই রসের যম হলাম।"

সুব্রত হো হো করে হেসে উঠল, বলল, "তোমার যম হবার কোন দরকার নেই কৃষ্ণা, এখন থেকে তুমিই তো আমার মূর্তিমতী আনন্দরস। চিন্তিত হয়োনা সম্পাদক. মদ আর আমি খাব না, এখন থেকে এই সালঙ্কারা যুবতীর মদির কটাক্ষই আমাকে মাতাল করবে।" এই বলে সে সদ্য-আঁকা স্কেচ্‌টাকে আমার সামনে তুলে ধরল, প্রশ্ন করল, "আওয়াজ পাচ্ছ ?"

জবাব দেবার আগে ছবিটা দেখলাম। একজন বুড়ো লোক গাল ফুলিয়ে সানাই বাজাচ্ছে। একেবারে জীবন্ত মনে হল ছবিটাকে।

সহাস্যে বললাম, "পাচ্ছি শুনতে, ভারী মিষ্টি"—

যা ভেবেছিলাম তাই ঘটেছিল পরে।

দিনের পর দিন কাটতে লাগল। সুব্রতের দেখা পাওয়া ক্রমেই ভার হয়ে উঠল। কিছুই বলতাম না। কি হবে বলে। যৌবনের স্বর্ণোজ্জ্বল দিনে সে আনন্দ-লুণ্ঠন করবে বৈকি।

মাঝে মাঝে ভেবে অবাক হই। ভালোবাসা একটা বিচিত্র বস্তু অসংলগ্ন, অর্থহীন জীবনকে ঐ একটিমাত্র জিনিষই মুহূর্ত্তে রস-সায়র করে তোলে। আদিম পৃথিবী থেকে বর্ত্তমানের এই সভ্য পৃথিবীতে মানুষের জীবনে এই আশ্চর্য্য ঘটনাটি চিরকাল ঘটে। তারা ভালোবাসে। যেমন বসন্তে ফুল ফোটে।

দেখা না পেলেও সুব্রতের খোঁজ পেতাম অবশ্য। সে আজকাল ভয়ঙ্কর ছবি আঁকছে, চিত্র-রসিকেরাও তার ছবি দেখে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠছে। শুনেছিলাম যে ভোলানাথবাবুর রাগ এখনো পড়েনি, তবে যোগমায়া ওখানে গেলে তিনি বাধা দেন না। আমি জানি যে ভোলানাথবাবুও একদিন মেয়ের কাছে গিয়ে দাঁড়াবেন।

বেশ কিছুদিন কাটল। প্রায় দুমাস। হঠাৎ কাগজের জন্য আমার দুতিনটে ছবির দরকার পড়ল। মনে মনে একটু চটে উঠলাম সুব্রতের ওপর। কি ব্যাপার লোকটার? মানুষ প্রেম করে বিয়ে করে, ঢের মানুষ দেখেছি অমন, কিন্তু সুব্রতের মত আদেখলা দেখিনি। তাছাড়া আমার কথাও সে ভুলতে বসেছে!

একদিন দুপুরে বেরিয়ে পড়লাম।

মাসটা আষাঢ়, আকাশটা অন্ধকার হয়ে আছে আর ঠাণ্ডা হাওয়া

বইছে। রাস্তায় বেরিয়ে হঠাৎ চায়ের তেষ্টা পেল। গলির শেষে একটা চায়ের দোকান ছিল, সেখানে গিয়ে বসলাম।

চা খাচ্ছিলাম, হঠাৎ সামনের লোকটির দিকে নজর পড়ল। আরে এ যে গোকুল!

গোকুল ভট্টাচার্য্য আরো রোগা হয়ে গেছে, চেহারাটা তার আরো কালো হয়ে উঠেছে। জামা কাপড় ময়লা, মুখে খোঁচা খোঁচা ও অসংস্কৃত দাঁড়ি গোঁফ।

নিজের অজ্ঞাতসারেই ডেকে ফেললাম, "গোকুলবাবু"—

গোকুল চমকে উঠল, খুনী লোক যেমন পুলিসের পায়ের শব্দে চমকায় তেমনিভাবেই চমকাল সে। মুখ ফিরিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে সে ভ্রূকুঞ্চিত করল, প্রশ্ন করল, "আপনি—আপনি অনিমেষবাবু, তাই না?"

মাথা নেড়ে বললাম, "হ্যাঁ।"

"সম্পাদক?"

আবার মাথা নাড়লাম।

সে চুপ করল।

আমি প্রশ্ন করলাম, "আপনি নাকি নিরুদ্দেশ হয়ে গেছলেন গোকুলবাবু?"

গোকুল বিশীর্ণ হাসি হেসে ঘাড় নাড়ল, বলল, "না, এখানেই তো আছি—বেলেঘাটায়—"

"ও বাড়ী ছেড়ে হঠাৎ চলে গেলেন যে?

গোকুল ঠোঁট উলটে আগের মতই হাসল, বলল, "এমনি—খেয়াল, বুঝেছেন না—"

"কেমন আছেন?"

"ভালো না, টিউশান মাত্র দুটো এখন, বুয়েচেন তো,—যা দিনকাল—"

কথাটা বুঝলাম কিন্তু জবাবে কি বলব বুঝতে পারলাম না।

হঠাৎ গোকুল উঠে দাঁড়াল, বলল, "আজ্ঞে আসি আজ—কাজ আছে—"

"আসুন—"

কিন্তু দু'পা এগিয়েই সে ফিরে এল, আমার কাছে ঘেঁষে মৃদুকণ্ঠে প্রশ্ন করল, "আচ্ছা সুব্রতবাবু আর কৃষ্ণা কেমন আছে তা জানেন ?"

"জানি তারা ভালো আছে।"

গোকুলের জ্বলজ্বলে চোখ দুটো আরো জ্বলে উঠল, একটু হেসে সে বলল, "বেশ বেশ। বুয়েচেন অনিমেষবাবু, সুব্রতবাবু সুখী হবেন, কৃষ্ণা মেয়ে বড় ভালো। আর কি ফাস্ট্ ক্লাস সে গায়—শোনেননি বুঝি তার গান ? আমি—আমিই শিখিয়েছিলাম তাকে—হেঁ হেঁ, আসি তবে নমস্কার।"

গোকুল বেরিয়ে গেল দোকান থেকে।

চুপচাপ বসে চা শেষ করলাম। মনে মনে শুধু একবার বললাম যে ভালোবাসা,পৃথিবীতে ভালোবাসাই একমাত্র স্পর্শমণি। যাকে ভালোবাসে তার অন্তর পেলেও সোনা হয়, না পেলেও সোনা হয়। আশ্চর্য্য।

বড় রাস্তায় গিয়ে ট্রামে চড়লাম।

দশ মিনিট বাদে সুব্রতের বাড়ী পৌছুলাম।

সিঁড়ি বেয়ে উঠতে উঠতে হঠাৎ মাথায় দুষ্টবুদ্ধি জাগল। সুব্রত আর কৃষ্ণা এখন কি করছে তা দেখতে হবে।

পা টিপে টিপে ওপরে উঠলাম। প্রথম ঘরটাতে ইন্দুমতী থাকেন,

সেটার দরজা ভেজানো ছিল। ভালোই হল, অক্লেশে তা অতিক্রম করে দ্বিতীয় ঘরের দিকে গেলাম।

যা ভেবেছিলাম তাই। দরজা বন্ধ। এবার কি করি।

ঘরের ভেতর কে যেন গুনগুন করে গাইছে। গোকুলের কথা মনে পড়ল। কৃষ্ণা গাইছে বোধ হয়।

ঘরটির দিকে ভালো করে তাকাতেই হঠাৎ জানালাটার ওপরে নজর পড়ল। সেটা বন্ধ নয়। ভেজানো রয়েছে। বাঁচা গেল। পা টিপে টিপে তার পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম।

জানালার ফাঁক দিয়ে ধীরে ধীরে উঁকি মারলাম। ভেতরটা সম্পূর্ণ দেখতে পেলাম।

ভেতরের জানালাগুলো খোলা। একটা জানালার পাশে এলোচুল ছড়িয়ে কৃষ্ণা বসে আছে। তার বিপরীত দিকে ইজেলটা সামনে রেখে বসে আছে সুব্রত। সে ছবি আঁকছে।

কৃষ্ণা সুব্রতের দিকে মুগ্ধদৃষ্টি মেলে মৃদু মৃদু হাসছে আর গান গাইছে। গানটা বুঝতে পারলাম না।

সুব্রতও হাসছে। কৃষ্ণার দিকে মাঝে মাঝে সে নির্নিমেষ নয়নে তাকাচ্ছে তারপর আবার ইজেলের ওপরকার ক্যানভ্যাসে রং বুলোচ্ছে। খোলা জানালা দিয়ে দেখা যাচ্ছে সহরের অট্টালিকাশীর্ষ আর মেঘাচ্ছন্ন আকাশ।

ছবিটা দেখলাম। গুচ্ছ গুচ্ছ ফুল ফুটেছে একটা গাছে। তার রক্ত-বর্ণ পুষ্প-সমারোহের আড়ালে দাঁড়িয়ে আছে একটি যুবতী আর তার হাত ধীরে ধীরে টানছে একটি যুবক। যুবতীটির মুখ লাজরক্ত, ঠিক একটি ফুলের মত। আর সে মুখটি যে কৃষ্ণার তা বুঝতে একটুও কষ্ট হল না আমার।

হঠাৎ কৃষ্ণা উঠে দাঁড়াল, সুব্রতের পাশে গিয়ে তার কাঁধের ওপর হাত

রেখে সে এবার গানটা একটু উচ্চকণ্ঠে গাইল। এতক্ষণে গানের প্রথম লাইনটা আমি বুঝতে পারলাম।

কৃষ্ণা গাইছিল,—

"কাল রাতের বেলা গান এল মোর মনে,
তখন তুমি ছিলে না মোর সনে।

যে-কথাটি ব'লব তোমায় ব'লে কাটল জীবন নীরব চোখের জলে,
সেই কথাটি সুরের হোমানলে উঠল জ্বলে একটি আঁধার-ক্ষণে।

তখন তুমি ছিলে না মোর সনে॥"

যতটুকু শুনলাম, মুগ্ধ হয়ে গেলাম। কালো মেয়েটির কণ্ঠে কোকিল আছে।

লোভ হল আরো কিছুক্ষণ থাকতে। কিন্তু থামলাম না, আবার পা টিপে টিপে ফিরে চললাম। সাবধানেই চলছিলাম, হঠাৎ একবার একটু শব্দ হয়ে গেল।

ভেতর থেকে সুব্রতের প্রশ্ন ভেসে এল, "কে ?"

জবাব দিলাম না, তাড়াতাড়ি অধিকতর সতর্কতার সঙ্গে নীচে নেমে এলাম। সাড়া দিতে বা বাধা দিতে আমার ভয় হল। না, ওরা গান গাক, ভালোবাসুক, পরস্পরের দিকে তাকিয়ে মুগ্ধ হোক্। ওদের ওই ছোট্ট ঘরটা এখন মন্দির হয়ে দাঁড়িয়েছে। সেই মন্দিরের দেবদেবী হয়ে ওরা সুখী হোক।

চুপচাপ নীচে নেমে গেলাম।

আমার কথাটি ফুরোল।

সমাপ্ত